বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

ছত্রিশতম খণ্ড শীত সংখ্যা পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদক
সৈয়দ আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
জালাল আহমেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী সম্পাদক	:	ড. জালাল আহমেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00 US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Syed Azizul Huq, published by Dr. Sabbir Ahmed, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 02-9576391, E-mail : asiaticsociety.bd@gmail.com

সূচিপত্র

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান : একটি সমীক্ষা
কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম ১৫৩

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
মুহাম্মদ সাজ্জাদ আহসান ১৬৯

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও চারুশিল্পী সমাজ
মোঃ বনি আদম ১৮৯

হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী*-তে লোকজ জীবন
তাশরিক-ই-হাবিব ২২১

ভাত ও বাঙালি : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা
মো. সালেহ মাহমুদ ২৪৫

বাংলার প্রযুক্তি : প্রসঙ্গ চাকা
মো. শাহিনুর রশীদ ২৭৩

জাপানি কাব্যসাহিত্যের বিকাশধারা ও বাংলায় অনুবাদের কতিপয় নিদর্শন
লোপামুদ্রা মালেক ২৯৩

গ্রন্থ পর্যালোচনা
বদরে আলম খান ৩১৩

গবেষকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবষকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :
   - কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে গবেষকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে গবেষকের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্যকোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উলেøখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উলেøখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলা নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু অন্য নামের ক্ষেত্রে শেষ নাম প্রথমে পদবী ব্যবহার করা হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশি শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। অন্যভাষার শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

১১. যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধ সোসাইটির বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০১৮ ও ২০১৯

সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল অধ্যাপক মো. হারুনর রশীদ খান
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক সাজাহান মিয়া
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. সাব্বীর আহমেদ
সম্পাদক	:	জনাব মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	জনাব আহমদ রফিক (ফেলো) অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী (ফেলো) অধ্যাপক এম দেলওয়ার হোসেন অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম অধ্যাপক মো. আবদুল করিম

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান : একটি সমীক্ষা

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম**

সারসংক্ষেপ

মুসলমানদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম স্থাপত্যের সম্প্রসারণ ঘটে এবং স্বদেশি ও বহির্দেশীয় নির্মাণ রীতির সংমিশ্রণে ভারতীয় উপমহাদেশে 'ইন্দো-মুসলিম' বা 'ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য' নামে পরিচিত এক নতুন শৈলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। উল্লিখিত দুটি ভিন্ন রীতির একটি খিলাননির্ভর স্থাপত্য ঐতিহ্য (arcuate system) এবং অন্যটি স্তম্ভ-সর্দল নির্মাণ পদ্ধতি (trabeate method)। খিলাননির্ভর স্থাপত্য ঐতিহ্য ইতঃপূর্বে বহির্ভারতে বিকশিত মুসলিম স্থাপত্য রীতি যথা আরব, পারসিক, উসমানীয় স্থাপত্য উৎস থেকে নিঃসারিত। যেমন– খিলান, গম্বুজ, খিলান ছাদ, গম্বুজ নির্মাণে পান্দাতিফ ও স্কুইঞ্চের ব্যবহার এমন কি অলঙ্করণ বিষয়বস্তু হিসেবে লিপি নকশা, আরব্য ও জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে প্রাক-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য স্তম্ভ-সর্দল নির্মাণ রীতি যথা– ওজি খিলান, খিলান ও গম্বুজ নির্মাণে ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতির ব্যবহার, ঠেসের ব্যবহার, ঝড়োকা বাতায়ন, ছত্রী, ছাইচ, আমলক ও কলস শিরোচূড়ার ব্যবহার প্রভৃতি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যধারায় খিলান ও গম্বুজনির্ভর স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও স্তম্ভ-সর্দল নির্মাণ রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হয়নি। বরং ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে (১২০৬) ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে এদেশের মুসলিম স্থাপত্যে যে সংমিশ্রণ রীতির সূচনা ঘটেছিল সেটি ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। 'ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে'[১] দেশজ স্থাপত্য ঐতিহ্য থেকে গৃহীত উপাদানগুলো উদাহরণসহ শনাক্তকরণ বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

৬২২ সালে মহানবী (সা.)-এর মদিনা মসজিদ ও বাসগৃহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ইসলামি স্থাপত্যের সূচনা। আরবদের বহুল প্রচলিত নির্মাণ ঐতিহ্য যেমন– শুষ্ক ইট, কাদামাটি, খেজুর বৃক্ষ ও খেজুরপত্র দ্বারা তাঁর মদিনা মসজিদ ও বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল, যাকে প্রকৃত অর্থে কোনো স্থাপত্য বলা যায় না। তাছাড়া এক হাদিসে মহানবী (সা.) ইমারত নির্মাণকে নিরুৎসাহিত করেছেন।[২] তথাপি তাঁর মৃত্যুর অর্ধ শতক পরেই খলিফাগণ তথা মুসলিম

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শাসকবর্গ বিভিন্ন দেশ বিজয়ের মাধ্যমে প্রাক-মুসলিম উন্নত সভ্যতার অধিকারী রোমান, বাইজান্টাইন ও সাসানীয়দের সংস্পর্শে আসায় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত হন।[৩] ফলে শুষ্ক ইট, কাদামাটি ও খেজুর বৃক্ষের উপকরণে গঠিত আরব নির্মাণ পদ্ধতি রূপান্তরিত হয় পোড়ানো ইট কিংবা প্রস্তর নির্মিত ইমারতে। সুতরাং ইমারত নির্মাণে এই বদলিকরণ মুসলমানরা প্রথমে স্থাপত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ইমারতকে সুদৃঢ়করণের জন্য করলেও পরবর্তীকালে তা স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এই স্থায়িত্বকে সৌন্দর্যমণ্ডিতকরণের মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন দেশে নির্মাণ করেন অসংখ্য চাকচিক্যময় ইমারত। অতএব স্থায়িত্ব ও সৌকর্যের সমন্বয়ে নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে অন্য সভ্যতার নির্মাণ উপকরণ ও পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ইসলামি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত[৪] যে স্থাপত্যধারা গড়ে ওঠে তাই সামগ্রিকভাবে ইসলামি স্থাপত্য এবং জাতিগতভাবে মুসলিম স্থাপত্য নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত প্রাক-মুসলিম স্থাপত্যধারাকে জাতিগত বিভাজনের উপর ভিত্তি করে রোমান স্থাপত্য, গ্রিক স্থাপত্য, বাইজান্টাইন স্থাপত্য, সাসানীয় স্থাপত্য, ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু স্থাপত্য, বৌদ্ধ স্থাপত্য, জৈন স্থাপত্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, জাতিসত্তা, বংশীয় নাম ও নির্মাণ রীতির উপর ভিত্তি করে সমগ্র ইসলামি স্থাপত্যকে আরব স্থাপত্য, পারসিক স্থাপত্য, অটোমান স্থাপত্য, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য, ঔপনিবেশিক বা ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। যাহোক, রোমান-বাইজান্টাইন ও সাসানীয় উৎস থেকে গৃহীত রূপরেখা ও নির্মাণশৈলী, যেমন– *জুল্লাহ* (গির্জার আইল), *সাহন* [দেবমন্দিরের উন্মুক্ত অঙ্গন কিংবা প্রাক-ইসলামি আরব বাড়িঘরের বিন্যাসের (একদিকে বসবাসের ঘর এবং অন্যদিকে পশু পালনের প্রকোষ্ঠ, আর মাঝে উন্মুক্ত অঙ্গন) অনুকরণ হতে পারে], *রিওয়াক* (দেবমন্দিরের বারান্দা), *চাহারতাক*-এর গম্বুজ, খিলান ও খিলানছাদ, গম্বুজকে ধরে রাখার জন্য পান্দানতিফ ও স্কুইঞ্চ, সাসানীয় ইওয়ান এমনকি বিভিন্ন অলংকরণ পদ্ধতি যথা– মোজাইক, ফ্রেস্কো, পলেস্তারা ও প্রস্তর খোদাই নকশা প্রভৃতি মুসলমানরা তাঁদের নির্মিত ইমারতে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন যে, এগুলো মুসলিম উপাদান না হলেও সমগ্র বিশ্বে সেগুলো মুসলিম স্থাপত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে এসব উপাদানে নির্মিত ইমারতসমূহ ইসলামি স্থাপত্যকেই বিধৃত করে। সামগ্রিক ইসলামি স্থাপত্যকে জাতিসত্তা অথবা শাসক গোষ্ঠীর বংশের নামানুসারে কিংবা আঞ্চলিক নির্মাণ রীতির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়, যেমন– (ক) আরব স্থাপত্য যা উমাইয়া, আব্বাসীয়, স্পেনীয় (মাগরেবীয়) ও ফাতেমীয় শাসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল এবং এর বিশেষত্ব হলো মোজাইক ও ফ্রেস্কো অলংকরণ; (খ) পারসিক স্থাপত্য যেটি সামানীয়, গজনভি, সেলযুক, মোঙ্গল, তৈমুরীয় ও সাফাভি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত এবং এর বিশেষ স্বকীয়তা হলো রঙিন টালি ও *মুকার্নাস* অলংকরণ; (গ) উসমানীয় স্থাপত্য যার

অসাধারণত্ব হলো মলিনতা ও গুরুগম্ভীরতা; (ঘ) ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য যা দিল্লির সুলতান ও মোগল শাসকদের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট এবং এর নিজস্বতা হলো শক্তিমত্তা ও নান্দনিকতা।

ইসলামি স্থাপত্যের সূচনাকারী ইমারত মহানবীর মদিনা মসজিদকে ভিত্তি ধরে উমাইয়া শাসনামলে খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক জেরুজালেমস্থিত কুব্বাত আস-সাখরা (৬৯১-৯২) এবং খলিফা আল-ওয়ালিদ কর্তৃক দামেস্ক জামি মসজিদ (৭০৫-৭১৫) নির্মাণের মধ্যদিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় মুসলিম স্থাপত্যের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীকালে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য ও আফগানিস্তান হয়ে দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে সুদূর ভারত উপমহাদেশে এসে পৌঁছায়। তাই খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে (১১৯২) মুহাম্মদ ঘোরি ও তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কুতুব উদ্দীন আইবক কর্তৃক ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশে মুসলিম স্থাপত্যের সূত্রপাত ঘটে। উল্লেখ্য যে, কুতুব উদ্দীন আইবক কর্তৃক কুওয়াতুল ইসলাম (১১৯৫) ও আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ (১১৯৯) এবং কুতুব মিনার (১১৯৯-১২৩০) নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়, যদিও ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস মূলত শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয় দশকে, যাকে প্রাক-সুলতানি মুসলিম স্থাপত্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে।[৫] কিন্তু সে সময়ে নির্মিত ইমারতের অধিকাংশই আজ পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান নয়। তবে সমসাময়িককালে রচিত বিভিন্ন লেখা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত বিবরণী থেকে এগুলোর কোনো কোনোটি সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে 'ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য' (দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্যধারা) কী বা কাকে বলে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য

স্থাপত্য মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দর্পণ। মানব সংস্কৃতির শিরা-উপশিরায় এর ব্যাপ্তি। মনুষ্য ইতিহাসের ধারায় দুটি ঐতিহ্যবাহী অথচ বিপরীতমুখী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয় কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়, যা ঘটেছিল ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের যাত্রাপথে মুসলিম-অমুসলিম উপকরণ তথা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির এবং বিহার ও আশ্রম নির্মাণের মধ্যদিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থাপত্যশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। উল্লিখিত স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– সুষম ও অসম প্রস্তর খণ্ডের ব্যবহার, কাঠের ব্যবহার, চেপ্টা বা পাতলা ইটের ব্যবহার, পোড়ামাটির ফলক ও গুটিকার ব্যবহার প্রভৃতি। এগুলো মৌর্য স্থাপত্যেরও বৈশিষ্ট্য। মৌর্য শাসনের পরবর্তীকালে প্রাক-মুসলিম ভারতে ধর্মীয় ইমারত হিসেবে মন্দির নির্মাণের ধারা অব্যাহত ছিল[৬] এবং এর পূর্বাপর পর্যালোচনায় প্রধানত তিনটি শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত– ইন্দো-আর্য রীতি, যার আকৃতি লম্বমান (পঞ্চম শতকে উত্তর ভারতে বিকশিত); দ্বিতীয়ত– দ্রাবিড়ীয় রীতি, পাশাপাশি মন্দির প্রকোষ্ঠের প্রসারণ (সপ্তম শতকে দক্ষিণ ভারতে প্রস্ফুটিত) এবং তৃতীয়ত– মিশ্র রীতি, খাড়া মন্দির ও তার সঙ্গে পার্শ্বগামী মন্দিরের সমন্বয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন স্থাপত্য আদর্শ (উভয় রীতির

সংমিশ্রণে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত)।[৭] তৎকালীন ভারতীয় স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে ওজি খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ, প্রস্তরখণ্ড সংযুক্তকরণে শলাকা পদ্ধতির ব্যবহার (dowel method of construction), কুলঙ্গি নকশা, ছত্রির ব্যবহার, ঠেকনা ও ছাঁইচের ব্যবহার, বহির্গত বাতায়ন, স্তম্ভ ও সর্দলের সমন্বিত ব্যবহার, শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার, গভীর খোদাই নকশা এবং অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ প্রভৃতি। মুসলমানরা এ উপমহাদেশে আগমন করে যে নির্মাণশৈলী, অলংকরণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হন তা তাঁদের পূর্ব-বিকশিত স্থাপত্য ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র এবং অনেক ক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তথাপিও দুটি ভিন্নমুখী সৃষ্টির বিরোধকে অবজ্ঞা করে এবং আঞ্চলিক আবহাওয়ার সক্রিয় প্রভাবকে উপেক্ষা করে বরেণ্যকে গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তাঁরা সানন্দে স্থানীয় বা প্রাক-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্য রীতিকে গ্রহণ করেছেন। প্রাক-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্য ছিল মূলত স্তম্ভ-সর্দল রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য খিলাননির্ভর ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে খিলাননির্ভর ও স্তম্ভ-সর্দল পদ্ধতির সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা স্থাপত্য ঐতিহ্য এ উপমহাদেশের স্থাপত্য মানসে বা শৈলীতে এক অভূতপূর্ব মনোহারিত্ব সৃষ্টি করে, যা ইন্দো-মুসলিম বা ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য নামে পরিচিত। অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা পূর্বে বিকশিত স্থাপত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে স্থানীয় স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে যে স্থাপত্যধারা গড়ে ওঠে তাই মূলত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য নামে অভিহিত। এই স্থাপত্যধারা ভারতে ব্রিটিশদের রাজকীয় আগমনের (১৮৫৮) পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বয়ে আনা নির্মাণ কলা-কৌশলের সঙ্গে দেশজ নির্মাণ ঐতিহ্যের সংযোজনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এক অভিনবত্বের সূচনা ঘটে। আর এই অভিনবত্বই ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যকে বিশ্ব শিল্পকলা থেকে বিশেষ স্বতন্ত্রতা দান করেছে এবং তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান

প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে যে স্থাপত্যধারা গড়ে ওঠে তা জাতিগত বিভাজনের কারণে হিন্দু স্থাপত্য, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও জৈন স্থাপত্য নামে পরিচিত। কিন্তু প্রাক-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্য বিশেষ করে মন্দির স্থাপত্য শৈলীগত ভিন্নতার কারণে ইন্দো-আর্য রীতি, দ্রাবিড়ীয় রীতি ও মিশ্র রীতি– এই তিনটি বিশেষ রীতিতে চিহ্নিত, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর উক্ত স্থাপত্যধারার অনেক বৈশিষ্ট্য মুসলিম শাসকগণ তাঁদের নির্মিত ইমারতসমূহে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন, যেগুলো স্থানীয় বা স্বদেশী কিংবা দেশজ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে বহির্ভারতীয় নির্মাণ রীতির পাশাপাশি স্থানীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে প্রাথমিক যুগের ইমারতসমূহে বিশেষ করে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ও আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদের আচ্ছাদন ব্যবস্থা হিসেবে বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহ্য খিলান ছাদের পরিবর্তে চাঁদোয়া ছাদের (lantern ceiling) ব্যবহার দৃশ্যমান (রেখাচিত্র-১; আলোকচিত্র-১)। এই ধরনের ছাদ নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্য রীতির চাঁদোয়া ছাদ নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলেই ধারণা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চম শতকে নির্মিত কর্ণাটকস্থিত লাদখান মন্দিরের কথা বলা যায় (আলোকচিত্র-২)।[৮] তাছাড়া কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দার খিলানগুলোর শীর্ষদেশে যুগল বক্রাকৃতির মিলনস্থলে ওজি (ogee) আকৃতি ধারণ করেছে (রেখাচিত্র-২; আলোকচিত্র-৩)।[৯] অর্থাৎ এসব খিলানের যুগল বক্রতার মিলনস্থলের আকৃতি যে হিন্দু নির্মাতাগণের বৌদ্ধ চৈত গবাক্ষে ব্যবহৃত খিলানের আকৃতি থেকে গৃহীত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায় (আলোকচিত্র-৪)।[১০]

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের অপর বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে খিলান এবং গম্বুজ নির্মাণ (রেখাচিত্র-৩ ও ৪)। এটি নিঃসন্দেহে স্থানীয় তথা প্রাক-মুসলিম ভারতীয় নির্মাণ রীতি (আলোকচিত্র-৫ ও ৬ক)। এস. এম. হাসান যথার্থই বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণ রীতি হিন্দু কারিগর ও শিল্পী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (The employment of Hindu masons and artists led to the introduction of ancient India architectural features such as corbelled dome।)[১১] প্রাক-মুসলিম এই নির্মাণ রীতিটি (ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ) ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রাথমিক যুগের ইমারতসমূহে, যেমন- দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (আলোকচিত্র-৬খ), আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ, সুলতান ঘোরির সমাধি (আলোকচিত্র-৬) প্রভৃতির খিলান ও গম্বুজ নির্মাণে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য, ভারতের স্থানীয় এই নির্মাণ ঐতিহ্য ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রারম্ভিক যুগের ইমারতসমূহে পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে প্রকৃত খিলান ও গম্বুজ নির্মাণের ধারা সূচিত হয়, যা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম স্বকীয় রীতি।

খিলান ও সর্দলের সমন্বিত ব্যবহার ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার অন্যতম উদাহরণ হলো মামলুক আমলে নির্মিত আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ও তুগলক আমলে নির্মিত গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সমাধি (১৩২৫)। পরবর্তীকালে সৈয়দ ও লোদি স্থাপত্যে এ বৈশিষ্ট্যটি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়, যা মোগল আমলে বিশেষ করে আকবরি স্থাপত্য ধারার এক ঐতিহ্যবাহী রীতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত আগ্রা দুর্গের (১৫৬৫-৭৩) আকবরি মহল ও জাহাঙ্গিরি মহল উভয় ইমারতেই আলোচ্য বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। উল্লেখ্য যে, খিলানের ব্যাপ্তি অধিক বিবেচিত হওয়ায় নির্মাতাগণ হয়তো এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, সেজন্য তারা খিলানের সঙ্গে সর্দলের সমন্বিত ব্যবহার করে থাকতে পারেন এবং এটি ভারতের স্থানীয় নির্মাণ রীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি স্থানীয় নির্মাণ কারিগরদের মনোভাবের প্রতিফলন হতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, উল্লিখিত ইমারত নির্মাণের বহু পূর্বেই সর্দল ও খিলান সমন্বিত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মুসলিম স্থাপত্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কুব্বাত আস-সাখরার সর্দল ও খিলান সংবলিত প্রবেশপথের কথা বলা যেতে পারে। সর্দল ও খিলানের

সমন্বয়ে গঠিত এ বৈশিষ্ট্যটি সিরিয় রীতি থেকে উৎসারিত, যার উদাহরণ হলো, বসরার গির্জা ও এযরার সেন্ট জর্জ গির্জা (৫১৫-১৬)।[১২] উল্লেখ্য যে, মুসলিম স্থাপত্যে কুব্বাত আস-সাখরায় সর্বপ্রথম খিলান ও সর্দলের সমন্বিত ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে আর কোনো ইমারতে এ ধরনের নির্মাণ রীতি অনুসৃত হয়েছে কি-না তা জানা যায় না। ফলে এই বৈশিষ্ট্যটি যে স্থানীয় বা দেশজ স্থাপত্য রীতি থেকে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে তা অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

গম্বুজ শীর্ষে শিরোচূড়ার ব্যবহার ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যে আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদে সর্বপ্রথম শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার দৃশ্যমান, যা আলাই দরওয়াজাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে (আলোকচিত্র-৭)। উল্লেখ্য যে, সুলতানি আমলে মুসলিম স্থাপত্য ধারায় সংযোজিত প্রাক-মুসলিম এই বৈশিষ্ট্যটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আকারে তথা রূপান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোগল স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে, যার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আগ্রার তাজমহলে (সপ্তদশ শতক)। উল্লেখ্য যে, আলাই দরওয়াজাতে *আমলকি* শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও মোগল স্থাপত্যে পদ্ম ও কলস সংবলিত শিরোচূড়ার ব্যবহার বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই বৈশিষ্ট্যটি হিন্দু মন্দির স্থাপত্য থেকে অনুসৃত বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে কাঞ্চিপুরামের কৈলাসনাথ মন্দির (আনু. ৭০০) ও খাজুরাহের মন্দিরের (আনু. ১০০০) নামোল্লেখ করা যায় (আলোকচিত্র-৮)।[১৩] প্রসঙ্গত শীর্ষদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত *আমলকির* সঙ্গে প্রাথমিক যুগের ভারতীয় শিল্পকলার 'অমল শিলা' বা বিশুদ্ধ প্রস্তরের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। তাছাড়া অনেকেই এই ধরনের ফলককে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর প্রিয় ফুল নীল পদ্মের গোটা বা বোটার প্রতীক বলে মনে করে থাকেন।[১৪] আবার শীর্ষদণ্ড হিসেবে কলসের ব্যবহার ভারতীয় মন্দির চূড়াতে দেখা যায়। কলসাকৃতির শীর্ষদণ্ডকে হিন্দু স্থাপত্যে দেবতার পানীয় রসের পাত্রের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম ইমারতের গম্বুজ চূড়ায় এরূপ পদ্ম ও কলস সংবলিত শীর্ষদণ্ড সংযোজন ব্যাপক পরিদৃষ্ট হয়। তবে সৌন্দর্যের খাতিরে এই ধরনের প্রতীক সংবলিত শীর্ষদণ্ড হিন্দু মন্দির থেকে অনুকৃত হলেও এতে হিন্দু ধর্মের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। কেবল আলংকারিক উপকরণ হিসেবে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এর সম্মিলন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। তবে এটি প্রণিধানযোগ্য যে, শীর্ষদণ্ড হিসেবে সমাধি গাত্রে কলসের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির তৃষ্ণার্ত আত্মা জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হয়তো খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে নাবাতীয় আরবরা প্রস্তর সমাধি গাত্রে জলপাত্র বা কলসের নকশা খোদিত করত।[১৫]

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ করে মোগল স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (আলোকচিত্র-৯)। এ ধরনের ছত্রির সংযোজন ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে নতুন কোনো উদাহরণ নয়, বরং এটি হিন্দু স্থাপত্যরীতি থেকে উৎসারিত।[১৬] প্রসঙ্গত পঞ্চম শতকে নির্মিত রাজস্থানের

বন্ধির মণ্ডপসহ অন্যান্য ইমারতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় (আলোকচিত্র-১০)। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এই ধরনের ছত্রির ব্যবহার প্রথম পরিদৃষ্ট হয় সৈয়দ আমলে নির্মিত মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধিতে (পঞ্চদশ শতক)। পরবর্তীকালে এই রীতি লোদি স্থাপত্যের মাধ্যমে ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে উৎকর্ষ লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে মোগল আমলে নির্মিত পুরান কিল্লার তালাকি দরওয়াজা, দিল্লির লাল গম্বুজ, যোদবাই প্রাসাদ, আগ্রা-গোয়ালিয়র রোডে নির্মিত নুরাবাদ সেতু, বিরাট নগরের শিকারগাহ (১৬২০), এলাহাবাদের খসরুর সমাধি (১৬২২-২৫), লালকেল্লার শাহ বুরুজ ও দিওয়ান-ই-খাস প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। তবে মোগল স্থাপত্যে ব্যবহৃত ছত্রি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত তথা রূপান্তরিত আকারে অনুসৃত হয়েছে। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অপর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অবনমন সংবলিত দেয়াল (battering-wall) নির্মাণ, যা তুগলক আমলের ইমারতসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। এই রীতিটিও প্রাক-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্য রীতি থেকে উৎসারিত বলেই অনুমেয়। প্রাচীন ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় (আনু. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২০০০) অবস্থিত ইমারতে অবনমন সংবলিত দেয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৭] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নিম্নাংশের ভিত্তিমূলে ঊর্ধ্বাংশের পুরু দেয়ালের প্রবল চাপ কমানোর জন্য এ ধরনের নির্মাণ রীতি কাদা মাটি বা ইটের তৈরি দেয়ালের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া বিরাটকায় পাইলন প্রবেশপথ (pylon gateway[১৮]) নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এক অনন্য শৈলী (আলোকচিত্র-১১)। ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে সংযোজিত, যথা– বেগমপুরী মসজিদের পাইলন প্রবেশপথ। এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা করা হয়। তবে এই ধরনের প্রবেশপথ নির্মাণে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দিরের বিশাল প্রবেশপথ গোপুরাম (*gopuram*)-এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।[১৯] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতানগণ অনুরূপ ইমারত নির্মাণে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, যার অন্যতম উদাহরণ হলো জৌনপুর জামি মসজিদ (১৪৩৮-৭৮)।

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের অনেক ইমারতেই বিশেষ করে মোগল স্থাপত্যের ধর্মীয় ও লৌকিক উভয় প্রকার ইমারতে ছাঁইচ (*chhajja*) এবং *ঠেকনার* (bracket) ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত (আলোকচিত্র-৯)। আলোচ্য রীতিদ্বয় ভারতের স্থানীয় নির্মাণ ঐতিহ্যের এক স্বকীয় উদাহরণ, যথা– রাজস্থানের বুন্ধীর মণ্ডপ (৫ম শতক) ও একাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে নির্মিত বলে অনুমেয় (আলোকচিত্র-১৪)।[২০] উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারণে অর্থাৎ সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও বৃষ্টির ঝাপটা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে সম্ভবত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ করে মোগল ইমারতসমূহে ছাঁইচ বা *চাজ্জা*র ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। অনুরূপভাবে উক্ত ছাঁইচ কিংবা ঝুল বারান্দা (ঝড়োকা বাতায়ন) যাতে করে সহজেই ভেঙে না পড়ে তথা মজবুতকরণের লক্ষ্যে এ ধরনের *ঠেকনা* ব্যবহার অপরিহার্য ছিল বলেই ধারণা করা যায়, যা স্থানীয় স্থাপত্য রীতির যথার্থই প্রতিফলন। অর্থাৎ প্রাক-মুসলিম ভারতের অধিকাংশ ইমারতে

বিশেষ করে মন্দির স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। এছাড়া ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বর্শাফলক অলংকরণ (রেখাচিত্র-৫), যা সুলতান ঘোরির সমাধিতে প্রথম পরিলক্ষিত হলেও খলজি আমলে নির্মিত আলাই দরওয়াজা (আলোকচিত্র-১২) ও জামাতখানা মসজিদে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। বলা বাহুল্য, এরূপ অলংকরণ রীতি তুর্কি আনাতোলিয়া থেকে আমদানিকৃত বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অলংকরণ বৌদ্ধ চৈত্যে ব্যবহৃত খিলানের নবরূপ হিসেবে ভারতীয় কারিগরদের সৃষ্টি বলেই অনুমেয় (আলোকচিত্র-৪)। তবে কেউ কেউ এরূপ অলংকরণ সংবলিত প্রবেশদ্বারকে জৈন তোরণপথের অলংকরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২১] যাহোক ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত এই বৈশিষ্ট্যটি যে স্থানীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের এক অনন্য অবদান তা অনস্বীকার্য।

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদে প্রথম বহির্গত বাতায়নের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি মোগল আমলে বিশেষ করে আকবরি স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। সম্রাট আকবরের *রাণীওয়াজ* (যোদবাই) প্রাসাদের বহির্গত ঝড়োকা বাতায়ন (আলোকচিত্র-১৩) স্থানীয় স্থাপত্য রীতির প্রতিফলন এবং দিল্লির সোমনাথ মন্দির এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ (আলোকচিত্র-১৪), যা *মহল-ই-এলাহী* এবং পাঁচ মহলে অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ঝড়োকা দর্শন ভারতের এক প্রাচীন প্রথা। সেই সময়ে প্রজাসাধারণ বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যহ কমপক্ষে দু-বার রাজা বা বাদশাহের দর্শন না করে দিনের কর্ম শুরু করত না। সম্রাট আকবর প্রাচীন ভারতীয় এই রীতি অনুযায়ী প্রজাবর্গের নিকট দিনে দু-বার দর্শন দেওয়ার লক্ষ্যে স্বীয় স্থাপত্যকর্মে ঝড়োকা বাতায়ন নির্মাণ করে থাকতে পারেন।[২২] অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যটি স্থানীয় অমুসলিম ঐতিহ্য বিশেষ করে রাজপুতনা ও গুজরাটের হিন্দু স্থাপত্য ঐতিহ্যেরই এক অনন্য নিদর্শন। এই রীতি পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট শাহজাহানের সময়ও সযত্নে লালিত হয়েছে, যদিও সম্রাট আওরঙ্গজেব আলোচ্য রীতিকে অনৈসলামিক প্রথা হিসেবে আখ্যায়িত করে রহিত করেন। প্রসঙ্গত, সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রজাদের দর্শন দানের লক্ষ্যে যে ঝড়োকা ব্যবহার করতেন সেটি সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা দুর্গের *মুসাম্মান* বুরুজের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এবং আলোচ্য বুরুজটি *ঝড়োকা-ই-দর্শন* নামে পরিচিত। তাছাড়া এই প্রাসাদের (যোদবাই প্রাসাদ) উপরিতলায় সংস্থাপিত হয়েছে ছত্রি শোভিত দুটি ত্রিভূজাকৃতির খাপ্রিল বা চপ্পর নির্মিত চন্দ্রাতপ। এই ধরনের চপ্পর খাট আকবরের সমাধি সৌধের চার আঙ্কিক ইওয়ান-ই-প্রবেশ পথের উপরেও দৃশ্যমান (আলোকচিত্র-১৫)। অনুমান করা হয় যে, বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত গোয়ালিয়র মানমন্দির (১৪৮৬ - ১৫১৬) থেকে অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। অনুরূপভাবে খোয়াবগাহ কমপ্লেক্সের এক কক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকার চন্দ্রাতপের ঘুরানো বারান্দার ছাদ পাথরের ঢালু খাপ্রিল বা চপ্পর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। খাপ্রিল বা চপ্পর ছাদযুক্ত এরূপ বারান্দা সমসাময়িক গ্রামীণ কুঁড়েঘরের মাটির

তৈরি খাপ্রিল ছাদের অনুকরণে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়।[২৩] কারণ, সম্রাট আকবর গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে স্বীয় নির্মাণকার্যে এতদঞ্চলের মাটি ও মানুষের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যার প্রথম পরিস্ফুটন ঘটেছিল ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে।

মোগল আমলে নির্মিত হুমায়ূনের সমাধির জটিল অষ্টভুজী পরিকল্পনা (ভূমি নকশা-১) কেবল ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যেই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসেও এক নতুন সংযোজন, যা আগ্রার তাজমহলে পরিপূর্ণতা লাভ করে (ভূমি নকশা-২)। এরূপ জটিল অষ্টভুজী পরিকল্পনা সংবলিত কোনো সমাধি সৌধের প্রথম তলা ভারতের বাইরে পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব বা মিশরে ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। বহির্গাত্রের কুলঙ্গি, বহির্বর্তন এবং প্রদক্ষিণ পথের ধারণাকে বিবেচনায় নিলে, হুমায়ূনের সমাধির ভূমি পরিকল্পনা সম্ভবত বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যস্থিত বেলারী জেলার হেমাকুট মন্দিরের গৃহ পরিকল্পনার সংশোধিত ও সম্প্রসারিত রূপ বলেই মনে হয়।[২৪] অনুরূপভাবে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত হলো যা পাঁচ তলা বিশিষ্ট সম্রাট আকবরের সমাধি (১৬০৫-১২), তবে উত্থান পর্বে এর তলাসমূহ ক্রমশ আকার ও আয়তনে ছোট। এ ধরনের অবকাঠামো সংবলিত সমাধি সৌধ ইতঃপূর্বে মুসলিম স্থাপত্যের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। এমনকি দিল্লির সৈয়দ, লোদি অথবা সুরদের আমলে নির্মিত বর্গাকার ও অষ্টভুজী সমাধি সৌধ থেকেও এটি ভিন্নতর। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, এরূপ সমাধি নির্মাণের অনুপ্রেরণা স্থানীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য থেকে অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ এর স্থাপত্য উৎসের মূল ভারতের মাটিতেই প্রোথিত ছিল বলে অনুমিত। এ প্রসঙ্গে কাঞ্চিপুরামের বৈকুণ্ঠপেরুমল মন্দিরের (৭১০-২০) অবকাঠামোর (রেখাচিত্র-৬) সঙ্গে আলোচ্য সমাধির গঠনশৈলীর তুলনা করা যেতে পারে।[২৫] এই মন্দিরও পাঁচটি স্তরের সমন্বয়ে নির্মিত, যদিও প্রতিটি তলা আকবরের সমাধির ন্যায় সমায়তনে হ্রাস পায়নি। তথাপিও বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের পাঁচ তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের ধারণাটি এই মন্দিরের আদর্শ (model) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারে।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বহির্দেশীয় রীতির পাশাপাশি দেশজ বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ স্বদেশি ও বিদেশি উৎস থেকে নির্দ্বিধায় আহৃত উপকরণে পরিপুষ্টতা লাভ করে দিল্লির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য ক্রমান্বয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে কেবল বিবর্তনই সৃষ্টি করেনি, বরং জন্ম দিয়েছে এক নতুন স্থাপত্য ধারারও যা ইসলামি স্থাপত্যের গোত্রভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে সংঘাত থাকলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো বিরোধ ছিল না। বরং তারা স্থানীয় জনগণের আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ

করে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালন-পালন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অনেক বিষয় নিয়ে এখনও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। কেননা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের যে রূপরেখা তা অন্য যে কোনো স্থাপত্যধারা থেকে দর্শনীয়ভাবে আলাদা। দেশজ উপরকণসমৃদ্ধ এই স্বতন্ত্রতাই ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যকে এক নতুন ও কাঙ্ক্ষিত অবস্থান দিয়েছে, যার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন স্থাপত্য ঐতিহ্য পরিস্ফুটিত হয়েছে।

রেখাচিত্র

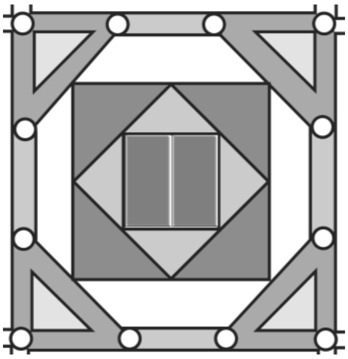

রেখাচিত্র-১ : চাঁদোয়া ছাদ (lantern ceiling)

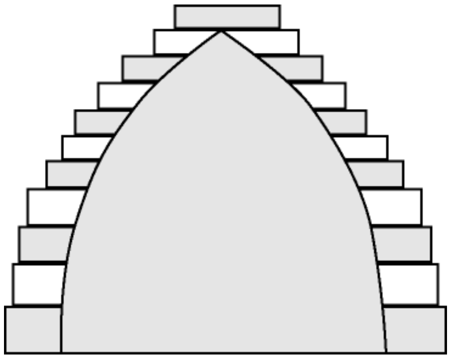

রেখাচিত্র-২ : ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান

রেখাচিত্র-৩ : ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান

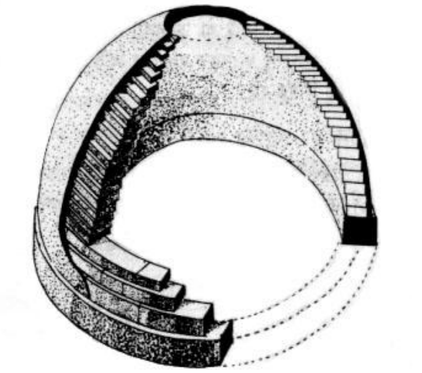

রেখাচিত্র-৪ : ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত গম্বুজ

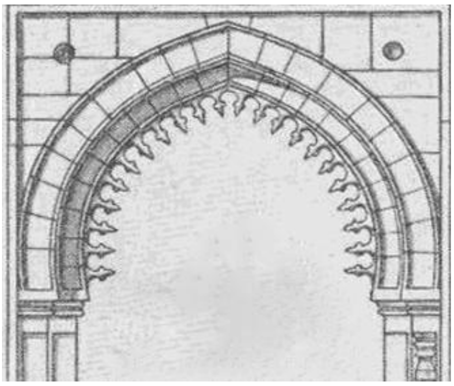

রেখাচিত্র-৫: বর্শাফলক অলঙ্করণ (spear-head design)

রেখাচিত্র-৬ : বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির, কাঞ্চিপুরাম, তামিলনাড়ু

ভূমি নকশা

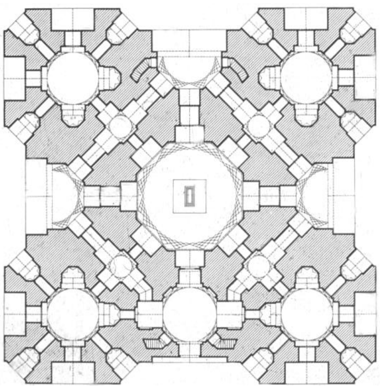

ভূমি নকশা-১ : জটিল অষ্টভুজী ভূমি পরিকল্পনা
[হুমায়ূনের সমাধি]

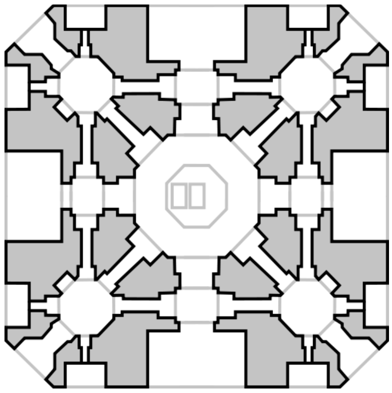

ভূমি নকশা-২ : জটিল অষ্টভুজী ভূমি পরিকল্পনা
[তাজমহল]

আলোকচিত্র

আলোকচিত্র-১ : চাঁদোয়া ছাদ
[আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া মসজিদ]

আলোকচিত্র-২ : চাঁদোয়া ছাদ
[লাদখান মন্দির (৫ম শতক)]

আলোকচিত্র-৩ : কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ওজি খিলান

আলোকচিত্র-৪ : বৌদ্ধ চৈত্য গবাক্ষ

আলোকচিত্র-৫ : কোনারকস্থিত (Konark) সূর্য মন্দিরে ব্যবহৃত ক্রমপ্রলম্বন খিলান

আলোকচিত্র-৬ : সুলতান ঘোরির সমাধিতে (১২৩১) ব্যবহৃত ক্রমপ্রলম্বন খিলান

আলোকচিত্র-৬ক : রাজস্থানের রনকপুরস্থিত চৌমুখা মন্দিরের (জৈন মন্দির) ক্রমপ্রলম্বন গম্বুজ

আলোকচিত্র-৬খ : কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ক্রমপ্রলম্বন গম্বুজ

আলোকচিত্র-৭ : গম্বুজ শীর্ষে শিরোচূড়ার ব্যবহার
[আলাই দরওয়াজা]

আলোকচিত্র-৮ : গম্বুজ শীর্ষে শিরোচূড়ার ব্যবহার
[খাজুরাহ মন্দির]

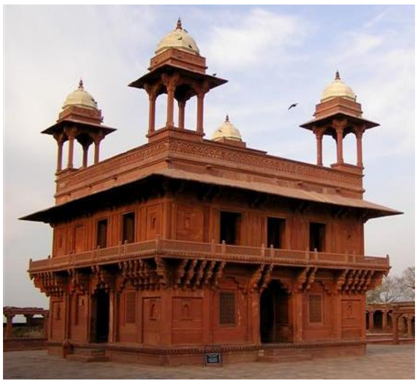

আলোকচিত্র-৯ : ছত্রি, ছাঁইচ ও ঠেকনার ব্যবহার
(দিওয়ান-ই-খাস, ফতেপুরসিক্রি, আগ্রা)

আলোকচিত্র-১০ : ছাঁইচ ও ঝড়োকা বাতায়ন (বন্ধির মণ্ডপ, রাজস্থান)

আলোকচিত্র-১১ : পাইলন প্রবেশপথ [বেগমপুরি মসজিদ]

আলোকচিত্র-১২ : আলাই দরওয়াজার বর্শাফলক অলঙ্করণ

আলোকচিত্র-১৩ : সম্রাট আকবরের *রাণীওয়াজ* (যোদবাই) প্রাসাদের ঝড়োকা বাতায়ন

আলোকচিত্র-১৪ : ঝড়োকা বাতায়ন (সোমনাথ মন্দির)

আলোকচিত্র-১৫ : আকবরের সমাধির ইওয়ান-ই-প্রবেশ পথের উপরিস্থ চপ্পর খাট

বি. দ্র. রেখাচিত্র, ভূমি নকশা ও আলোকচিত্রসমূহ Internet; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*; R. Nath, *History of Sultanate Architecture*; G. Michell (ed.), *Architecture of the Islamic World*; Ebba Koch, *Mughal Architecture* প্রভৃতি উৎস ও গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান : একটি সমীক্ষা' শিরোনামের এই প্রবন্ধে কেবল দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত দেশজ নির্মাণ রীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে কোনো প্রাদেশিক স্থাপত্যধারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া প্রাদেশিক স্থাপত্য ঐতিহ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকায় কোনো একটি প্রবন্ধে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

২. এ বি এম হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৬), পৃ. ৩; K. A. C. Creswell, *The Muslim Architecture of Egypt,* vol. I (Ikhshid and Fatimid), (Oxford: The Clarendon Press, 1951), p. 110

৩. স্থাপত্যকলা চর্চার কারণ হিসেবে বলা যায়– ক) রাজনৈতিক কারণ : গ্রেকো-রোমান আমলে অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মিত হয়েছে, সাসানো-বাইজান্টাইন আমলেও একই চিত্র লক্ষণীয়, এমনকি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেও ঠিক অনুরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত, সুতরাং মুসলিম শাসনামলে সমরূপ ইমারত নির্মিত না হলে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়বে, এমন

ধারণা থেকেই হয়তো মুসলিম শাসকবর্গ স্থাপত্যকলা চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়; খ) সামাজিক কারণ : বিজিত অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতা দর্শনে বিমোহিত হয়ে মুসলিম শাসকগণ উন্নত সংস্কৃতি গড়ার মানসে স্থাপত্যকলা চর্চায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারেন; গ) ধর্মীয় কারণ : অমুসলিমদের উন্নত স্থাপত্য ঐতিহ্য দর্শনে বিজয়ী মুসলমানরা হীনমন্যতায় পড়তে পারেন, অথবা তাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে পারেন এমন ধারণা থেকেই মুসলিম শাসকগণ অপরূপ সুন্দর শিল্পকর্ম বিশেষ করে স্থাপত্যিক ইমারত নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন বলে অনুমেয়।

৪. ইসলামি স্থাপত্যের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– আরব্য নকশা, জ্যামিতিক নকশা, লিপি নকশা এবং বিমূর্ত অলঙ্করণ বিষয়বস্তু যেগুলো সাধারণত অগভীর খোদাই পদ্ধতিতে সৃষ্ট।

৫. ৭১২ সালে মুহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিম স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শন ও সমসাময়িক বিবরণী থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়। যেমন– আল-মাহফুজা ও আল মানসুরা দুর্গ নগরী (৭২৩), ভ্যাম্বোর মসজিদ (৭২৭), সুলতান মাহমুদের মসজিদ ও মিনার (৯৯৮-১০৩০), সোহদ্রার মিনার (১০২১), খালিদ ওয়ালিদের সমাধি (৯৯৮-১০৩০), ইউসুফ গারদেজীর সমাধি (দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) প্রভৃতি প্রাক-সুলতানি মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন।

৬. সেই সময়ে ভারতে যেসব লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছিল তার কোনো বিদ্যমান নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭. http://www.culturalindia.net/indian-architecture/ancient-architecture/temple-architecture.html

৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Lad_Khan_Temple.

৯. Ogee Arch: An arch with a pointed apex, formed by the intersection of two S curves usually confined to decoration and not used in arcade arches; সূত্র- http://www.pitt.edu/~medart/menuglossary/ogee.htm.

১০. R. Nath, *History of Sultanate Architecture* (Delhi: Abhinav Publications, 1978), p 10

১১. S. M. Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1980), p. 36

১২. এ বি এম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০ ও ৫৩

১৩. B. Rawland, *Art and Architecture of India* (London: Penguin Books, 1953), p. 183, pl. 117B; A. K. Kumarshamwi, *History of India and Indoneshian Art* (Delhi: Munshilal Monharlal Publishers Pvt. Ltd., 1972), pl. LXIV

১৪. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৬), পৃ. ৯৩, পাদটীকা-৬ক; P. Brown, *Indian Architecture* (Budhist and Hindu Period), (Bombay, Taraporevals Sons & Co. Ltd., 1959), p. 11; E. B. Havell, *Indian Architecture Through Ages* (Delhi: Asian Publishing Service, 1978), p. 8

১৫. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০, পাদটীকা-৭৯

১৬. John Flaming, *The Penguin Dictionary of Architecture* (New York: Penguin Books, 1966), p. 54

১৭. P. Brown, *op. cit*., p. 1; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭, পাদটীকা-৩

১৮. Pylon is the Greek term for a monumental gateway of an Egyptian temple. It consists of two tapering towers, each surmounted by a cornice, joined by a less elevated section, which enclosed the entrance between them. সূত্র- http://en.wikipedia.org/wiki/Pylon_(architecture)

১৯. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১-১০২; John Flaming, *op. cit*., p. 96

২০. *Internet* থেকে গৃহীত তথ্য।

২১. মোশারফ হোসেন, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলংকরণ: উৎস ও ক্রমবিকাশ, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৫৬; Satish Grover, *The Architecture of India : Islamic (727-1707)* (Delhi: Vikas Publishing House, 1981), p. 26

২২. মো. মোখলেছুর রহমান, *মুঘল স্থাপত্য* (রাজশাহী : সমন্বয়, সাগরপাড়া, ২০১১), পৃ. ১০৪, পাদটীকা-৬৯

২৩. *তদেব*, পৃ. ৯৬-৯৭ ও ১০২

২৪. R. Nath, *History of Mughal Architecture,* vol. I (Delhi: Abhinav Publictions, 1982), pp. 263-65; মো. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬১

২৫. মো. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫৩; R. Nath, *History of Mughal Architecture,* vol. III, p. 393, fig-72

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মুহাম্মদ সাজ্জাদ আহসান*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সাহিত্য থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি অপ্রত্যক্ষ না হলেও এ ধরনের চলচ্চিত্রের সংখ্যা বা সেগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোনোরূপ গবেষণা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ১৯৫৬ সালে নাটক থেকে নির্মিত 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে এদেশে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের যাত্রারম্ভ হলেও অপরাপর কোনো কোনো সাহিত্য আঙ্গিক থেকে চলচ্চিত্র সৃজিত হয়েছে অথবা কেন সাহিত্যকে চিত্রনাট্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য মেলে না। সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় এর মোদ্দা ধরনগুলো চিহ্নিত করা এই গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। গুণগত গবেষণা পদ্ধতির আলোকে প্রধানত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার থেকে গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে উচ্চকিত প্রশ্নগুলোকে অধিকতর যাচাইয়ের লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট গবেষণায় রূপান্তরিত চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্মাতা ও সাহিত্য রচয়িতার কাঠামোধর্মী সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সহায়ক তথ্যপঞ্জি এবং সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার বিশ্লেষণে এই গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের মৌল প্রবণতাসমূহ। ১৯৫৭ থেকে ২০১৮ সালের মে মাস অবধি নির্মিত সাহিত্য-উৎসজাত চলচ্চিত্রের একটি তালিকা প্রণীত হয়েছে। প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণে দেখে যায় যে, রূপান্তরিত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রারম্ভিক পর্যায়ে চয়িত সাহিত্য-উৎসের নান্দনিক মূল্য বিচার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলেও উত্তরকালে সাহিত্যের জনপ্রিয়তাই বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ঝুঁকি মোকাবেলায় গৃহীত রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের কৌশলসমূহ এবং তদনুযায়ী ওই চলচ্চিত্রগুলোর সাফল্য এবং ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাক্‌কথন

সাহিত্যের অনুজ শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র সাহিত্যের প্রভাবযুক্ত– এমনতর সহজাত ভাবনা নিশ্চিতই চলচ্চিত্রের স্বকীয়তার পরিপন্থি। আবার অনুজ শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে সাহিত্যের কোনো প্রভাব নেই একথাও অযৌক্তিক মনে হয়। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শুরুতে বহুসংখ্যক চিত্রনাট্য কোনো কোনো সাহিত্য আঙ্গিক যেমন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প বা কাব্য-উৎস অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি রূপান্তরিত চলচ্চিত্রেই চয়িত সাহিত্য-উৎসের এক নবতর ব্যাখ্যা অপ্রত্যক্ষ নয়। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যদি রূপান্তরিত চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্র-নির্মাতার স্বব্যাখ্যাত দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রযুক্ত হয় তাহলে স্বরচিত চিত্রনাট্যের বদলে অপরাপর সাহিত্যিক উৎসকে কেন চিত্রনাট্য তৈরির আধার হিসেবে বেছে

---

* অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার।

নেয়া হয়? এই বাছাই প্রক্রিয়ায় উক্ত সাহিত্যিকের শুধু গল্পটিই কি চলচ্চিত্র-নির্মাতাকে আকর্ষণ করে? নাকি প্রকাশিত লেখার জনপ্রিয়তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়? পরনির্ভর এই চিত্রনাট্য তৈরির সময় মূল লেখকের সামাজিক, দার্শনিক বা মতাদর্শগত কোনো পদছায়াই কি চলচ্চিত্রকারকে টানে না? পরনির্ভর চিত্রনাট্য তৈরির সময় মূল লেখার কী কী বিষয় অক্ষুণ্ন থাকে এবং কোন বিষয়গুলোর পরিবর্তন ঘটে, তা না জানলে রূপান্তরের প্রকৃতি বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান প্রবন্ধে তাই সাহিত্য-উৎসের সঙ্গে রূপান্তরের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রায়ণের সূত্রপাত

নবীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে সূচনালগ্নে চলচ্চিত্রকে মঞ্চ-নাটকের প্রেক্ষাগৃহ আশ্রয় করে এর প্রদর্শনী শুরু করতে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই চলচ্চিত্র প্রথমে পৌঁছাতে চেয়েছে মঞ্চনাটকের জন্য প্রস্তুত দর্শক সাধারণের রুচির কাছে। স্বভাবতই চলচ্চিত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছে এই দর্শক রুচির পেছনে ক্রিয়াশীল নান্দনিক শিল্পকৌশলকে। বিনোদন মাধ্যম হিসেবে এই চলচ্চিত্র প্রারম্ভে এক বা একাধিক ঘটনা বা ক্রিয়ার (যেমন, স্টেশনে রেলগাড়ির আগমন কিংবা পানির পাইপে জল ছিটানো) প্রদর্শন করলেও অতি দ্রুতই তা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিকটিকে অবলম্বন করে নিয়েছে।[১] নাটকের গল্প, গল্পের বুননে দ্বন্দ্ব ও দ্বান্দ্বিক শক্তিসমূহের যুযুধানে উৎপন্ন সংঘর্ষ এবং চূড়ান্ত সাংঘর্ষিক অবস্থার পর সংঘাতের অপনোদন তথা নাটকের সমাপ্তির যে রূপগত শৃংখলা, চলচ্চিত্র সেই রীতির অনেক কিছুই অবলম্বন করেছে এর প্রারম্ভিক পর্যায়ে।

গত একশ বছরে চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের নানা পর্যায়ে সৃজিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটি এখনো অমীমাংসিত। বিশেষত সাহিত্যের চলচ্চিত্রে রূপান্তরের প্রসঙ্গটি গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে যে ধারণাটি তা হলো এতদুভয়ের বিশ্বস্ততার বিষয়। ম্যাক ফারলেন তাঁর *উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, বিশ্বস্ততা এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমোদন অথবা অবিশ্বস্ততা তথা অননুমোদন এ দুটোরই কোনো নির্ভযোগ্য সূত্র নেই।[২]

বিশ্বস্ততার দায় থেকে মুক্তির বিষয়টি চলচ্চিত্রের জন্য জরুরি। কেননা চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য মেধাস্বত্ব (copyright) জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে সাহিত্য ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি চলচ্চিত্রের জন্যে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এমন কি সুদূর অতীতে সৃজিত ধ্রুপদী সাহিত্যের অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টিও খুব সহজ নয়। ধ্রুপদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়তো সেখানে লেখকের স্বত্ব ক্রিয়াশীল থাকে না, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান সেই সাহিত্যকর্মের স্বত্ব অর্জন করেছে তাদের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে ১৯৮৯ সালে প্রবর্তিত 'নৈতিক অধিকার' আইনটি এ ধরনের সাহিত্যের অধিকার সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠানকে অধিকার দিয়েছে।[৩]

অধিকার প্রাপ্তির এই অর্জনকে চলচ্চিত্র কাজে লাগিয়েছে ভিন্নভাবে। 'গণমাধ্যম আইন' সাহিত্য ব্যবহারের এই অর্জনকে উত্তরকালে চলচ্চিত্রের পক্ষে ক্রিয়াশীল হতে সহায়তা করেছে। যে মুহূর্তে সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণের মেধাস্বত্ব অর্জিত হয় সেই মুহূর্তে মূলত চলচ্চিত্র প্রযোজক এই সাহিত্য কর্মের চলচ্চিত্র উপযোগী রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করেন। ফলে সাহিত্যের 'লেখক অধিকর্তার' ধারণাটি খর্ব হয়ে নতুন সত্তা সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র প্রযোজকের অনুকূলে।

তবে যে সকল সাহিত্য কোনো শিল্প মতবাদের অনুবর্তী হয়ে রচিত হয় সমস্যা দেখা দেয় ওই ধরনের সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে। যেমন কার্ল মার্কস্ কিংবা ফ্রয়েডের রচনা। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যস্থিত আন্তরপাঠ প্রবল হয় বিধায় সেসব সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্র রূপায়ণে বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি বড়ো হয়ে উচ্চারিত হয়। প্রশ্ন দেখা দেয় মূলানুগ হওয়ার বিষয়ে। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে নেইল সিনার্ড, চলচ্চিত্র প্রযোজনা গোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক গুণপনায় নির্মিত চলচ্চিত্রটি নান্দনিক উৎকর্ষে সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্মের চেয়ে উন্নততর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যের নান্দনিকতা এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পণ্য হিসেবে চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তার মধ্যে কোনটি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আপাত বিবেচনায় বলা যায়, সাহিত্য, চলচ্চিত্র থেকে, নন্দনতাত্ত্বিক নিরিখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ।[৪]

নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ

নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি পুরোনো হলেও এর প্রক্রিয়া খুব সহজ নয়। বিশেষত নাটকের কাঠামোতে যেমন বহুসংখ্যক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সমন্বয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা (conflict) ত্রিভুজের রেখার মতো কৌণিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছায়। চলচ্চিত্রে এমন একটি চরম উত্তুঙ্গ বিন্দুতে (climax) পৌঁছানোর রীতি ঠিক প্রত্যাশিত নয়। বরং চলচ্চিত্রের কাঠামোতে বহু ছোট উত্তুঙ্গ মুহূর্ত এবং তার পরপর এক ধরনের প্রশান্ত, অচঞ্চল, থিতানো ভাব বা মন্থরতার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রের গল্প কাঠামোটা যেন অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ঢেউ সৃজনের সময় উত্তুঙ্গতা এবং পরমুহূর্তেই শান্ততা। যত্নশীলতা ব্যতিরেকে সহজেই একজন চিত্রনাট্যকারের পক্ষে নাটকের পাণ্ডুলিপিকে চলচ্চিত্রের বিন্যাস-উপযোগী করে তোলা অসম্ভব। এ সম্পর্কে ধীমান দাশগুপ্তের মন্তব্যটি স্মরণীয়–

> এমনিতে নাটক ও চলচ্চিত্র দুয়েরেই প্রাধন লক্ষণ ঘটমানতা। তবু চলচ্চিত্রের স্থান-কাল চেতনা ও ঘটমানতার মান আরও উন্নত দ্রুতি, গতি, বৈচিত্র্য, প্রসার ও অবিরাম ধারাবাহিকতার দরুন সিনেমা বিভাজিত করে নিয়ে ও খণ্ড খণ্ডভাবে দেখিয়েও, পূর্ণ নির্মাণের সময়ে অসংখ্য খণ্ডাংশকে সম্পাদনার মাধ্যমে সংযোজন ও গুণন করে যে চূড়ান্ত শিল্পরূপ তৈরী করে তা নাটকের চেয়ে বেশি নাটকীয়, অভিঘাতী ও মনস্তাত্ত্বিক।[৫]

নাটকের পাণ্ডুলিপিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময় অপর আয়াসসাধ্য কাজটি হচ্ছে সংলাপ নিয়ে কাজ করা। নাটকে স্বভাবতই বর্ণনার চেয়ে সংলাপের আধিক্য থাকে। অপর পক্ষে চলচ্চিত্রে

অধিক সংলাপ ব্যবহার কখনোই কাম্য নয়। চলচ্চিত্র মূলত দৃশ্য ও শব্দনির্ভর শিল্পমাধ্যম বলে এতে সংলাপের ব্যবহার সীমিত। সংলাপকে নাটকে প্রথমত ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় এবং ঘৃণা ও বিস্ময়ের ভাবসমূহ প্রকাশে সহায়ক এই সংলাপ। বাচিক অভিনয়ে এবং শারীরিক তথা আঙ্গিক অভিনয়ের সহায়তায় এই ভাবসমূহ উপস্থাপিত হয়।[৬] চলচ্চিত্রে ভাব প্রকাশের জন্য অনেক সময় ক্যামেরার নৈকটিক শট (close up), প্রতিক্রিয়া বহুল (reaction) শট বা দৃষ্টিকোণ-সম্পর্কিত (point of view) শট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭] এর ফলে অভিনেতার অভিনয়ের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিও ক্যামেরার লেন্স এড়িয়ে যায় না। কুশলী নির্মাতা ক্যামেরার যাচিত শটের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কাছ থেকে ইপ্সিত ভাব দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হন। ফলে সংলাপের ভূমিকা সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে।

নাটকে সংলাপ স্থান-কালের ইঙ্গিতবাহী। মঞ্চায়ন চলাকালে মঞ্চের সীমিত পরিসরে নাট্য পরিমণ্ডল সৃজনে সেট পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতাকে এড়াতে অনেক সময় সংলাপের স্থান-কালের ইঙ্গিত দেয়া হয়। অপরপক্ষে চলচ্চিত্র বহুসংখ্যক খণ্ডিত তথ্য শটের সমবায়ে সৃজিত হয় বলে এতে প্রতিটি শটেই ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডল ধারণ করা সম্ভব। স্বনামখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন 'ফিল্‌ম তোলার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির আজ এতদূর উন্নতি হয়েছে যে কল্পনায় কি বাস্তবের জগতে হেন বস্তু নেই পরিচালকের ইচ্ছামতো যাকে দৃশ্যপর্দায় রূপ দেওয়া না যায়।'[৮]

অর্থাৎ স্থান-কালের উপস্থাপনায় সংলাপের ওপর নাটকের যে মাত্রায় নির্ভরশীলতা থাকে চলচ্চিত্রে তদ্রূপ থাকে না। কেননা সম্পাদনার সময় পর পর যুক্ত শটমূহের মধ্য দিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বিন্যাসের মাধ্যমে স্থান-কালের আনুক্রমিতা খুব সহজেই এড়ানো যায়। পরস্পর গ্রথিত দুটো দৃশ্যের মধ্যে তাই চলচ্চিত্রে যোজন যোজন পার্থক্যকে বা বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করা যায়। সম্পাদনার এই শক্তিশালী দিক সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন, 'চিত্র-সম্পাদকই প্রয়োজন মতো ছাঁটকাট করে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমবায়ে সমগ্র ছবিতে ছন্দগতি এবং ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন।'[৯]

আর সে কারণেই নাটকের মতো স্থান-কাল প্রকাশে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা চলচ্চিত্রে তেমন দরকার হয় না। এমনকি নাট্য পরিমণ্ডল বা চরিত্রের অন্তঃস্থিত ভাবনাকে বোঝানোর জন্য অনেক সময় নাটকে বর্ণনাত্মক যে সংলাপের যোজনা করা হয় চলচ্চিত্রে তারও দরকার হয় না। বর্ণনার বিস্তারে যে প্রকৃতি বা পরিবেশ বোঝানো হয় তা কেবল একটি পরিচিতিকরণ (establishing) শটেই দেখানো সম্ভব। সম্পাদনার কৌশলে একজনের নৈর্ব্যক্তিক মুখচ্ছবির সঙ্গে একটা খাবারের আধার (plate) সম্পাদনার সময় জুড়ে দিয়ে চলচ্চিত্রটিতে ক্ষুধাবৃত্তি বোঝানোর বিষয়টি চলচ্চিত্রে অপরিচিত নয়।

চরিত্রসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বা অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে দর্শক জানাতে সংলাপের যে ব্যবহার তা নাটকের মতো চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায়। দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সংলাপের বদলে আবহশব্দাদি বা প্রকৃতিজাত পরিবেশ প্রতিবেশের শব্দ ব্যবহার অথবা বিচিত্র আলোর ব্যবহার চলচ্চিত্রে খুবই সাধারণ। নির্বাক যুগের পরিক্রমায় চলচ্চিত্র সবাক যুগে প্রবেশ করলেও এর চারিত্র্য লক্ষণে সংলাপের সীমিত ব্যবহারের অভ্যাস রয়ে গেছে। খুবই স্বল্প সংলাপে বা একেবারে সংলাপ ব্যতিরেকে চলচ্চিত্র নির্মাতার অভিজ্ঞতা বিরল নয়। বিশেষত চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নির্মাতার মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। চলচ্চিত্রে সংলাপ ব্যবহারের এই মুন্সিয়ানার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করতে অনেক ক্ষেত্রেই দর্শক বা কুশলী সাহিত্যিককে সংলাপ রচনার দায়িত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ চিত্রনাট্য রচনার কাজটিকে তিনটি ভাগে বিভাজিত করা হয়। যথা– কাহিনি রচনা, চিত্রনাট্য রচনা এবং সংলাপ রচনা। অনেক রক্ষণশীল নির্মাতা নাটক বা টেলিভিশন মাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য নিশ্চিত করতে সংলাপের কুশলী ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ

নাটকের মতো উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও নির্মাতাকে উপন্যাসের আঙ্গিক বা রূপগত পরিবর্তন ঘটাতে হয়। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয় কখনো এর প্রকাশে, কখনো পরিমণ্ডল সৃজনে আবার কখনো নতুন অথবা ভিন্নতর চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে। উপন্যাস ও চলচ্চিত্র এই দুটোরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তবে যে সকল উপন্যাস কোনো প্রকরণ (genre) অনুবর্তী হয়ে রচিত হয়, সমস্যা দেখা দেয় ওই ধরনের উপন্যাসের রূপায়ণ নিয়ে। উপন্যাসের প্রকরণের সাথে রূপায়িত চলচ্চিত্রের প্রকরণের সাদৃশ্য কাম্য।[১০] প্রকরণ অনুগ হলে রূপান্তর সহজতর হয়। তবে সাধারণভাবে উপন্যাসের রূপদেহের অনেক কিছুকেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেমন কাহিনির বুনন তথা প্লট, চরিত্র রূপায়ণ ও বিকাশের কৌশল, ঘটনার অগ্রগতির কৌশল, ভাবনার বিকাশ ও ভাষার প্রকাশ এবং সর্বোপরি স্থানকালের সংকোচন ও সম্প্রসারণের নান্দনিক ভঙ্গি।

প্রতিটি চলচ্চিত্রের একটি দৈর্ঘ্যের সীমা বেঁধে দেয়া আছে। সাধারণত পাঁচ হাজার (৫০০০) মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যর ছবি নিরুৎসাহিত করা হয়।[১১] সীমিত এই পরিসীমায় কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ উন্যাসকে অখণ্ডভাবে চয়ন করা হয়। আবার কখনো বৃহৎ উপন্যাসের পছন্দনীয় অংশকে বাছাই করা হয়। আবার কখনো কখনো একাধিক উপন্যাসের সমবায়ে সৃজিত হয় একটি চলচ্চিত্র। যেমন, বাংলাদেশে সম্প্রতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহ অবলম্বনে নির্মিতব্য 'কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র' চলচ্চিত্রটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[১২]

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো মূল লেখকের শিল্পদর্শনও বদলে যেতে পারে অথবা মূল শিল্পদর্শনের নবতর বা ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। এমনকি

মূলশিল্প দর্শন-অনুবর্তী হয়েও তা কখনো বৈচিত্র্যের বার্তাবাহী হয়ে উঠতে পারে। মূল লেখকের শিল্পদর্শন রূপান্তরের সময় নবতর ব্যাখ্যাবাহী হয়ে ওঠার বিষয়টি এমনিতে ঘটে না। স্থান-কাল-আশ্রয়ী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চাহিদা পরিপূরণের বিষয়টি এই পরিবর্তন ঘটাতে কাজ করে। যেমন ধরা যাক, মূল গল্পে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীন জীবনাচারের বর্ণিল উপস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যের পরিচালক যখন এই গল্প-আশ্রয়ে রূপান্তরিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন তখন স্বাধীন জীবনাচারের উপস্থাপনা রক্ষণশীল সমাজে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তনই নতুন ব্যাখ্যার ইঙ্গিতবাহী।[১৩] মূল লেখকের শিল্পদর্শনের সঙ্গে পরিচালকের শিল্পদর্শনের ভিন্নতা বাংলাদেশে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রে বিরল নয়। প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত *দেবদাস*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে নির্মিত হয়েছে *দেবদাস* নামক দুটো চলচ্চিত্র। ভিন্নকালে ভিন্ন রুচি-আশ্রয়ে স্বভাবতই মূল গল্প এবং চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত গল্পের উপস্থাপনার পার্থক্য সৃজিত হয়।

মূর্তজা বশীরের আত্মজীবনী থেকে চিত্রনাট্য তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সারগ্রাহী মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধান্যযোগ্য। তিনি বলেন—

> হুমায়ূন কবিরের নদী ও নারী উপন্যাসটির চিত্রনাট্য করলাম। বলা যায়, কাহিনীর আমূল পরিবর্তন করলাম। নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি তো করেছিলামই, সেই সঙ্গে উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপের ক্ষেত্রে একজনেরটা আরেকজনের মুখে বসিয়ে দিয়েছি। অবশ্য ঔপন্যাসিকের অনুমতি নেওয়ার জন্য চিত্রনাট্য পাঠানো হয়েছিল। চিত্রনাট্য পড়ে হুমায়ূন কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সিনেমাটি অবশ্য চলেনি। গুলিস্তান হলে প্রদর্শিত হতে পেরেছিল মাত্র দুই দিন। খুবই একসপেরিমেন্টাল ছিল ছবিটি। ব্ল্যাক ফ্রেম, ফ্রিজশট, ফ্ল্যাশব্যাকের অধিকাংশ টেকনিক সেকালের নিরিখে বেশ অগ্রসর ছিল।[১৪]

রূপান্তরের সময় সাহিত্য-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রে চিত্রিত চরিত্রের যোজন যোজন পার্থক্য সূচিত হতে পারে। মূলে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মানসিক জগতের জটিল অন্তর্ঘাতসমূহকে চলচ্চিত্রকার অন্তর্ঘাতী বিবেচনা করে এদের ঘাতগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারেন। চরিত্রায়ণের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র নির্মাতা বদলে ফেলতে পারেন কাহিনির শৈলী। কঠিন বা সঙ্কটময় মানসিক সম্পর্ককে চলচ্চিত্রকার রূপান্তরের সময় রোমান্টিক বা মেলোড্রামাটিক শৈলীতে রূপান্তরিত করে গল্পের জটিলতা বা চরিত্রসমূহের সঙ্কটজনক আচরণকে প্রাঞ্জল করে তুলতে পারেন। তবে রূপান্তরের সময় কোনো নির্মাতা যদি পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রের ধারাকে অনুকরণ করতে চান তবে তা সাফল্য বয়ে না-ও আনতে পারে। এই সম্পর্কে নন্দদুলাল রায় চৌধুরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রে চরিত্রসমূহের পার্থক্য নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা এদেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও স্মর্তব্য। তিনি বলেন 'ওদের সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ অনেক। তাই ওদের অনুকরণ করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই।'[১৫]

দর্শকের মানদণ্ড বিচার করে অনেক সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা মূল সহিত্যে বর্ণিত চরিত্রকে বদলে ফেলতে পারেন এক নতুন চরিত্রে। যেমন একজন বুদ্ধিজীবীর চরিত্রকে নির্মাতা বদলে ফেলতে পারেন একজন বিদ্রোহী চরিত্রে। অথবা একজন নারীবাদী নির্মাতা নারী চরিত্রকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারেন। সাধারণ নারীর সিদ্ধান্তহীনতার অক্ষমতাকে বদলে দিতে পারেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা দিয়ে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য লেখার অভিজ্ঞতা এখানে বিশেষত উল্লেখ্য। তিনি সাহিত্য রচনা এবং চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রে উভয়ের সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে তা চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন–

> সর্বসাধারণের জন্যে আমরা যা' কিছু লিখি, তা'ও কিন্তু ঠিক সর্বসাধারণের জন্যেই নয়। অগণিত জনসাধারণের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর লেখা-পড়ায় অনুরাগী– যাঁরা পাঠক, গল্প আমাদের শুধু তাদেরই হাতে গিয়ে পড়ে। সাহিত্যের গল্পের রসগ্রাহী মাত্র ওই মুষ্টিমেয়, 'পাঠক'-সমাজ। ছায়াচিত্রের গল্পের রসগ্রাহী 'দর্শক'-গোষ্ঠী কিন্তু তুলনায় উপরোক্ত 'পাঠক'-সমাজের চেয়ে অনেক অ-নে-ক বড়ো। বাস্তবে দেখা গেছে শহর আর মফস্সল উভয় ক্ষেত্রেই ছায়াছবির দর্শক এই বৃহত্তর সাধারণের এক বিরাট অংশের পক্ষে সাহিত্যের গল্প পড়া তো দূরের কথা– ওই নিরক্ষর বেচারাদের এমনকি বর্ণ-পরিচয়েরও সুযোগ অথবা সৌভাগ্য কোনোটাই ঘটেনি।[১৬]

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের ভোক্তার শ্রেণিগত ও রুচিগত যে পার্থক্য রয়েছে তা সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র রূপায়ণের সময় আত্মস্থ করা খুব সহজ নয়। বিনির্মাণের এই পর্যায়ে সাহিত্যের যে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য বা সৌন্দর্যপ্রসূত যে উচ্চকিত রুচির দেখা মেলে রূপান্তরিত চিত্রনাট্যে তা সমভাবে না-ও থাকতে পারে। তারাশঙ্করের অপর মন্তব্যে তারই সাক্ষ্য মেলে–

> সাহিত্য গল্পরসিক অল্প বিস্তর শিক্ষিত পাঠক-সমাজের চিন্তা-ধারা, রুচিবোধ, রসজ্ঞান আর ছায়া-ছবির গল্পের বৃহত্তর দর্শক-গোষ্ঠী। যাঁদের অনেকেই নিরক্ষর– তাদের মানসিকতা আর রস রুচির মধ্যে যে একটা বিস্তৃত উপসাগরের পার্থক্য রয়েছে– এ কথা তো অনস্বীকার্য। কাজেই সাহিত্য গল্প লিখতে বসলে ছায়া-ছবির গল্পের 'দর্শক'-ম্যাস-এর কথা ভাববার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সাহিত্য গল্প লেখা মাত্র আমার পূর্ব বর্ণিত মোর-অর্-লেস শিক্ষিত পাঠক-ফিউ-এর জন্যেই। কিন্তু ছায়া-ছবির গল্প লিখতে বসলে তো আর ওই নিরক্ষর দর্শক-ম্যাস কে উপেক্ষা করলে চলে না। আর ঠিক এইখানেই আমাদের কয়েক ধাপ নেমে এসে এই দর্শক সাধারণের মাঝে দাঁড়াতে হয়– তাঁদের রুচিকে রূপ দিতে হয় তাদের এন্টারটেন্মেনট আকাঙক্ষী মনের ক্ষুধা মেটাতে হয়।[১৭]

দর্শক রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য বর্ণিত অতীতকালের চরিত্রকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণের সময় নির্মাতা একে বর্তমানের চরিত্র হিসাবে অভিযোজিত করতে পারেন। চরিত্রের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই হয়ে উঠতে পারে নির্মাতার ইচ্ছানুগ। নির্মাতা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদে এমন উপস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারেন যা কিনা দর্শকের কাছে ফ্যাশনের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।[১৮]

শুধু ফ্যাশন দিয়ে নয় কখনো কখনো নির্মাতাকে চিত্তাকর্ষক চরিত্রায়ণে নিপুণ সংলাপের ব্যবহার করতে দেখা যায়। চৌকস সংলাপ নির্মাণে গদ্যের সঙ্গে কাব্যময়তাকে জুড়ে দিয়ে

দর্শককে অনুপ্রাণিত বা প্রণোদিত করার কৌশল খুব বিরল নয়। চলচ্চিত্র নির্মাতার দর্শককে মুগ্ধ করার এই কৌশল সম্পর্কে ধীমান দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন–

> চলচ্চিত্রের চিত্রপ্রতিমা আর কবিতার বাকপ্রতিমা দুইই ইমেজ, ভবিষ্যতে দেখা যাবে এই দুই ইমেজের মধ্যে এক প্রকার প্রতিতুলনা টানাও সম্ভব, তবু বিশুদ্ধ কবিতায় চলচ্চিত্রের দাবী মেটে না। কবিতার মতো সিনেমারও একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য লিরিক। প্রকৃতির তীব্র অথচ মুগ্ধকর উপস্থিতি এবং ইমেজ ও অনুভূতির মূলত ব্যক্তিগত ও বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে সিনেমায় এই কাব্যরস নিঃসৃত হয়।[১৯]

মূল লেখকের মতাদর্শ অথবা নতুন আরোপিত মতাদর্শকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনাও এক ধরনের রূপান্তর কৌশল। কখনো সাহিত্যে বর্ণিত সংলাপের প্রতিটি শব্দ ধরে ধরেই রূপান্তরে ব্যবহার করা হয়। আবার কখনো নয়া মতাদর্শ কৌশলে উপস্থাপিত হয়। ব্যক্তি নিরপেক্ষ লেখককে কখনো উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে না খুঁজে পাওয়া গেলেও, চলচ্চিত্রে এই ঈশ্বরের সর্বজনীন চরিত্রের উপস্থিতি ভিন্নভাবে হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রস্থিত কোনো চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে অথবা প্রথম পুরুষে নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে সুস্বর বর্ণনায় (voice over naration) চলচ্চিত্র নির্মাতার ভাষ্য উপস্থাপিত হতে পারে।

সাহিত্যের বিশেষত উপন্যাসের বৃহৎ কলেবরে চরিত্র চিত্রণের সময় ঔপন্যাসিক সকল চরিত্রের বৃত্তীয় উপস্থাপনায় সক্ষম হলেও রূপান্তরের সময় নির্মাতার পক্ষে তা সম্ভব না-ও হতে পারে। সীমিত সময়ের উপস্থাপনায় চলচ্চিত্রে সকল চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক চরিত্রকেই চলচ্চিত্রে একদেশদর্শী (flat) বলে মনে হয়।[২০] যদিও নির্মাতা দর্শকের রুচি-বিচারে এমনভাবে এসব একদেশদর্শী চরিত্র নির্মাণ করে থাকেন যাতে চলচ্চিত্রে তাদের স্বল্প উপস্থিতিতে প্রশ্ন উচ্চকিত না হয়।

ছোটগল্পের চলচ্চিত্রায়ণ

ছোটগল্পের পরিসীমা চলচ্চিত্রের পরিসীমার চেয়ে ছোট হলে স্বভাবতই সেখানে আরো ঘটনা যুক্ত করে তাকে প্রত্যাশিত সীমায় নিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে মূল সাহিত্য উৎসের কাঠামোতে বা প্লটে অনেক অনুকাঠামো (sub plot) যুক্ত হয়। অনুকাঠামোতে স্বভাবতই সৃজিত হতে পারে নতুন নতুন দৃশ্য এবং নব চরিত্রসমূহ। তবে ছোটগল্পের পরিসীমা এবং চলচ্চিত্রের পরিসীমার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে বিধায় ছোটগল্প থেকে চিত্রনাট্য তৈরি খুব সহজ হয় না। এ সম্পর্কে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। তিনি বলেন–

> যে কাহিনি ছবির জন্য বেছে নেওয়া হয় প্রথমেই দেখা দরকার সেটাকে অসম্ভব বিকৃত না করে... উপযোগী করে সাজিয়ে নেওয়া যায় কি না। একটু আধটু পরিবর্তন, অনেকখানি পরিবর্জন এবং হয়তো কিছু পরিবর্ধন না করলে কোনো কাহিনিই চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা যায় না। যদি মনের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য কোনো বাধা থাকে তাহলে সে কাহিনিকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে হবে।[২১]

কবিতার চলচ্চিত্রায়ণ

সাহিত্যিক উৎস হিসেবে কবিতাকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের বিষয়টি খুব নিয়মিত কোনো চর্চা নয়। উপন্যাস, ছোটগল্প বা নাটকের মধ্যে যেমন একটি গল্প, গল্পের কাঠামো (plot), চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের অন্তরালে দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়ার গতিশীলতা দেখা যায় কবিতায় ঠিক তদ্রূপ সচরাচর দেখা যায় না। কাহিনি-কাব্যে কাহিনি, বর্ণনা এবং চরিত্রের উপস্থিতি প্রবল হলেও সাধারণ-কাব্যে বর্ণনায় অনুষঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার, কবির আবেগীয় প্রকাশ ও এতদসংক্রান্ত অনুভাবনাসমূহই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সেকারণে 'কবিতা' থেকে চিত্রনাট্য তৈরি একটি দুরূহ কাজ।

বাংলাদেশে কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা অবলম্বনে প্রথম নির্মিত হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'হুলিয়া'। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নির্মলেন্দু গুণের কবিতা 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ'কে বেছে নেয়া হয়েছে। মূলত পাঁচ স্তবকের ত্রিশ লাইনের একটি কবিতাকে আশ্রয় করে প্রায় একশত তের (১১৩) মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি সহজসাধ্য ছিল না।

কবিতা থেকে চিত্রনাট্য তৈরির এই দুরূহতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কবি এবং চিত্রনাট্য নির্মাতার সাক্ষাৎকার থেকে এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য মেলে। কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে চিত্রনাট্য নির্মাতা পূর্ব থেকেই উদ্দিষ্ট কবির কাব্যময়তা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। প্রাক-পঠনের কারণে নির্মাতা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য তৈরির সময় 'নেকাব্বর' ছাড়াও কবির কৃষকদের ওপর লেখা অন্যান্য কবিতা যেমন 'ক্ষেতমজুরের কাব্য', ভূমিহীনের কাব্য', 'চাষাভূষার কাব্য' থেকে তাঁর ধারণাকে পরিব্যাপ্ত করেছেন।

'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' কবিতায় একজন কৃষক নেকাব্বর ও তার প্রেমিকা ফাতেমার উল্লেখের সূত্র ধরেই নির্মাতা অপরাপর কাব্যে বর্ণিত কৃষকদের জীবনযাত্রাকে এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে কেবল একটি কবিতা থেকে সূত্র নিলেও নির্মাতা অপরাপর কবিতার সূত্রে তার চিত্রনাট্যের ফাঁকগুলো পূরণে সমর্থ হয়েছেন।

'ভূমিহীন কৃষক'কে 'মূলভাবনা' (theme) হিসেবে ব্যবহার করে নির্মাতা একে স্থাপন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। এই প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকাল অবধি সীমায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। একই সঙ্গে গল্প বিনির্মাণের সময় নির্মাতা এতে যুক্ত করেছেন প্রকৃতি দর্শন এক রূপান্তরবাদের শিল্পদর্শনকে।[২২]

কবিতা থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এর উৎস সাহিত্যেও সংযোগের সূত্রটি যেহেতু খুব সবল নয়, তাই চিত্রনাট্য নির্মাণে নির্মাতা স্বাধীনতা ভোগ করলেও দর্শক আগ্রহ তৈরির বিষয়টি ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণের এই বিপুল ব্যয়ের ঝুঁকি কমাতে এখানে সরকারি অনুদানের অর্থায়নকে কাজে লাগিয়েছেন।[২৩]

নিম্নে ১৯৫৬ সাল থেকে ২০১৮ সালের মে অবধি বাংলাদেশে সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রায়িত ছবিসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো। এই তালিকা প্রণয়নের সময় মূলত ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যাবলির উপর নির্ভর করা হয়েছে।[২৪] বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে নির্মিত চলচ্চিত্রের বছরভিত্তিক তালিকা থাকলেও সে তালিকা থেকে সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এছাড়া নির্মিত চলচ্চিত্রের সবকটিই বাংলাদেশ সেন্সরবোর্ড কর্তৃক ছাড়পত্র প্রাপ্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কর্পোরেশন থেকে কোনো তথ্য মেলে না। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে কিছু বাংলা ছায়াছবির কপি থাকলেও সাহিত্যভিত্তিক সকল চলচ্চিত্রের তালিকা সেখানে দৃষ্ট হয় না। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই তালিকা প্রণয়নের প্রাক্কালে ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে অপরাপর তথ্যসূত্র দিয়ে সত্যায়িত করা হয়েছে।[২৫] তবু এই তালিকাটি তথ্যসূত্রগতভাবে দুর্বলতামুক্ত নয়।

সারণি-১

ক্রম	মুক্তির সাল	চলচ্চিত্রের নাম	সাহিত্য উৎস (নাম/ধরন)
১	১৯৫৬	মুখ ও মুখোশ	আবদুল জব্বার খান (নাটক)
২	১৯৫৯	জাগো হুয়া সাভেরা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩	১৯৬২	সূর্যস্নান	আলাউদ্দিন আল আজাদ (কবিতা)
৪	১৯৬৩	ধারাপাত	আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
৫	১৯৬৫	জানাজানি	আলী মনসুর (উপন্যাস)
৬	১৯৬৫	নদী ও নারী	হুমায়ূন কবির (উপন্যাস)
৭	১৯৬৬	কাগজের নৌকা	রোমানা আফাজ (উপন্যাস)
৮	১৯৬৬	১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন	উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (নাটক)
৯	১৯৬৭	আনোয়ারা	মোহাম্মদ নজিবর রহমান (উপন্যাস)
১০	১৯৬৭	নয়নতারা	মুনীর চৌধুরী (কাহিনি)
১১	১৯৬৭	আগুন নিয়ে খেলা	শৈলেন দে (উপন্যাস)
১২	১৯৬৭	আয়না ও অবশিষ্ট	সৈয়দ শামসুল হক (উপন্যাস)
১৩	১৯৬৭	নবাব সিরাজউদ্দৌলা	শচীনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নাটক)
১৪	১৯৬৮	মোমের আলো	রোমানা আফাজ (উপন্যাস)
১৫	১৯৬৯	অবাঞ্ছিত	আকবর হোসেন (উপন্যাস)
১৬	১৯৬৯	জোয়ার ভাটা	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (উপন্যাস)
১৭	১৯৬৯	মায়ার সংসার	রোমানা আফাজ (উপন্যাস)
১৮	১৯৬৯	বেদের মেয়ে	জসীমউদ্দিন (নাটক)
১৯	১৯৭০	আপন পর	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
২০	১৯৭০	সুখ দুঃখ	কাজী নজরুল ইসলাম (ছোটগল্প)

সারণি-১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত 'মুখ ও মুখোশ' এই জনপদের প্রথম বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র যার চিত্রনাট্য মূলত নাটক থেকে রূপান্তরিত। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ অবধি নির্মিত সাহিত্য থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা বিশ (২০)। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে নির্মিত একশত আটান্নটি (১৫৮টি) চলচ্চিত্রের ভেতর তেরো শতাংশ (১৩%) ছবিই সাহিত্যের নানা আঙ্গিককে চিত্রনাট্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে। সাহিত্যিক উৎস হিসেবে নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও একক আঙ্গিক হিসেবে উপন্যাসের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়। শতকরা পঞ্চাশ (৫০) ভাগের উপরে চিত্রনাট্য উৎস হিসেবে উপন্যাসকে বেছে নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটিমাত্র চলচ্চিত্রে বিদেশি লেখকের নাটক অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক চিত্রনাট্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত। এছাড়া বাকি সমস্ত রূপান্তরিত চিত্রনাট্যই দেশে প্রকাশিত স্থানীয় সাহিত্য উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। একক সাহিত্যিক হিসেবে রোমানা আফাজের উপান্যাস এ সময়ে বেশি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি* চলচ্চিত্রটি তৎকালীন এফডিসিতে (চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে) নির্মিত হলেও তা উর্দুভাষী দর্শকদের জন্যই নির্মিত হয়েছিল।

সারণি-২

ক্রম	মুক্তির সাল	চলচ্চিত্রের নাম	সাহিত্য উৎস (নাম/ধরন)
২১	১৯৭৩	তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ (উপন্যাস)
২২	১৯৭৪	মাসুদ রানা	আনোয়ার হোসেন (উপন্যাস)
২৩	১৯৭৬	নয়ন মণি	আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
২৪	১৯৭৭	বসুন্ধরা	আলাউদ্দিন আল আজাদ (উপন্যাস)
২৫	*১৯৭৮	সোহাগ	রফিকুজ্জামান (কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ)
২৬	১৯৭৮	সারেং বউ	শহীদুল্লা কায়সার (উপন্যাস)
২৭	১৯৭৮	গোলাপী এখন ট্রেনে	আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
২৮	১৯৭৮	ডুমুরের ফুল	আশরাফ সিদ্দিকী (ছোটগল্প)
২৯	১৯৮০	এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী	এরিখ কাস্টনার (উপন্যাস)
৩০	১৯৮২	দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩১	১৯৮৪	রাজবাড়ী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (উপন্যাস)
৩২	১৯৮৪	ক্ষুধিত পাষাণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটগল্প)
৩৩	১৯৮৪	চন্দ্রনাথ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩৪	১৯৮৫	রামের সুমতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩৫	১৯৮৫	সৎভাই	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩৬	১৯৮৬	শুভদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)

ক্রম	মুক্তির সাল	চলচ্চিত্রের নাম	সাহিত্য উৎস (নাম/ধরন)
৩৭	১৯৮৬	পরিণীতা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩৮	১৯৮৬	চাপাডাঙার বউ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৩৯	১৯৮৭	রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৪০	১৯৮৮	বিরাজ বৌ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৪১	১৯৮৯	বিরহ ব্যথা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৪২	১৯৯১	আয়না বিবির পালা	সৈয়দ শামসুল হক (উপন্যাস)
৪৩	১৯৯২	আবদার	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪৪	১৯৯২	শংখনীল কারাগার	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪৫	১৯৯৩	একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির (উপন্যাস)
৪৬	১৯৯৫	আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪৭	১৯৯৬	দীপু নাম্বার টু	মুহাম্মদ জাফর ইকবাল (উপন্যাস)
৪৮	১৯৯৬	পোকা মাকড়ের ঘরবসতি	সেলিনা হোসেন (উপন্যাস)
৪৯	১৯৯৭	হাঙর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন (উপন্যাস)
৫০	১৯৯৭	উত্তর ফাল্গুনী	নীহাররঞ্জন গুপ্ত (উপন্যাস)
৫১	১৯৯৯	শ্রাবণ মেঘের দিন	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৫২	২০০০	দুই দুয়ারী	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৫৩	২০০০	উত্তরের খেপ	শওকত আলী (উপন্যাস)
৫৪	২০০০	কিত্তনখোলা	সেলিম আল দীন (নাটক)

সারণি-২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে **১৯৭১** থেকে ২০০০ অবধি নির্মিত সাহিত্য থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চুয়ান্নটি (৫৪টি)-তে পৌঁছেছে। সাহিত্যিক উৎস হিসেবে এই সময় নাটক ও ছোটগল্পের খুবই সীমিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে একক আঙ্গিক হিসেবে উপন্যাসের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটিমাত্র চলচ্চিত্র বিদেশি লেখকের উপন্যাস অর্থাৎ এরিক কাস্টনারের উপন্যাসকে চিত্রনাট্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে। এছাড়া বাকি সমস্ত রূপান্তরিত চিত্রনাট্যই দেশে প্রকাশিত স্থানীয় সাহিত্য উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। একক সাহিত্যিক হিসেবে হুমায়ুন আহমেদের পাঁচটি উপান্যাস এ সময়ে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। একই সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নয়টি (৯) চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে এত বেশি সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিবেশী ভারতীয় গবেষক জ্যোতির্ময় রায়ের মন্তব্যটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক–

> আমাদের চলচ্চিত্রে ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণ কাহিনি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করার কাজে উপযুক্ত ক্ষমতার অভাব। এ অভাবের জন্যই আমাদের বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর সার্থক রূপায়ণ চিত্রে আজ অবধি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একমাত্র শরৎচন্দ্রের দু-একখানা বই ভালো উতরেছে। কারণ মুখ্যত সেই

> কাহিনীগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঘটনাসংস্থান এবং সুসংলাপের ওপর। যার সামান্য বর্ণনাংশ বাদ দিয়ে গল্পটিকে তুলে নিলেই সেটা চিত্রোপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেসব কাহিনি ঘটনা এবং চরিত্র বর্ণনা আর অন্তর বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ, চিত্রনাট্যের সংকীর্ণ সীমায় আটক করতে গিয়ে নাট্যকারের অক্ষমতা তাকে মেদ-মজ্জাহীন এমন এক শুকনো কংকালে রূপান্তরিত করে যার রূপ দাঁড়ায় হাস্যকর ও পীড়াদায়ক। এ লাঞ্ছনা থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলোও রেহাই পায়নি।[২৬]

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা-পূর্বকালে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিকের একক প্রাধান্য থাকলেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে সেলিনা হোসেন এ সময়ে সেই স্থানটি অর্জন করতে পারেননি।

সারণি-৩

ক্রম	মুক্তির সাল	চলচ্চিত্রের নাম	সাহিত্য উৎস (নাম/ধরন)
৫৫	২০০১	লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (উপন্যাস)
৫৬	২০০৩	কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি	রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৫৭	২০০৩	চন্দ্রকথা	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৫৮	২০০৪	দূরত্ব	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৫৯	২০০৪	শাস্তি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটগল্প)
৬০	২০০৪	মেঘের পর মেঘ	রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৬১	২০০৫	মেহের নেগার	কাজী নজরুল ইসলাম (ছোটগল্প)
৬২	২০০৫	হাজার বছর ধরে	জহির রায়হান (উপন্যাস)
৬৩	২০০৫	শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৬৪	২০০৬	নিরন্তর	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৬৫	২০০৬	নন্দিত নরকে	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৬৬	২০০৬	বাঙলা	আহমদ ছফা (উপন্যাস)
৬৭	২০০৬	খেলাঘর	মাহমুদুল হক (উপন্যাস)
৬৮	২০০৬	বিদ্রোহী পদ্মা	আসকার ইবনে শাইখ (উপন্যাস)
৬৯	২০০৬	সুভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটগল্প)
৭০	২০০৬	কাবুলীওয়ালা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটগল্প)
৭১	২০০৬	রাক্ষুসী	কাজী নজরুল ইসলাম (উপন্যাস)
৭২	২০০৭	একজন সঙ্গে ছিল	সৈয়দ শামসুল হক (উপন্যাস)
৭৩	২০০৭	দারুচিনি দ্বীপ	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৭৪	২০০৭	সাজঘর	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৭৫	২০০৮	আমার আছে জল	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)

ক্রম	মুক্তির সাল	চলচ্চিত্রের নাম	সাহিত্য উৎস (নাম/ধরন)
৭৬	২০০৯	প্রিয়তমেষু	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৭৭	২০১০	অবুঝ বউ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটগল্প)
৭৮	২০১০	মনের মানুষ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৭৯	২০১১	আমার বন্ধু রাশেদ	মুহাম্মদ জাফর ইকবাল (উপন্যাস)
৮০	২০১১	গেরিলা	সৈয়দ শামসুল হক (উপন্যাস)
৮১	২০১১	মধুমতি	রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৮২	২০১২	ঘেটু পুত্র কমলা	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৮৩	২০১৩	দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উপন্যাস)
৮৪	২০১৩	কাজলের দিন রাত্রি	মুহাম্মদ জাফর ইকবাল (উপন্যাস)
৮৫	২০১৩	শিখণ্ডী কথা	আনন জামান ((নাটক)
৮৬	২০১৪	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	নির্মলেন্দু গুণ (কবিতা)
৮৭	২০১৪	মেঘমল্লার	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ছোটগল্প)
৮৮	২০১৫	অনিল বাগচীর একদিন	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৮৯	২০১৫	অমি ও আইসক্রিমওয়ালা	ফরিদুর রেজা সাগর
৯০	২০১৬	কৃষ্ণপক্ষ	হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৯১	২০১৬	নিয়তি	নিকোলাস স্পার্ক/শিন জাহো
৯২	২০১৭	আঁখি ও তার বন্ধুরা	মুহাম্মদ জাফর ইকবাল (উপন্যাস)

সারণি-৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ২০০১ থেকে ২০১৮ অবধি নির্মিত সাহিত্য থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা চুয়ান্ন (৫৪) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বিরানব্বই (৯২)-তে পৌঁছেছে। সাহিত্যিক উৎস হিসেবে এ সময় কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাসের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে একক আঙ্গিক হিসেবে উপন্যাসের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়। এছাড়া একটিমাত্র চলচ্চিত্রে যৌথ উৎস থেকে দুজন বিদেশি লেখকের উপন্যাস অর্থাৎ নিকোলাস স্পার্ক এবং শিন জাহোর উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এছাড়া বাকি সমস্ত রূপান্তরিত চিত্রনাট্যই দেশে প্রকাশিত স্থানীয় সাহিত্য-উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। একক সাহিত্যিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের উপান্যাস এ সময়ে বেশি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছেন।[২৭] নজরুলের ছোটগল্প এবং উপন্যাস এ ক্ষেত্রে চয়িত হলেও তা সংখ্যায় খুব উল্লেখযোগ্য নয়। আধুনিককালে মহিলা ঔপন্যাসিক রাবেয়া খাতুনের সাহিত্যকর্মই রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছে। এ সময়ে অন্য কোনো মহিলা ঔপন্যাসিকের

উপন্যাস চলচ্চিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়নি। সারণি-৩ বিশ্লেষণ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের পাঠকপ্রিয়তাই এ সমস্ত উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে। উপন্যাসের আকাশচুম্বী পাঠকপ্রিয়তা লেখক হুমায়ূনকে চলচ্চিত্রকার হুমায়ূনে পরিবর্তনে সাহস যুগিয়েছে।

রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের মৌল প্রবণতা

বাংলাদেশে নির্মিত সাহিত্য-নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে যেসব মৌল প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে।

রূপান্তরের জন্য সাহিত্য উৎস থেকে চয়নের প্রাক্কালে উক্ত সাহিত্যের নান্দনিক মূল্যায়ন কোনো নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল কিনা এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর মেলে না। বাণিজ্যিকভাবে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণকালে নাটকের পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল চিত্রনাট্য। এই জনপদে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের এটি প্রথম প্রয়াস হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কলকাতায় একই সময় রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের প্রবল উপস্থিতি ছিল। বিশেষত উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণে সত্যজিৎ রায়ের বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি ধারা বেগবান হয়ে উঠেছিল।[২৮] একই সময়ে এই জনপদে পিছিয়ে থাকা বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াসে সাহিত্য অবলম্বিত হলেও তা কতদূর নান্দনিক মূল্যমান বিবেচনায় হয়েছিল সে সম্পর্কে তথ্য মেলে না। তবে কলকাতায় সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের রীতির সাথে তৎকালীন ঢাকায় নির্মিত উর্দুভাষী 'জাগো হুয়া সাভেরা' নির্মাণের মিল লক্ষণীয়। তবে পাকিস্তান আমলে এ জনপদে চলচ্চিত্র চর্চা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল এমন ভাবা যায় না। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে 'জাগো হুয়া সাভেরা' চলচ্চিত্রটি রচিত হলেও এই চলচ্চিত্রে কাহিনিকার হিসেবে মানিকের নাম সংযোজিত হয়নি। এতে কাহিনিকার হিসেবে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের নাম ব্যবহৃত হয়।[২৯] রাজনৈতিক হয়রানি এড়াতে মূল সাহিত্যিকের নাম গোপন করে ভিন্ন নামে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল।

প্রতিবেশী কলকাতায় যেমন পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিকদের উৎকর্ষ সাহিত্য ভাণ্ডারকে চলচ্চিত্রায়ণের জন্য চয়ন করা হয়েছিল এই জনপদে ঠিক তেমনভাবে পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যিকদের লেখাসমূহকে ব্যাপকভিত্তিতে চলচ্চিত্রায়ণের জন্য চয়ন করা হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে উপন্যাস রচনায় তথা এর পাঠকপ্রিয়তার যে যোগসূত্র কলকাতায় লক্ষণীয় ছিল এই বঙ্গে তা লক্ষ করা যায় নি। এ বঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষ বিলম্বিত হয়েছে বলে এর সাহিত্য চর্চায় নান্দনিক উৎকর্ষ অর্জনও তাই বিলম্বিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মানস গঠনে যে সময় লেগেছে সে সময়ের সাহিত্যে তাই রচনার প্রস্তুতিই বড়ো হয়ে উঠেছিল, নন্দন-বিবেচনা বড়ো হয়ে ওঠেনি।

আধুনিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের কাহিনির উৎস বিশ্লেষণ করলে এর চয়নের পেছনে জনপ্রিয়তার বিষয়টিই বেশি চোখে পড়ে। পাঠকপ্রিয় সাহিত্যগুলোই চলচ্চিত্রায়ণের জন্য চয়িত হয়েছে। পাঠকপ্রিয় লেখা সহজেই দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র হয়ে উঠবে এমনতর স্বাভাবিক আশাবাদই বাংলাদেশে আধুনিক রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের মন্ত্র বলে অনুমিত হয়। সাম্প্রতিক অতীতে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের লেখা অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্রগুলোর সংখ্যাধিক্যই এই অনুমানের হেতু। রূপান্তরিত চলচ্চিত্র-বিষয়ক গবেষক ক্রিস্টিন গেরাগ রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের মূল বিষয় হিসেবে এগুলোর দর্শকগ্রাহ্যতার ওপর জোর দিয়েছেন। বিচিত্র দর্শকের নানা অবস্থান থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্র নেয়ার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।[৩০]

পাঠকপ্রিয়তাকে প্রধান বিবেচ্য হিসেবে পরিগণিত করার অন্তরালে যে মূলত চলচ্চিত্রে বিনিয়োগের বাণিজ্যিক ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি কাজ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসাসফল হওয়াতে শুধু হুমায়ূন আহমেদই নন অন্যান্য নির্মাতাও তাঁর লেখা অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। যে সকল নির্মাতা 'জনপ্রিয়' লেখা রূপান্তরের সুযোগ লাভ করেননি তাঁদের অনেককেই বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসে বিকল্প পথ অবলম্বন করতে দেখা গেছে।

রূপান্তরিত চলচ্চিত্রের মধ্যে একাধিক সংখ্যায় অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের দেখা মেলে। রাজনৈতিক যোগসূত্রকে কাজে লাগিয়ে অনেক নির্মাতা সরকারি অনুদান লাভ করে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে সমর্থ হয়েছেন। 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ'সহ অনেক রূপান্তরিত চলচ্চিত্রই সরকারি অনুদানে নির্মিত। বিনিয়োগের ঝুঁকি এড়ানোর অপর লক্ষণীয় কৌশলটি হচ্ছে বেসরকারি পর্যায়ে প্রযোজক নিশ্চিত করা। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'চ্যানেল আই'- এর অর্থায়নে এ ধরনের রূপান্তরিত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। এই রীতিতে তৈরিকৃত চলচ্চিত্রগুলো প্রেক্ষাগৃহে সফল না হলেও টেলিভিশন সম্প্রচারের স্বত্ব থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ পেতে নির্মাতা সমর্থ হন।

জনপ্রিয়তা অথবা আর্থিক অনুদান বা টিভি সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে ঝুঁকি হ্রাসের এই প্রবণতা সম্প্রতিক সময়ে সাহিত্য উৎসজাত চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রসার ঘটলেও এর শিল্পমানের নৈপুণ্য সর্বদা রক্ষিত হতে দেখা যায়নি। দর্শকের চাহিদা পরিপূরণের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে তা যে নান্দনিক না-ও হয়ে উঠতে পারে এ সম্পর্কে ভারতীয় চলচ্চিত্র কর্মী জ্যোর্তিময় রায়ের মন্তব্যটি স্মর্তব্য–

> demand and supply- এর স্থুল সূত্রটা কেবল মাত্র পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিল্প এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করতে হয় উলটে। সেখানে supply অনুযায়ী গড়ে ওঠে জাতির demand। এ কথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে আমাদের সাহিত্যের চাহিদা রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্য-মানেই আটক পড়ে থাকত।[৩১]

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে, অনেক চিত্রনাট্যকারই কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা উন্নত প্রশিক্ষণ ছাড়াই চিত্রনাট্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। পছন্দের লোক স্বল্প

অভিজ্ঞতায় চিত্রনাট্য রচনায় সাহসী হয়ে উঠেছেন। চিত্রনাট্যকারের অপরিপক্বতা নির্মিত শিল্পমানকে যেমন ক্ষুণ্ন করেছে তেমনি চয়িত সাহিত্য উৎসকেও ম্লান করে দিয়েছে। সাহিত্য উৎস থেকে চিত্রনাট্য রচনার বিষয়টি এমনি চিত্রনাট্য রচনার চেয়ে অধিকতর দুরূহ। চিত্রনাট্যকার মূর্তজা বশীরের ভাষ্যে এ কথার সমর্থন মেলে। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের সাথে তাঁর চিত্রনাট্য নির্মাণের অভিজ্ঞতা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। জহির রায়হান মৌখিকভাবে যা বলতেন তা তখন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে যেত, আর সহকারীরা সেখান থেকে তার পাঠোদ্ধার করত। মূর্তজা বশীর বলেন–তবে তখন আমার এটা মনে হয়েছিল, এভাবে বাজার চলতি ছবির চিত্রনাট্য হয়ত লেখা যেতে পারে, কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।[৩২]

এই প্রবন্ধে লোকসাহিত্য উৎসারিত চলচ্চিত্রসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কেননা লোকসাহিত্য লোকজ সমাজে কাল পরম্পরায় মৌখিক রীতিতে প্রচলিত ও জনশ্রুত হয়ে থাকে। লোকসাহিত্যের কোনো লেখ্য রূপ না থাকায় একক কোনো ব্যক্তিকে এ-ধরনের সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। একজন গবেষকের মতে, এই জনপদে 'লোককাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র ধারার সূচনা ঘটে ১৯৬৫ সাল থেকে।' উক্ত গবেষক *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে লোকসাহিত্যের প্রয়োগ : স্বাধীনতা পূর্বকাল এবং উত্তরকাল* শীর্ষক তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩৩] উল্লিখিত গবেষক লোককাহিনিভিত্তিক নির্মিত চলচ্চিত্রের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে একে (ক) বিশুদ্ধ লোককাহিনি নির্ভর, (খ) কল্পিত লোককাহিনি নির্ভর, (গ) পুরাণ নির্ভর এবং (ঘ) রূপকথা নির্ভর প্রভৃতি যে বিভাজন ঘটিয়েছেন তা থেকে স্পষ্টতই এ-ধরনের সাহিত্য উৎসের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের এই ধারায় অনেক নির্মাতাই সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের শর্ত পূরণে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত গবেষকের ভাষ্যমতে–

> আমরা দেখেছি ১৯৬৫ সালে পরিচালক সালাউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত লোকগাথা নির্ভর চলচ্চিত্র রূপবান-এর সাফল্য লাভের পর পর প্রায় একই রকম নামে পরিচালকদের বানানো অথবা স্ব-উদ্ভাবিত গল্পের আশ্রয়ে লোককাহিনীর ধাঁচে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রবাহ শুরু হয়ে যায়। এরকম চলচ্চিত্রের মধ্যে রহিম বাদশা ও রূপবান, আবার বনবাসে রূপবান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ছবির কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালক হিসেবে পর্দায় সাধারণত পরিচালকদের নামই প্রদর্শিত হতে দেখা যায়।[৩৪]

এই জনপদেও মেধাস্বত্ব আইনের শিথিল প্রয়োগ এক্ষেত্রে এ-ধরনের জালিয়াতির পেছনে কাজ করেছে কিনা তা নিশ্চিত জানা যায় না। সাধারণত লোককাহিনিসমূহ একটি দেশের জাতীয় সম্পদ বলে সে দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান এ-ধরনের সাহিত্যসমূহকে সংরক্ষিত করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহই উত্তরকালে ওই সমস্ত লোককাহিনির 'মেধাস্বত্ব' অর্জন করে থাকে। এই ভূখণ্ডে সংগৃহীত লোককাহিনিগুলোকে সংরক্ষণের জন্য বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান এ-ধরনের সকল সাহিত্যকর্মের মেধাস্বত্ব অর্জন করতে পারেনি। এমনকি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লোকসাহিত্যের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ-সম্পর্কিত কোনো বলিষ্ঠ নীতিমালার প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। মেধাস্বত্ব নীতিমালা ক্রিয়াশীল থাকলে চলচ্চিত্রকারের স্বউদ্ভাবিত কাহিনিকে লোককাহিনি হিসেবে চালিয়ে দেয়া সম্ভব হত না। মেধাস্বত্বের প্রয়োগ শিথিলতায় শুধু লোককাহিনি নয় অনেক দেশি-বিদেশি সাহিত্যের মূল ভাবনা (theme) বা গল্প চলচ্চিত্রের জন্য চয়িত হলেও চলচ্চিত্রকারদের এর ঋণ স্বীকার করতে দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৫৬ থেকে ২০১৮ সাল অবধি নির্মিত দুই সহস্রাধিক চলচ্চিত্রের মধ্যে সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা যে খুবই অনুল্লেখযোগ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিগত সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে বছরে শতাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও সেখানে গড়ে দুটিও সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি[৩৫]। এক্ষণে নান্দনিক মানসম্পন্ন সাহিত্য নির্মাণের স্ফূর্তি প্রয়োজন। উন্নত জীবনের অবগাহনে আগামী বাংলাদেশে যদি নান্দনিক সাহিত্য পাঠকের বিস্তার ঘটে তবে সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণেও নিশ্চিতই বিস্তার ঘটবে। অবশ্য একই সঙ্গে এই সংখ্যাও স্মর্তব্য যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ লেখকদের সংযুক্তি প্রয়োজন। যৌথ শিল্পকর্ম সৃজনে সামাজিক দায়িত্ববোধ (social responsibility) থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি নান্দনিক সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণে বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে না আসে তবে সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণের কখনোই বিস্তার ঘটবে না। যদিও এ সম্পর্কে চলচ্চিত্র গবেষক মিরিয়াম হ্যানসেনের মন্তব্যটি স্মরণীয়। এই গবেষকের মতে–

> ভূ-রাজনৈতিক পর্যায়ে চলচ্চিত্র এবং দর্শকের মধ্যকার সম্পর্কেও যে পরিবর্তন ঘটছে তা দেশের বর্তমান সীমার বাইরেও কর্পোরেট যোগসূত্রভুক্ত নুতন এক চলচ্চিত্র তথা ভিডিও, গান, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচিতি ও বিকাশ নির্দেশ করে।[৩৬]

কর্পোরেট যোগসূত্রভুক্ত নতুন এই চলচ্চিত্র ধারার প্রভাব গ্রাহ্য না করে তাই সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্রের বিকাশ অসম্ভব। সাহিত্য-আশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণে রাশিরাশি ভাবনা থেকে বাড়তি, বাহুল্য, উগ্র, সংকীর্ণ, অগভীর, স্থূল ভাবনাগুলোকে মাথা ঘামিয়ে ফেলে দিয়ে তৈরি করা প্রয়োজন এমন এক অনন্যসাধারণ ভাবনার চলচ্চিত্র যা দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে যাবে ভিন দেশে, ভিন দর্শকের কাছে।

তথ্যনির্দেশ

১ https://muse.jhu.edu/article/171125 (accessed on the 20th April 2018)
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arroseur_Arros%C3%A9 (accessed on the 20th April 2018)

২ McFarlane, Brian: *Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation*, Oxford University Press, Oxford, 1996

৩ https://www.copyrightlaws.com/moral-rights-in-u-s-copyright-law/ (accessed on the 1st May 2018)

৪ Sinyard, Neil, *Fliming Literature The Art of Screen Adaption*, Routledge, London, 2013

৫ ধীমান দাশগুপ্ত: 'চিত্রনাট্যের উপাদান ও রীতি: অনুপম হায়াত (সম্পাদিত)' *চিত্রনাট্যকলা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

৬ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): ছন্দা চক্রবর্তী, (অনুদিত) *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, খণ্ড ১, ২, ৩ এবং ৪

৭ Stephenson, Ralph & Phelps, Guy : *The Cinema As Art*, Penguin Books Ltd, London, 1989

৮ সত্যজিৎ রায়, 'বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র', দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯৩৪-৫৪*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৯-২৩

৯ *প্রাগুক্ত*

১০ Langford, Barry: *Film Genre Hollywood and Beyond*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005

১১ McDonald, Keiko I.: *From Book to Screen Modern Japanese Literature in Film*, An East Gate Book, New York, 2000 p.31

১২ সাজু আহমেদ, আরিফের চলচ্চিত্র 'কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র'; দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২শে এপ্রিল ২০১৮

১৩ McDonald, Keiko I. ; From Book to Screen Modern Japanese Literature in Film, An East Gate Book, New York, 2000 p-31

১৪ ওয়াহিদ সুজন, শ্রদ্ধাঞ্জলি 'নদী ও নারী'র সাদেক খান, সাপ্তাহিক *কাগজ*- সাম্প্রতিক দেশ-কাল, ২৬ মে ২০১৬ http://shampratikdeshkal.com/back-page/2016/05/27/3030 (accessed on the 13th April 2018)

১৫ নন্দদুলাল রায় চৌধুরী, 'জাতীয় জীবনে ছায়াছবির দান', দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯৩৪-৫৪*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮

১৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ছায়াছবির গল্প', দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯৩৪-৫৪*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪২-৪৫

১৭ *প্রাগুক্ত*

১৮ McDonald, Keiko I. ; op.cit. p.38

১৯ ধীমান দাশগুপ্ত, 'চিত্রনাট্যের উপাদান ও রীতি'; অনুপম হায়াত (সম্পাদিত) *চিত্রনাট্যকলা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৭

২০ Axelrod, M. (1996). Once Upon a Time in Hollywood; or, the Commodification of Form in the Adaptation of Fictional Texts to the Hollywood Cinema. Literature Film Quarterly, 24(2), 201-208.

২১ গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'চিত্রনাট্য রচনা'; দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯৩৪-৫৪*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

২২ মাসুদপথিক, (পরিচালক) চলচ্চিত্র- 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' (২০১৪), এর সাক্ষৎকারে (০৪-০৫-২০১৮, ঢাকা) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

২৩ কবি নির্মলেন্দু গুণ, 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ (কবিতা)' এর সাক্ষৎকারে (০৪-০৫-২০১৮, ঢাকা) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

২৪ আব্দুল্লাহ আল কাফি, ক্যামেরার লেন্সে বন্দী সাহিত্য, বিডি শোবিজ, ৬ মার্চ ২০১৮ ; স্টাফ রিপোর্টার,চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ, দৈনিক *মানব জমিন*, ৫ই মে ২০১৮ ; চলচ্চিত্রে হুমায়ূন, হুমায়ূনের চলচ্চিত্র- http://www.deshebideshe.com/home/printnews/7821(accessed on the 14th April 2018)

২৫ নাবিল অনুসূর্য, চলচ্চিত্রে নদীর রাজত্ব ও হালদা, ৩০ নভেম্বর ২০১৭ প্রকাশিত http://icetoday.net/2017/11/film-on-river/(accessed on the 14th April 2018) ; রাজ্জাক অভিনীত চলচ্চিত্রের তালিকা, উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (চয়িত ১৬ই এপ্রিল ২০১৮) ; নাবিল অনুসূর্য, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রঃ সাদা-কালোর বাছাই সাত, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রকাশিত http://icetoday.net/2017/11/film-on-river/(accessed on the 14th April **;** নাবিল অনুসূর্য, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রঃ সম্পূর্ণ রঙিন সাত, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রকাশিত http://icetoday.net/2017/11/film-on-river/(accessed on the 14th April.

২৬ জ্যোর্তিময় রায়, 'আধুনিক কাল ও চিত্রকথা', দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা* **১৯৩৪-৫৪**, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৪

২৭ লেখক, সিনেমা বিনোদন বিভাগ; রবীন্দ্র সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে পিছিয়ে বাংলাদেশ প্রিয়.কম

২৮ সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র; উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (চয়িত ১লা মে ২০১৮) ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি-নির্ভর চলচ্চিত্রগুলির তালিকা, উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (চয়িত ১লা মে ২০১৮)

২৯ জাগো হুয়া সাভেরা (চলচ্চিত্র, ১৯৫৯), উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (চয়িত ১লা মে ২০১৮)

৩০ Geraghty, Christine; Now a Major Motion Picture: Film Adaptations of Literature and Drama, Rowman& Littlefield Publishers, Maryland, 2008, p.3

৩১ জ্যোর্তিময় রায়, 'আধুনিক কাল ও চিত্রকথা', দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা* **১৯৩৪-৫৪**, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৭

৩২ ওয়াহিদ সুজন, শ্রদ্ধাঞ্জলি 'নদী ও নারী'র সাদেক খান, সাপ্তাহিক *কাগজ*- সাম্প্রতিক দেশ-কাল, ২৬ মে ২০১৬ http://shampratikdeshkal.com/back-page/2016/05/27/3030 (accessed on the 13th April 2018)

৩৩ আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ*, ভাষাচিত্র, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬২-৩২৭

৩৪ প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৬

৩৫ Ahsan, Muhammad Shajjad: Impacts of Funding in Digitising the Bangladeh Film Industry: Challenges Ahead, South Asian Popular Culture, 2016, Volume-14, No-3, p 241-248

৩৬ Hansen, Miriam: Early Cinema, Late Cinema: Transformation of the Public Sphere (in) Linda Williams (edited), *Viewing Positions Ways of Seeing Film*, Rutgers University Press, New Jersey, 1994, p.136

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও চারুশিল্পী সমাজ

মোঃ বনি আদম*

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭-উত্তরকালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। এই চেতনার স্ফুরণকালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় চারুশিল্প শিক্ষালয়। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট শিল্পী শিক্ষক-শিক্ষার্থী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ব্যক্তিসত্তায় ধারণ করে, শিল্পে প্রকাশ ঘটায়। সর্বোপরি নিজেদের সম্পৃক্ত করে বাঙালির সকল প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে। ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সর্বদা উচ্চকিত থেকেছে শিল্পীর তুলি। তাঁদের আঁকা ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, আলপনাসহ সৃজনশীলকর্ম সমাজ পরিবর্তনে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শুধু স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও চারুশিল্পীরা জিইয়ে রেখেছেন তাঁদের প্রতিবাদীসত্তা। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে চারুশিল্পীদের সম্পৃক্ততা ও সক্রিয়তার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা তথা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক চেতনায় ভর করে বাঙালিরা স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী হয়। এ চেতনাই ছিল সকল লড়াই-সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি এবং এ চেতনার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাঋদ্ধ যে সকল আন্দোলন তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ।

তবে এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কালপর্ব ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, এ আন্দোলনের ধারা প্রবহমান বর্তমান অবধি। বর্তমানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অর্থ হলো, বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতিকে লালন করে, বুকে ধারণ করে এ চেতনা প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিক্রিয়াশীলতার ছত্রছায়ায়। ফলে সে সময় থেকে নতুন করে শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার লড়াই।

এই প্রবন্ধে মূলত পঞ্চাশের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে চারুশিল্পীদের সক্রিয়তা ও সম্পৃক্ততার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকায় চারুকলা চর্চার সূচনা

১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা অতিক্রম করে শিল্পচর্চার চিন্তা করাটা ছিল চরম সাহসিকতার কাজ, শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা ছিল আরও কঠিন। সে সময়ের কোনো একজন এ-ডি-পি-আই ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরাসরি মন্তব্য করেন, 'পাকিস্তান যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র সেজন্য এই দেশে ছবি আঁকা শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন স্কুল হতে পারে না।'[১] এমন বৈরী পরিস্থিতিতে ঢাকায় 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বর্তমান বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চার সূত্রপাত ঘটে। পরে ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী চারুশিল্প শিক্ষা প্রসার লাভ করে।

আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশে চারুকলা চর্চালয়ের সূচনা তেমনি পরবর্তী ধাপে বাঙালির সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও শিল্পী সমাজের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়।

প্রতিকূল সমাজব্যবস্থা এবং সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়নুল আবেদিন ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য শশিভূষণ পাল (১৮৭৮-১৯৪৬) ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্টে শিক্ষা নিয়ে নিজ গ্রাম খুলনার মহেশ্বরপাশায় ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্ট'। এ বিদ্যালয়টিই বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রথম শিল্পশিক্ষালয়। তবে সে আর্ট স্কুল তেমন ব্যাপকতা ও প্রসার লাভ করেনি। ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠায় জয়নুল আবেদিনের পাশে সহযোগী হিসেবে ছিলেন সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, হাবীবুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান-সহ আরও অনেকে।

ঢাকা আর্ট স্কুলে প্রথম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি হন ১৮ জন। প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা হলেন আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, আবদুর রাহমান ভুঁইয়া, আবদুল কাদের, আবুল কাশেম, আমানুল্লাহ খান, মোহাম্মদ ইসমাইল, আলফাজুদ্দিন খন্দকার, এ এস এ এম নুরুল ইসলাম, নুরুল আলম, খালেদ চৌধুরী, শামসুল আলম, জুলফিকার আলী, প্রভাস সেন, লোকনাথ ধর, ইমদাদ হোসেন, বিজন চৌধুরী প্রমুখ।[৩] পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন মোহাম্মদ কিবরিয়া, আব্দুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী,

মুর্তজা বশীর, কাইয়ূম চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আব্দুল বাসেত, নিতুন কুন্ডু প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন জুনাবুল ইসলাম, কাজী আব্দুর রউফ, মুবিনুল আজিম, শাহাতাব, মুস্তাফা মনোয়ার প্রমুখ।[৪] ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন - আবু তাহের, আবদুল মুকতাদির, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, আনোয়ার জাহান, গোলাম সারোয়ার, প্রাণেশ কুমার মণ্ডল, মোহাম্মদ মহসীন, হাশেম খান, মনিরুল ইসলাম, আনোয়ারুল হক পিয়ারু, রফিকুন নবী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মিজানুর রহমান, মাহমুদুল হক, রেজাউল করিম, আবদুল মান্নান, হামিদুজ্জামান খান, কালিদাস কর্মকার, মতলুব আলী, শহীদ কবীর, বীরেন সোম, আবুল বারক আলভী প্রমুখ।[৫] এসব শিল্পীর হাত ধরেই বাংলাদেশে চারুকলাচর্চার পথচলা।

আন্দোলনে চারুশিল্পী সমাজের সম্পৃক্ততা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল রীতিমতো বিপ্লবাত্মক ঘটনা। 'এই প্রতিষ্ঠান শুধু চারুশিল্পী সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দরের পথে সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়নি, আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রগতির ধারায় ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনায় উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।'[৬] এ স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছিলেন প্রগতিশীল চেতনায় উজ্জীবিত। প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শিল্পী আমিনুল ইসলাম জড়িত ছিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে।[৭] বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে শিল্পী আমিনুল ইসলাম তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

> ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের পূর্বেই ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের মধ্যে আমি ঢাকার উদীয়মান কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার ফলে প্রগতিশীল আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। পরবর্তীকালে মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়েই সদ্যগঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া। আমার এবং পরবর্তী বছরের ছাত্র মুর্তজা বশীরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যেও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে কিছু শিক্ষকের পরোক্ষ সহায়তায়।[৮]

শিল্পী মুর্তজা বশীর ১৯৪৭ সালে নবম শ্রেণির ছাত্র অবস্থাতেই বামপন্থি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই রাজনীতির কারণে ১৯৫০ সালে পোস্টারিং করে ফেরার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং প্রায় ছয় মাস জেল খাটেন। তাঁর ভাষ্যানুযায়ী, ১৯৫০ সালের ৭ই জুন কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত এলাকা দিবসের ডাক দেয়। এ উপলক্ষে তিনি যে পোস্টারটি আঁকেন তা হলো ময়মনসিংহের ম্যাপ হাতুড়ি আর কাস্তে দিয়ে ঘেরা এবং উপরে লেখা 'মুক্ত এলাকা'। এই পোস্টার লাগিয়ে ফেরার পথেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। আরো জানা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই তিনি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। তিনি বলেন, 'আর্ট পড়াটা হয়েছিল ঘটনাচক্রে। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পোস্টার লিখতাম, আবার পার্টি

অফিসের জন্য আঁকতাম মার্কস, লেলিন কিংবা স্টালিনের প্রতিকৃতি। তাই সেই রাজনৈতিক সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমার প্রতি নির্দেশ হলো আর্ট কলেজে ঢুকে পড়ার, ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার।'[৯] আবার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্র দেবদাস চক্রবর্তী ও বিজন চৌধুরীকে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট ভর্তির সুযোগ দেয়।[১০] ফলে দেখা যায়, ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রথম থেকেই হয়ে ওঠে প্রগতিশীলদের আশ্রয়স্থল, পাকিস্তানের বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ও লালন কেন্দ্র এবং এক ধরনের আন্দোলনের সংস্কৃতিও দানা বেঁধে উঠতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। তবে চারুশিল্পীদের বাঙালি সংস্কৃতির আন্দোলন সম্পৃক্ততার প্রকাশ ঘটে নানা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।

১৯৫১ সালের ১৬-১৯শে মার্চ চট্টগ্রামে চারদিনব্যাপী যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলায় সর্বপ্রথম আয়োজন। পাকিস্তানের বৈরী পরিবেশে আয়োজিত এ সম্মেলন এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণে অনন্য অবদান রাখে; *দৈনিক আজাদ* ও পাকিস্তানপন্থি লেখক-সাংবাদিকদের তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, কলকাতা থেকে আগত *সত্যযুগ* সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়, শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। এর পাশাপাশি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর। চট্টগ্রামের এই সফল সংস্কৃতি-সম্মেলন সারাদেশের প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করে।[১১]

পূর্ববাংলায় পাকিস্তানপন্থি লেখক-সাহিত্যিকদের তৎপরতার বিপক্ষে প্রগতিশীল বা উদার শিল্প-সাহিত্য চর্চার মানসে *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫২ সালে গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)। সংসদের কমিটিতে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং আমিনুল ইসলাম।[১২] বাংলাদেশে প্রগতিশীল মনোভাব প্রতিষ্ঠায় এই সকল সাহিত্য সংসদের রয়েছে অগ্রগামী ভূমিকা, আর এর সঙ্গে সব সময় সম্পৃক্ত থেকেছে বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ।

পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৫২ সালে। আর ভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এদেশের ছাত্রসমাজ। এই ছাত্রদেরই অংশ আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজন চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ বিভিন্নভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এছাড়াও শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের কথা জানা যায়। সে সময় তিনি স্কুলের ছাত্র,

থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।[১৩] ভাষা আন্দোলনে শিল্পীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে শিল্পী কামরুল হাসান বলেন–

> "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" এই শ্লোগান তখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। এ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা। রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার। সেকালের পোস্টার লেখার প্রধান মালমসলা ছিলো পুরোনো খবরের কাগজের ওপর লাল বা কালো রং দিয়ে লেখা শ্লোগান। সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরাই সেগুলো লিখতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, রশিদ চৌধুরী পোস্টার লিখেছে। এদের তুলির বলিষ্ঠ রেখার পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে করা হয়েছে আরও প্রাণবন্ত। এছাড়া লেখা হয়েছে শ্লোগানে, দাবীতে আকীর্ণ ব্যানার। আমি নিজেও আমার ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম সেদিন। সে জন্য আমি গর্বিত।[১৪]

ঢাকার সর্বত্র দেয়াল লিখে, পোস্টার এঁকে আন্দোলনের চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন এদেশের চারুশিল্পীরা। 'এভাবেই শিল্পীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছে'।[১৫] ভাষা আন্দোলনে শিল্পীদের সক্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গেলে সর্বপ্রথম উঠে আসে শিল্পী মুর্তজা বশীরের নাম। শিল্পী মুর্তজা বশীরের লিনোকাট মাধ্যমে আঁকা *রক্তাক্ত একুশে* সরাসরি ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক একমাত্র শিল্পকর্ম। এ আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন শিল্পী মুর্তজা বশীর। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে সক্রিয় মুর্তজা বশীর সম্পর্কে জানা যায় শিল্পী কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে–

> তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়লো। সালাম, বরকতদের খবর আমি বশীরের কাছ থেকে প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত এবং মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত।[১৬]

ভাষা আন্দোলনের আরেকজন সক্রিয় শিল্পী হলেন ইমদাদ হোসেন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্টভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। ভাষার অধিকার নিয়ে সরাসরি লড়াইয়ে অংশ নেন। ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি 'ঢাকা আর্ট গ্রুপে'র দ্বিতীয় প্রদর্শনীর তারিখ নির্ধারিত হলেও আন্দোলনের কারণে তা স্থগিত রেখে প্রায় সব শিল্পীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।[১৭]

১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪শে আগস্ট কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল প্রগতিবাদী এবং সরকারবিরোধী সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের সম্মেলন। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণ করা এবং শান্তির পক্ষে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী এবং গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্‌গাতা হিসেবে এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের মনে এই সম্মেলন এক নতুন জীবনাদর্শের সঞ্চার করে। সম্মেলনে চিত্র প্রদর্শনী একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রদর্শনীতে কেবল ছবি দিয়েই শিল্পীরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং দলবদ্ধভাবে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকল প্রচেষ্টার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন।[১৮] কুমিল্লার সাংস্কৃতিক

সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য *আহবান* শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যাতে বলা হয়–

> যারা এদেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানে নিরত, যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করেন; সঙ্গীতে চিত্রে যাঁহারা প্রাণের সন্ধান পান, দর্শন বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহাদের জীবন ব্যয়িত হয়, সেই সব শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী, শিল্পী-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উপরই পড়িয়াছে জাতির মানস সংস্কৃতি উন্নয়নের মহৎ ভার। লক্ষ লক্ষ ম্লান মূঢ় অন্তর আজ তাঁহাদেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহারাই যে জাতির প্রতিনিধি। তাঁহাদিগকেই যে আজ জাতির মূক মুখে ভাষা দিতে হইবে। অন্তরে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে। ... চিন্তানায়ক, কবি-শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমবেত প্রচেষ্টাই এই কার্যকে দ্রুত সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারে। অবকাশ ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ইহার জন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্মেলন প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজনে শিল্পী-সাহিত্যিক ও চিত্রনায়কেরা সমবেত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারেন এবং উহার মাধ্যমেই নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। এভাবে নিজ নিজ সৃষ্ট বিষয়ের গুণাগুণও বিচার করিবার সুযোগ পান। তাহাদের ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়াই জাতির মানস-সংস্কৃতির ধারা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং বিরাট প্রসার লাভ করিয়া অপরিস্ফুট জনগণের অবজ্ঞাত সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্বোধিত করিয়া ভাব ও কর্মের বিপুল শস্যভাণ্ডারে জাতীয় সমৃদ্ধি ঘোষণা করে।[১৯]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের সক্রিয়তা ও সম্পৃক্ততার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ভাষা আন্দোলনপরবর্তীকালে নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে জাগরূক রাখতেও সচেষ্ট থাকেন (চিত্র: ১)।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে প্রতিবছর একুশকে কেন্দ্র করে বের হতে থাকে সংকলন এবং এসব সংকলনের অঙ্গসজ্জার দায়িত্ব পালন করেন চারুশিল্পী সমাজ। ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ সজ্জিত হয় ব্যানার, ফেস্টুন আর চিত্রমালায়। রাজপথ শোভিত হয় আলপনায়। এসব কিছু যেন প্রতিবাদের আরেক ধরন, যা অনুপ্রাণিত করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিকে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারি*। প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, কবিতা ও গানের অনবদ্য এ সংকলনটি পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি মাইলফলক হয়ে আছে।[২০] আর এই সংকলন গ্রন্থের প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। শুধু পোস্টার বা প্রচ্ছদ অঙ্কনেই নয়, বাঙালির সকল প্রগতিশীল আন্দোলনেও শিল্পী আমিনুল ইসলাম ছিলেন অগ্রগামী।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি রচিত হয় তার প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে চারুশিল্পীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন প্রদান প্রসঙ্গে জানা যায় শিল্পী কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে। তিনি বলেন, '১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দানের ভিত্তিতে শিল্পীরা যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেয়ালচিত্র, ব্যানার ও ছবি এঁকেছিল, তা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।'[২১] কিন্তু সে সময়ের দেয়ালচিত্র বা ব্যানারের কোনো স্মৃতি চিহ্নও পাওয়া যায় না। তবে শিল্পী ইমদাদ হোসেনের মাধ্যমে জানা যায় যে, সে

সময়ের কাজগুলো ছিল মূলত নির্বাচনমুখী। রাজনৈতিক নেতাদের অসদাচরণ, দুর্নীতি, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয় ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয় ঐসব পোস্টার, ব্যানার বা দেয়ালচিত্রে। কার্টুন আঁকানো হতো, পত্রিকায় প্রকাশিত নানা খবর অবলম্বনে। তিনি এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের বেশ কয়েকজন ছাত্র এসব কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।[২২] শিল্পীদের আঁকা কার্টুন, পোস্টার, ফেস্টুনগুলি ছিল একদিকে যেমন প্রতিবাদের ভাষা, অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির হাতিয়ারস্বরূপ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে কামরুল হাসানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> ১৯৫৪ সালে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলনকে কেবল একটি সম্মেলনের জন্যই সম্মেলন হিসেবে গণ্য করি না। আমার বিবেক বিবেচনা দিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে এসে আজ এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছি যে '৫৪ সালের এ সাহিত্য সম্মেলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভিক প্রবাহ। এ প্রবাহ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পেরেছিলো। প্রমাণ পাওয়া যাবে এর সেই সময়কার "দৈনিক আজাদ" পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রায় দুইমাস ধরে আজাদের পৃষ্ঠায় দুই কলম হেডিং-এ প্রতিদিন আমাদের এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষপ্রসূত বিষোদগারই ছিলো না। এতে অশালীন ভাষা প্রয়োগও করা হতো। আমরা অর্থাৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং সমর্থকরা যে ভারতীয় দালাল ও ইসলামবিরোধী এটাই ছিলো তাদের মুখ্য বক্তব্য। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ শিল্পী কেবল সেই মহাসম্মেলন উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী করেই কর্তব্য পালন করেননি বরং পোস্টার, পুস্তিকা, মঞ্চসজ্জা থেকে নিয়ে ছায়ানাট্যের পটভূমিতেও সক্রিয় ছিলো।[২৩]

১৯৫৪ সালের এই সাহিত্য সম্মেলনে শিল্পীদের বিপ্লবী ভূমিকা লক্ষ করে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বা আবদ্ধকরণের লক্ষ্যে চাকরিসহ নানারকম প্রলোভনের চেষ্টাস্বরূপ ইস্কান্দার মীর্জার ইন্ধনে গোড়াপত্তন করা হয় আর্ট কাউন্সিলের। ১৯৫৪ সালেই এই প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব হিসেবে সমগ্র পাকিস্তানের শিল্পীদের ছবি দিয়ে ঢাকায় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।[২৪] এই আর্ট কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায় পঞ্চাশ দশকের শিল্পী মোহাম্মদ ইদ্রিস-এর লেখা থেকে–

> ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি হয়। ক্ষমতায় আরোহন করে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার। বাঙালীর আর এক বিজয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোলকাতা থেকে আমন্ত্রিত সুধিজন এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমী আইন পাশ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ৯২ক ধারা জারী করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে ইসকান্দার মীর্জাকে ক্ষমতায় বসায়। নেমে আসে অন্ধকার। সম্ভবত এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অস্ত্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে 'আর্ট কাউন্সিলে'র শাখা গঠন করে। এ উপলক্ষে শাহবাগ হোটেলের সভাকক্ষে জৌলুষপূর্ণ অনুষ্ঠানে মিঃ খায়রুল কবীর আর্ট কাউন্সিল কর্মকাণ্ডের ঘোষণা দেন।[২৫]

১৯৫৫ সালে আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের অনেক বড় মাপের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত সে প্রদর্শনীই তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের প্রথম লোকশিল্প প্রদর্শনী। সারাদেশ থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা হয়। যার মধ্যে ছিল নকশিকাঁথা, শিকা, জামদানি শাড়ি, বাঁশ-বেতের কাজসহ মৃৎশিল্পের নানা সামগ্রী। সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা হয়, যা পরোক্ষভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[২৬]

১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও শিল্পীরা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদানের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কাগমারীর রাস্তায় মির্জাপুর থেকে সম্মেলন স্থান পর্যন্ত দেশ বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে ৫০টি তোরণ নির্মিত হয়। আর এই তোরণ নির্মাণে ছিল শিল্পীদের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া। মওলানা ভাসানী নিজেই বলেছেন– 'কাগমারীর সড়ক বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক।' কামরুল হাসানের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সন্তোষের রাজবাড়িতে। আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩০ জন ছাত্র এতে অংশ নেয়। কাগমারীর সাধারণ মানুষের জীবনধারার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আঁকা চিত্রকর্মগুলি স্থান পায় এই প্রদর্শনীতে। কাগমারীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। এখানে মূলত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা একত্র হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কণ্ঠ মেলান।[২৭] প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর বক্তৃতায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন–

> এখানকার সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি প্রাণের অভিব্যক্তি দেখিয়াছি। সম্মেলন স্থানের আশে-পাশে যে-সভা দেখিয়াছি, তাহা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। এই সার্থকতার ব্যাকুলতা, স্নেহ ও বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও সখ্যের প্রতি অনুরোধে বাঙালি প্রাণের এত বড় আয়োজন আর কোথাও দেখি নাই।[২৮]

শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডূক সাংস্কৃতিক বর্বরতার বিরুদ্ধে উদার বাঙালি চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের হাতিয়ার। তাই ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনে যখন বাধা আরোপ করা হয়, তখন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের যেকোনো আয়োজন হয়ে ওঠে প্রতিরোধের প্রধান অবলম্বন।[২৯] পাকিস্তানে সামরিক শাসনের থমথমে আবহাওয়ার মধ্যেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এই উৎসবে চারুশিল্পীদের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। ঢাকার প্রেসক্লাবের এই উৎসবে সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র প্রদর্শনীসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৩০] এভাবে ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার অর্থ হলো, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হওয়া।

১৯৬২ সালে শুরু হয় শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত হলেও ১৯৬২ সালের এই আন্দোলন ছিল সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৬২ সালের এই আন্দোলন তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম দুটি হলো রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক। এই রাজনৈতিক ইস্যু দুটি হলো, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার এবং আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র। আন্দোলনের তৃতীয় ইস্যুটি শিক্ষানীতি বিষয়ক।[৩১] এই আন্দোলনে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের একাংশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শিল্পীরা ঢাকা এবং দেশের নানাপ্রান্তে দেয়াল ও পোস্টার চিত্রের মাধ্যমে আন্দোলনের চেতনাকে ছড়িয়ে দেন। শিল্পী আনোয়ার হোসেন, কেরামত মওলা, গোপেশ মালাকার, প্রফুল্ল রায়, রফিকুন নবী, শামসুল ইসলাম এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।[৩২] আইউববিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি পরিচালিত ঢাকা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে রূপান্তরকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে এসব শিল্পী আইউববিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। শিল্পী কেরামত মওলাকে সভাপতি করে এসময় ছাত্র শিল্পীদের নিয়ে যে কমিটি হয় তাতে সদস্য হিসেবে থাকেন– সামসুল ইসলাম নান্টু, মুনশী মহিউদ্দিন, বেলাল আহমেদ, আর. এ. এম. সালাম, প্রফুল্ল রায়, আনোয়ার হোসেন, রণজিৎ নিয়োগী, আনোয়ার জাহান, লুৎফর রহমান প্রমুখ ছাত্রশিল্পী। এসব শিল্পীর আঁকা প্রতিবাদী কার্টুনে পোস্টারে ছেয়ে যায় ঢাকা শহর। অধিকাংশ কার্টুনেরই মাস্টার কপি আঁকতেন সে সময়ের তরুণ শিল্পী শিক্ষক মুস্তাফা মনোয়ার।[৩৩] সেসব কার্টুনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিল্পী আনোয়ার হোসেন তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন :

> আন্দোলন চলতে থাকে। ...কার্টুনে, পোস্টারে ভরে উঠে সারা শহর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য, স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ছাত্রাবাসের অভাব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিষাক্ত ছোবল। ভুঁড়িওয়ালা কেন্দ্রীয় সরকার ঐ পাকিস্তানের কামিজ পরিহিতা অলংকার ও প্রসাধনে ফিটফাট মহিলাকে মূল্যবান হার পরিয়ে দিচ্ছেন। পাশে এই পাকিস্তানের শাড়ি পরা অলংকারহীন মহিলা শীতে থর থর করে কাঁপছে। তার দিকে দৃষ্টি নেই। ছাত্রাবাসে জায়গা নেই। ছোট ঘরে উঁচু হয়ে ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে ছাত্ররা। সাংবাদিকদের কলমের উপর বড় বড় নখ ও পশমওয়ালা হাতের ছোবল। জনতার হাত বাঁধা, মুখে তালা। শামুকের পিঠে সরকারি ফাইল ইত্যাদি অংকিত হয়েছে রেখাচিত্রে, পোস্টারে লিপিকলার সাথে।[৩৪]

আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছাড়াও এই আন্দোলনে সহযোগিতা করেন ডাকসুসহ অন্য নেতৃবর্গ, কমরেড রবি নিয়োগী, কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, কবি বেগম শামসুননাহার মাহমুদ প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনের কারণে বহিষ্কার করা হয় ৮ জন ছাত্রকে। এই বহিষ্কারের প্রতিবাদে তিনজন ছাত্রশিল্পী মো. আনোয়ার হোসেন, কেরামত মওলা ও শামসুল ইসলাম ঢাকা প্রেসক্লাবে ‘জনতার জন্য চিত্রকলা’ শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই চিত্রপ্রদর্শনী রাজনৈতিক ও সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩৫]

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে ধারণ করে গণসচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালের দিকে গঠিত সৃজনী সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে ১৯৬৩ সাল থেকে শিল্পীরা সম্পৃক্ত হলে এর নাম হয় সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী। কামরুল হাসান, ইয়াকুব, ইমদাদ হোসেনই ছিলেন এই সংগঠনের সার্বক্ষণিক শিল্পী। এ সংগঠনের যাবতীয় শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে শিল্পীরা ব্যাপক অবদান রাখেন।[৩৬] 'বলার অপেক্ষা রাখেনা ... সৃজনীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিল্পী ইমদাদ হোসেনের দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতা, মেধা ও সৃজন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার একান্তভাবেই ছিল মেহনতি মানুষের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ।'[৩৭] শিল্পীদের এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছিল মূলত মানুষকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং সর্বোপরি বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা।

১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ছায়ানট'[৩৮] ১৯৬৭ সালে এসে রমনা বটমূলে প্রতিবছর বর্ষবরণ উদ্‌যাপন উৎসব শুরু করে। এছাড়াও রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটেও ছবি আঁকার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এছাড়াও *সংবাদ*, *ইত্তেফাক* প্রভৃতি পত্রিকা, কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর ইত্যাদি শিশু সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন অনেক চারুশিল্পী। যেমন হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদত চৌধুরী প্রমুখ। আবার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা বা একুশের সংকলনকে কেন্দ্র করে কবি, সাহিত্যিকদের পাশাপাশি চিত্রশিল্পীরা বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে অবদান রাখেন। কেননা এসব পত্রিকা ও সংকলনের প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জার কাজ শিল্পীরাই করেন। এভাবে ষাটের দশকের গোড়াতেই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবাই এক কাতারে মিলিত হন। তাদের সহাবস্থানের মূল ভিত্তি ছিল বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা। এই বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাই ক্রমশ পাকিস্তানি আদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো সুদৃঢ় করে। যা স্পষ্ট হয় ১৯৬৬ সালে।[৩৯] ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ৬-দফা উপস্থাপন করেন আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ৬-দফার ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা জনগণকে আকৃষ্ট করে। ৬-দফা প্রদানের পরবর্তী দুই মাসে ব্যাপক জনসংযোগকালে তিনি জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন লাভ করেন। ৬-দফার প্রচারণায় ব্যানার, পোস্টার, জনসভার মঞ্চসজ্জায় ৬-দফার যে লোগো ব্যবহৃত হয় তার ডিজাইন করেন শিল্পী হাশেম খান। ছয় রঙের সমন্বয়ে ৬-দফার যে ডিজাইন, শিল্পী তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– 'ছয় দফার আরও একটি মর্মার্থ আছে। আমাদের দেশে ঋতুর সংখ্যা ছয়। ঋতুগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ছয় দফাও ঠিক তেমনি করেই বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হবে।'[৪০]

শিল্পী বীরেন সোমের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ছয় দফার ডিজাইনটি দেখে খুশি হন এবং তিনি ছয় দফার ঘোষণাপত্রের ডিজাইন অনুসরণে ছয় দফা ঘোষণার মঞ্চ তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করেন। শিল্পী হাশেম খানের ডিজাইন অনুসারে মঞ্চ তৈরি করেন শিল্পী বীরেন সোম, আবুল বারক আলভী ও মঞ্জুরুল হাই।[৪১] ৬-দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে শিল্পীরা তাঁদের রাজনৈতিক দায় পালন করেছে।

শেখ মুজিবের ৬-দফা বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়ে উঠলে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি তাঁকে আগরতলা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাঙালির ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং নিষ্পেষণ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য' মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। জুন মাস থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আগরতলা মামলা নিয়ে বাঙালিরা চিন্তিত, বিক্ষুব্ধ এবং পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা কারারুদ্ধ থাকায় সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক শূন্যতা। এমন অবস্থায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্রসমাজ এবং পাশে থাকে সর্বস্তরের জনগণ। ১৯৬৮-এর নভেম্বর থেকেই গণআন্দোলনভিত্তিক সংগ্রাম শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালে তা চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অনুঘটকের দায়িত্ব পালনকারী সাধারণ ছাত্রসমাজের একাংশ ছিল চারুশিল্পী শিক্ষার্থী।

চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। শহীদ মিনারে আলপনা আঁকার রীতি আগে থেকে চালু হলেও ১৯৬৭ সালে তা নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৬৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শিল্পীরা রাজপথসহ বিভিন্ন স্থানে আলপনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করেন। শহীদ মিনার থেকে আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাজুড়ে বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ আঁকা আলপনা বাঙালির চেতনায় এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। শিল্পী হাশেম খান আলপনা আঁকা প্রসঙ্গে বলেন—

> শহীদ মিনারে এবং একুশের প্রভাতফেরির পথে আলপনার ব্যবহার বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চাশের দশকে ছিটে ফোঁটা দু'একটি আলপনা আঁকা হয়েছে। ষাটের দশকেই আলপনা একটা ভিন্ন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে সংস্কৃতি চর্চায় 'দ্রোহ' হিসেবেই শহীদ মিনার ও প্রভাতফেরির রাস্তায় প্রকাশ পেতে থাকে।[৪২]

পাকিস্তানি শাসন-শোষণের চিত্র তাঁরা তুলে ধরেন জনসম্মুখে শহীদ মিনারে চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ১৯৬৮ সালে বার্তা বহনকারী ব্যানারের সিরিজ, ১৯৬৯ সালের শহীদ মিনারে স্বরবর্ণের ব্যানার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্দোলনে নতুন শক্তির সঞ্চার করেন শিল্পীরা। ১৯৬৯

সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে স্লোগান ছিল 'আজ পলাশ ফোটার দিন'। অর্ঘ্য হিসেবে শহীদ মিনারে ফুলের বলয় দেওয়ার পরিবর্তে 'অ' 'আ' অক্ষরের ফুলের বলয় এবং আন্দোলনের বার্তাবহনকারী ব্যানার শহীদ মিনারে টানানো হয়।[৪৩] বাঙালি সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ এবং আন্দোলনের পক্ষে নানা বিষয়কে উপজীব্য করে ছবি, ব্যানার, ফেস্টুন আর আলপনায় শহীদ মিনার সাজানোর রীতি ১৯৬৯ সালে এসেই আরো ব্যাপকতা লাভ করে। আন্দোলনের পক্ষে এসব ব্যানার চিত্র ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এসব ব্যানারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদ বলেন–

> ... ঐ সময় প্রথম প্যানেল করার প্রয়াস পাই বাঙালি জাতিসত্তার উপর। বাঁশপাতার কাহিনী বলে একটা বড় ব্যানার করা হয়। ঐ ব্যানার অসাধারণ সুন্দর ছিল। অনেকগুলি অংশে এটা বিভক্ত ছিল। মা ও শিশু ... হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আকাশে চাঁদ, অ, আ, ক, খ পড়ছে। তারপর দেখা যায় ছেলেটা বড় হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখে। আরো একটু বড় হয়ে ছেলেটা স্কুলে যায়। আর অবসর সময়ে সে রাখালদের সঙ্গে গরু চরায় বা রাখালের বাঁশি শোনে। তারপর এক সময় ছেলেটা মেট্রিক পাস করলো। বাবা ভাবলো তার সন্তান বড় হয়েছে। শহরে পাঠাবে লেখা পড়া করতে। সেই ছেলে শহরে এসে যখন দেখলো সে যে ভাষায় কথা বলে, লিখতে শিখেছে, সে-ভাষায় কথা বলা যাবে না। তখন সে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এক সময় পুলিশের বাঁশের লাঠির আঘাতে সে মারা যায়। এই কাহিনীচিত্র সেসময় অসাধারণ ছিল।[৪৪]

ব্যানার ছাড়াও পোস্টার, ফেস্টুনেও বক্তব্যপ্রধান চিত্রের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন শিল্পী বীরেন সোম এভাবে–

> উনসত্তরের সেই উত্তাল সময়টাতে ঢাকা আর্ট কলেজে জোর আন্দোলন চলছে। তখন কলেজের জি.এস. ছিল সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে তখন এগারো দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো আর্ট কলেজের ছাত্ররা। সে সময় ডাকসুর সভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এই বৃহত্তর আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা কী হবে- সেটা নিয়ে প্রথম মিটিং হলো ইকবাল হলে, এখন যার নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। সেই মিটিংয়ে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সাজাহান সিরাজ, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালিদ, রেজাউল করিম এবং আরো অনেকে। মিটিংয়ে আমাদের নিজেদের কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। এগারো দফার মধ্যে চারুশিল্পীদের কিছু দাবিও সংযোজিত হলো। মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, আন্দোলনের জন্য পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন তৈরি করবো। তখন কাজকর্ম নিয়ে নিয়মিত আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আসাদুজ্জামান নূর (নাট্য ব্যক্তিত্ব), তিনি তখন ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। আরো যোগাযোগ রাখতেন মতিউর রহমান (সম্পাদক, প্রথম আলো), মফিদুল হক (ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর), আবুল হাসনাত (সম্পাদক, কালি ও কলম) প্রমুখ। আর্ট কলেজের হোস্টেলে আমরা তখন সারারাত জেগে পোস্টার আঁকি। আমাদের দায়িত্ব ছিলো রোজ এক রিম পোস্টার লেখা। মানে ৫০০ টা পোস্টার। তখন আমরা যারা পোস্টার লিখতাম তাদের মধ্যে ছিলো শহীদ কবীর, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালেদ, রেজাউল করিম, বিজয় সেন, অলক রায়, হাসি চক্রবর্তীসহ আর্ট কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে।[৪৫]

ব্যানার, ফেস্টুন বা পোস্টার লেখার কাজে যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন অথবা সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, ইমদাদ

হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদত চৌধুরী, কেরামত মওলা, গোলাম সারোয়ার, আনোয়ার হোসেন, লুৎফর রহমান, প্রাণেশ মণ্ডল, আবুল বারক আলভী, আবদুল মান্নান, রেজাউল করিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মঞ্জুরুল হাই, নাসির বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়, মতলুব আলী, বিজয় সেন, বীরেন সোম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪৬] এছাড়াও আরো অনেক শিল্পী সরাসরি অংশ নেন আন্দোলন-সংগ্রামে (চিত্র : ২)। ষাটের দশকের আন্দোলন সংগ্রামে চারুশিল্পীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন বলেন–

> শাহাদত চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী... এরা একটা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন... সিক্সটি নাইন, সিক্সটিএইট এই সময়কালে।... আমাদের ছাত্র আন্দোলনকে কিন্তু সবচেয়ে বেগবান করেছে চারুকলার এই শিল্পীরা।... তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক যে বৈষম্য..., দুই অংশের মানুষ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে আছে– এটা প্রকাশিত হয়েছে যতটা না অর্থনীতিবিদদের বক্তৃতায়, তার চেয়ে সাধারণ মানুষদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত করেছে এই আঁকা ছবিগুলি।[৪৭]

১৯৬৯ সালে চারুশিল্পীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় *উনসত্তরের ছড়া*। ছড়া সংকলনের প্রয়োজনে ছড়া সংগ্রহ ও সম্পাদনার মূল দায়িত্ব পালন করেন শাহাদত চৌধুরী ও রফিকুন নবী। শিল্পী রফিকুন নবী এই সংকলনের অলংকরণের মূল দায়িত্ব পালন করেন। যদিও সংকলনে অলংকরণ শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী রফিকুন নবী বলেন–

> সেসময় যারা ছড়া লিখতেন তাদের কাছ থেকে ছড়া সংগ্রহ করার পাশাপাশি যারা ছড়া লিখতেন না তাদের দিয়েও ছড়া লেখানো হয়েছিল যেমন সরদার জয়েনউদ্দীন, শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ। এক সময় গিয়ে দেখা গেল যে, ম্যাটার শেষ, আর ছড়া নেই। তখন আমরা নিজেরাই বসে গেলাম ছড়া লিখতে। আমি বা শাহাদত কেউই এর আগে ছড়া লিখিনি।... তখন জীবনে যারা ছড়া লেখেনি তাদের দিয়েও ছড়া লেখানো হয়েছে। এই যেমন, মনজুরুল হাই, বীরেন সোম, মতলুব আলী–সবাইকে বসিয়ে দেয়া হলো, ছড়া লিখার জন্য। তারপর এগুলোর ছন্দ-টন্দ এসব ঠিক আছে কিনা এসব দেখে দেয়া হতো। শাহাদতই বেশি করতো এগুলা।... এই সংকলনের সাইজ করা হয়েছিল কিছুটা অন্য রকমের। ঠিক করা হলো যে পীচবোর্ড দিয়ে এই বইয়ের প্রচ্ছদ করা হবে। তখন ঢাকার কোথাও সিল্কস্ক্রিন হয়না। প্রেসে গেলে পীচবোর্ডে ছাপা হবে না। আর হাতে সময়ও নেই। আমরা তখন নিতুনদার শরণাপন্ন হলাম। উনি তখন ইউসিস-এ চাকরি করেন। এবং ইউসিস হলো তখন একমাত্র সংস্থা যেখানে সিল্কস্ক্রিনের ব্যবস্থা ছিল। স্পেশাল রঙ আসতো আমেরিকা থেকে। নিতুনদাকে বলার পরে নিতুনদা নিজে স্ক্রিন বানিয়ে সব কিছু রেডি করে রঙ-টঙ দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন এইভাবে তোমাদের ছাপাতে হবে। আমরাও জানতাম না। ওই প্রথম জানলাম। তারপর ওটা নিয়ে গিয়ে শাহাদতের বাড়িতে সারারাত জেগে দুই হাজার প্রচ্ছদ প্রিন্ট করলাম। আর এই ব্যাপারে সহায়তা দিয়েছিল ললনা পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার মোহাম্মদ আখতার। উনি কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর মারা গিয়েছেন, এসব কারণেই। তিনি ওটা প্রিন্ট করে দিয়েছিলেন বিনা পয়সায়... পুরো ফর্মাগুলো। তো ছাপা খরচ লাগেনি। কাগজটা আমরা শুধু কিনেছিলাম। এভাবে বের করলাম। সম্পাদক অমুক অমুক এগুলো লিখিনি। শুধু চারুকলা ছাত্রপরিষদ বা এধরনের কিছু একটা নাম দিয়ে বের করা হয়েছিল।[৪৮]

সহজেই ধারণা করা যায় যে, চারুশিল্পীদের অলংকরণকৃত এসকল ছড়াও সাধারণের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১৯৬৯-এর গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে চারুশিল্পীরা ঢাকা আর্ট কলেজে 'নবান্ন' উৎসবের আয়োজন করেন। নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন শিল্পী হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদত চৌধুরী, বুলবন ওসমানসহ আরো অনেকে। শিল্পী হাশেম খানের লেখা থেকে নবান্ন উৎসব নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। জয়নুল আবেদিন বলেন–

> বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই যে আন্দোলন চলছে, তোমরা ভাবো, সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে ভাবো। আমাদের দেশটা কৃষি প্রধান। আমাদের দেশের কৃষকদের জীবন কীভাবে চলছে? কীভাবে তারা দিনের পর দিন ঠকছে? আমরা কিছু লোক যারা শহরে থাকছি, সুবিধা পাচ্ছি। গ্রামের লোকদের কিন্তু কিছু হচ্ছে না। আমাদের আদি যে আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাপন, কৃষিপ্রধান দেশের আবহমান জীবনাচরণ–এগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।...রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি এটা হবে সামাজিক আন্দোলন।[৪৯]

নবান্ন উৎসবের অংশ হিসেবে 'নবান্ন চিত্র প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হয় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০)। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আঁকেন 'নবান্ন' নামে ৬৫ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল। যাতে তিনি আঁকেন সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনার ছবি, বাঙালির জীবন সংগ্রামের ইতিহাস।

নবান্ন উৎসবের খবর ছাপা হয় কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকায়। প্রধান শিরোনাম হিসেবে লেখা হয়– 'নবান্ন উৎসব ঢাকা শহরে।' আকাশবাণী থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভেসে আসে–'পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকায় ফিরে এলো আমাদের আদি বাংলার উৎসব।'[৫০] আবহমানকাল ধরে নবান্ন বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জড়িয়ে আছে। এই উৎসব পাকিস্তানের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করে দেশজ সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শুধু শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা-ই নয়, সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাঁর সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর একমাস পূর্বে তিনি ময়মনসিংহে মওলানা ভাসানীর জনসভায় অংশ নিয়ে বক্তৃতা করেন। শুধু তাই নয় এই মহান শিল্পী ৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৪ই মার্চ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন করেন। 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' বর্জন প্রসঙ্গে জয়নুল আবেদিন মন্তব্য করেন, 'জনগণকে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে যেভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে উহার প্রতিবাদে আমি আমার হিলালে ইমতিয়াজ উপাধি ত্যাগ করিতেছি।'[৫১] আবদুল হক জয়নুল আবেদিন প্রসঙ্গে বলেন, 'জয়নুল মোটের ওপর আগাগোড়া শিল্পী নন, পূর্ববাংলার অবিমিশ্র খাঁটি সন্তান।... তাঁর দেশ চেতনা– তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী।'[৫২]

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অনুঘটক মনে করা হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণগুলির অন্যতম হলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের চালচিত্র জনগণের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন। এই প্রচারণায় রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এদেশের শিল্পী সমাজ তাঁদের অঙ্কিত পোস্টারের মাধ্যমে। শিল্পী হাশেম খানের[৫৩] আঁকা 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' পোস্টারটি প্রচারণার মূলে রাখে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এই পোস্টারে অঙ্কিত বৈষম্যচিত্র বাঙালিকে অধিকার সচেতন করে তোলে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে এবং তার প্রতিফলন ঘটে উক্ত নির্বাচনে।[৫৪]

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে শিল্পীদের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গড়ে ওঠে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামক সংগঠন, যা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে ব্যাপক জনসচেতনতা ও ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[৫৫] শিল্পী কামরুল হাসান 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[৫৬] ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ বাংলা একাডেমীর বটবৃক্ষের নিচে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর ব্যানারে লায়লা আর্জুমান্দ বানুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রথম বক্তা হিসেবে তিনি বলেন, 'বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে শিল্পীরাও এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন'[৫৭] (চিত্র : ৩)।

১৯৭১-এর ১০ই মার্চ চট্টগ্রামে আবুল ফজলের বাসায় শিল্পী-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় 'শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ' গঠন করা হয়। সভায় বাঙালির আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে গানের স্কোয়াড, নাটকের স্কোয়াড এবং একটি চিত্রকলার অ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক চিত্র অ্যালবামে শিল্পী রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহিম, মোহাম্মদ আনসার আলী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ ও সবিহ-উল-আলমের ছাপাইছবি স্থান পায়।[৫৮] এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ চিত্রসমূহ জনমানসে সংগ্রামী চেতনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১-এর মার্চের স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে শিল্পী মুর্তজা বশীর পাকিস্তান তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সে সময় আমি সচেতন শিল্পী হিসেবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।'[৫৯] বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে শিল্পীরা এভাবেই নিজেদের সম্পৃক্ততার সাহসী পরিচয় দিয়েছেন।

১২ই মার্চ ঢাকায় আর্টস কাউন্সিল গ্যালারিতে বিকেল ৪টায় চারু ও কারু শিল্পীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন।

এই সভায় শহীদ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শিল্পী মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরীকে আহবায়ক করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের অন্য সদস্যরা হলেন– শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হাশেম খান, নাসির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, কাজী আবদুল বাসেত, প্রফুল্ল রায়, নিতুন কুন্ডু, মতলুব আলী, কে. জি. মোস্তফা, হাসান হাবিব ও সিরাজ।[৬০] সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

১. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের 'প্রতীক'কে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সংগ্রামী মনকে প্রেরণা দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা।

২. সভা-মিছিলে সাইক্লোস্টাইল করে অথবা ছাপিয়ে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা।

৩. আন্দোলনমুখী পোস্টার ও ফেস্টুন প্রচার।

৪. পোস্টার ও ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন।

৫. এই পরিষদের ইউনিটগুলোর বিশেষ জরুরি অবস্থায় অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ।[৬১]

এদিন শিল্পী কামরুল হাসানের আহবানে 'বাংলা পটুয়া সমাজ' নামে একটি সভা আর্টস এনসেম্বল গ্যালারিতে অনষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. কার্টুন, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি সর্বত্র সঠিকভাবে বিলি-বিতরণের জন্য স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

২. প্রদেশের সব পটুয়াকে (চিত্রশিল্পী) 'আর্টস এনসেম্বল', ধানমণ্ডি-২ নম্বর সড়কে যোগাযোগ করার আহবান জানানো হয়।

৩. বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ডিগ্রীধারী শিল্পী ছাড়াও সাধারণ সাইনবোর্ড পেইন্টার এবং অন্যান্য সাধারণ শিল্পীকে সংগ্রামে শামিল করে সব ধরনের কাজের সাহায্য নিতে হবে।

৪. অবিলম্বে প্রদেশের সব ধরনের পটুয়াকে কার্টুন, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদির জন্য 'লে-আউট' আর্টস এনসেম্বলে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়।

৫. সংগ্রাম উচ্চ পর্যায়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরো পটুহস্তে কার্টুন, ফেস্টুন ও পোস্টার করে সংগ্রামী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পটুয়াসমাজ দৃঢ়সংকল্প।

৬. পূর্ব বাংলার পল্লীর জনগণের, হাটের, মাঠের ও ঘাটের অতি আদরের ফুল 'লাল শাপলা'কে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পটুয়াসমাজ সিদ্ধান্ত নেয়।[৬২]

'চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' ও 'বাংলা পটুয়া সমাজ'-এর সিদ্ধান্তসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় বাঙালি চারুশিল্পীদের সংগ্রামী চেতনা ও লড়াইয়ের মানসিক দৃঢ়তা।

১৯৭১ সালে 'বাংলা চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে ঢাকার শিল্পী সমাজ 'স্বাধীনতা' শব্দকে ধারণ করে রাজপথে বেরিয়ে আসেন, নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।[৬৩]

এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ, মঙ্গলবার[৬৪] (চিত্র : ৪)। এই দিনের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশে প্রায় পঁয়ত্রিশটির মতো কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার ছিল। সব কার্টুনের বিষয়ে দেশের বিস্ফোরণোন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র ফুটে ওঠে। মিছিলের কয়েকটি কার্টুন ও ফেস্টুনের ভাষা– 'শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম কর', 'আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন,' 'বিদ্রোহ চারিদিকে বিপ্লব আজ', 'তল্পী এবার গুটাও ভাই, বাঁদর নাচ ক্ষান্ত দাও' প্রভৃতি। মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমদ, মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ।[৬৫] এই সমাবেশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেন :

> আমাদের সবুজ শ্যামল এই দেশ আজ লাল রংয়ের দেশ, অনেক রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করেছি সবুজের দেশে।... এবারকার এই গণজাগরণে আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের চেহারা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি কিভাবে দেশের সবুজ মাঠ আমার ভাই-এর রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।... শিল্পীর তুলি অত্যাচারীর বন্দুকের চাইতেও বেশী শক্তিশালী। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পীদের যে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, চিত্রকলার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সুন্দরভাবে হতে পারে। তিনি বলেন স্বাধিকার সংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য শিল্পীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।[৬৬]

শিল্পী মুর্তজা বশীর বক্তৃতায় বলেন, 'জনগণের এই মুক্তি সংগ্রামের সময় কেউ ঘরে বসে থাকতে পারেন না। বাংলাদেশের এই স্বাধিকার সংগ্রামে দেশের বীর জনতা বুকের রক্ত দিয়ে মুক্তির বীজ বপণ করেছেন, এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে থাকলে চলবে না। শিল্পীরা জনগণেরই লোক'।[৬৭]

সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং মিছিলটি বাহাদুর শাহ্ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। স্বা ধী ন তা শব্দটি (চারটি অক্ষর) বুকে ধারণ করে মিছিল আগুয়ান হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পথেই পা বাড়ায়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায় **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ একদিকে যেমন গণসংগ্রামের ধারাবাহিকতা তেমনি সাংস্কৃতিক সংগ্রামের পরিণতি। তাই দেখা যায়, '৭১-এর মার্চ মাসে গণহত্যার সূচনায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করে শহীদ মিনার।[৬৮] কারণ শহীদ মিনারই ছিল বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের শপথ গ্রহণ কেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীরা প্রতিরোধ রচনা করেন। সামগ্রিকভাবে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামে শিল্পীদের একাত্মতা প্রসঙ্গে শিল্পী কামরুল হাসানের মতামত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য−

> বাংলাদেশের শিল্পীদের ... নিজস্ব চিন্তাধারা অবশ্যই আছে এবং সরাসরি দেশ এবং দেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারার সাথে তা সম্পৃক্ত। তাই মানবতাবিরোধী যেকোন কাজের সাথে সাথেই তাদের মনে তার প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেছে। পাকিস্তানি চক্রের বিরুদ্ধে তাই বাংলাদেশের নগণ্য কিছুসংখ্যক ছাড়া সকলেই আপন আপন বিবেক-বিবেচনা এবং মানবতাবোধের তাড়নাতেই তুলির ললিত রেখা বন্ধ রেখে সংগ্রামী বলিষ্ঠ রেখাকেই হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত যখনই নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তখন তারা তাদের রং-তুলির দিকে তাকিয়েই নিয়েছে। কোনো নেতা বা উপনেতা অথবা দলের সিদ্ধান্তের আগেই। শিল্পীরা এসব করেছে সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তারা প্রমাণ রেখে এসেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পর্যন্ত শিল্পী সমাজের প্রতিরোধে একাত্মতা, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই এর প্রমাণ মেলে।[৬৯]

মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিল্পী কামরুল হাসান। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে, কামরুল হাসানের মানস গঠিত হয়েছিল ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশকে ছাত্র অবস্থাতেই। "ছবি রচনার সূচনালগ্নে 'জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ' আন্দোলনের এই পঞ্চব্রতে পরিস্রুত হয়েছিল কামরুল হাসানের মনন-ভাবনা।"[৭০] ফলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধেও কামরুল হাসানের অনন্য ভূমিকা থাকা খুবই স্বাভাবিক। যাহোক, **১৯৭১**-এর অসহযোগের দিনগুলিতে তিনি হাতিরপুল এলাকায় প্রতিরোধ কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ২৫শে মার্চের গভীর রাত পর্যন্ত হাতিরপুল এলাকায় তাঁরই নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজ চলে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় পৌঁছান **১২** এপ্রিল।[৭১] শিল্পী কামরুল হাসান প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। যিনি ছিলেন 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেনসিয়া' নামক সংগঠনের সহ-সভাপতি[৭২] (চিত্র : ৫)। যুদ্ধকালে শিল্পী কামরুল হাসান 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শীর্ষক একটি পোস্টার আঁকেন। দানবীয় চেহারায় আঁকা ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি সংবলিত এই পোস্টারটি বাঙালিদের মনে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার জন্ম দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ে উদ্দীপনা জাগায়। এই পোস্টার প্রসঙ্গে শিল্পী নিজেই বলেন, শুধু মুজিবনগরে বসেই আমি ইয়াহিয়া খানকে দানবের মূর্তিতে আঁকিনি, আমি **১৯৬৯** সাল থেকেই গোপনে ঢাকায়

বসেই ওই প্রতিকৃতি আঁকতে থাকি। ১৯৭১ সালের ২৩ শে মার্চ শহীদ মিনারে ওই প্রতিকৃতি সম্বলিত কমপক্ষে ১০টি পোস্টার আঁকা হয়েছিল। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে'।[৭৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর শিল্পী কামরুল হাসান চারুশিল্পীদের উদ্দেশ্যে তাদের কর্তব্যের তাগিদ দিয়ে বলেন–

> সারাদেশ এখন মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা শিল্পীসমাজ এ যুদ্ধ থেকে বিছিন্ন নই। আমাদের রংতুলিই এখন আমাদের হাতিয়ার। মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই এখন আমাদের কর্তব্য। তিনি আরও বলেন 'মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে ও বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।[৭৪]

প্রবাসী সরকারের প্রচার বিভাগের অধীনে ১৯৭১এ কামরুল হাসানের তত্ত্বাবধানে পোস্টার আঁকেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, বীরেন সোম প্রমুখ। সে সময় শিল্পীদের আঁকা পোস্টারগুলির ভাষা হলো 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম... রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব' ইত্যাদি। এরকম অনেক পোস্টার, লিফলেট প্রবাসী সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়।[৭৫] শিল্পীদের আঁকা পোস্টারসমূহ জনমানসকে যেমন আবেগ- আপ্লুত করেছে তেমনি তাদের মনে জাগিয়েছে প্রতিরোধের দৃঢ় চেতনা।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও গণহত্যার চিত্র সারা বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ার মানসে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর ও কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, রণজিৎ নিয়োগী, আবুল বারক আলভী, গোলাম মোহাম্মদ, স্বপন চৌধুরী, কাজী গিয়াসউদ্দিন, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, বিজয় সেন, বরুণ মজুমদারসহ মোট ১৭জন। এই প্রদর্শনীতে তাঁদের ৬৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যেমন, শিল্পী কামরুল হাসান-এর আঁকা কম্পোজিশন-১, কম্পোজিশন-২, বাংলাদেশ গণহত্যার আগে, বাংলাদেশ গণহত্যার পরে, এপ্রিলের পূর্ণচাঁদ শীর্ষক শিল্পকর্ম।

মুস্তাফা মনোয়ার-এর আঁকা একীভবন, গর্বিতা মা, নারী এবং পশু, বাংলাদেশ-১, বাংলাদেশ-২, বাংলাদেশ-৩, স্মৃতি এবং ভূমি।

দেবদাসচক্রবর্তী-এর ক্রুশবিদ্ধ মানবতা, স্বাধীনতার সৈনিক।

নিতুন কুন্ডুর আঁকা বাংলাদেশ'৭১, সাহায্যের জন্য কান্না।

নাসির বিশ্বাস-এর ধর্ষণ।

প্রদর্শনীটি প্রথমে কলকাতায় ও পরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলিতে ফুটে ওঠে পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনি। কিছু ছবি বীভৎস হলেও ছবির উপজীব্য বিষয় ছিল একবারেই বাস্তব। দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়কে শিল্পীরা আপন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বকীয় ভঙ্গিতে রং ও রেখার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।[৭৬] এই চিত্রপ্রদর্শনী বাঙালির অগ্নিগর্ভ সময়ের সচিত্র দলিল এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রদর্শনী বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্‌জীদা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ওয়াহিদুল হকের পরিচালনায়[৭৭] গড়ে ওঠা 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' নামক সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি দল ভারতের শরণার্থী শিবির ও মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন মুক্তিফৌজ ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে, পুতুল নাচ ভিত্তিক নাটক দেখিয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। শিল্পী স্বপন চৌধুরী ছিলেন ঐ দলেরই একজন (চিত্র : ১৫)। তিনি সেখানে গান গেয়েছেন আবার ছবি এঁকেছেন শিল্পী মনের অসহিষ্ণুতার তাড়নায়, দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে।[৭৮] শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারও ছিলেন এই দলের একজন সদস্য, শিল্পী দলে থেকে 'পাপেট শো' নির্মাণ ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন।[৭৯] শিল্পী 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেনসিয়া' সংগঠনেরও সদস্য ছিলেন।[৮০]

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা প্রসঙ্গে সন্‌জীদা খাতুন বলেন–

> শিল্পী সংস্থার মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে দেশের গান গেয়ে তাদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখা। শরণার্থীদের চরম দুর্দশার পরিবেশে গিয়ে আশার সুর শোনানো।... পশ্চিম বাংলার আনাচ-কানাচে তো বটেই, বাংলার বাইরেও এই দল নানা জায়গায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের সমর্থনের মনোভাব গড়ে তুলেছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ হয়েছিল দিল্লিতে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। সেখানে নানান দেশের প্রতিনিধিদলের সামনে গেয়ে শোনানো হয়েছিল দুঃখিনী বাংলা মায়ের ওপরে হানাদারদের পাশবিক অত্যাচারের বেদনাগাথা, আর সব বাধা ভেঙ্গে দৃপ্ত জয় অর্জনের শপথের কথা।... এসব গান গাইতে গাইতে পবিত্র দেশপ্রীতি সবার অন্তরে জেগে উঠত। শুনেছি, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় *কালান্তর* কাগজে এর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন : দীপশিখার মতো আলোকিত মুখগুলো দুলে দুলে উঠত আবেগে।[৮১]

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের তরুণ শিল্পীরা অনেকেই যোগ দেন। যাঁরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। জনাবুল ইসলাম, আবু তাহের,[৮২] আবুল বারক আলভীসহ অনেক শিল্পীই পাকসেনাদের

নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। আবুল বারক আলভী সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে শিল্পী আলতাফ মাহমুদ ও তার আত্মীয়স্বজনকে পাকআর্মি ধরে নিয়ে যায়, সে সময় তাঁদের সাথে শিল্পী আলভী ছিলেন। শিল্পী আবুল বারক আলভী মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে যান এবং একাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঢাকা আসেন। ওইসময় তিনি আলতাফ মাহমুদের বাসায় ছিলেন। পাকসেনারা তাঁকে আলতাফ মাহমুদের সঙ্গে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে নির্মম নির্যাতন করে। পরে যখন আলাদা করা হয় পরস্পরের কাছ থেকে তখন খানসেনারা তাদের জিজ্ঞাসা করে 'আলভী কৌন হ্যায়'? তখন শিল্পী আলভী তার নামের প্রথম অংশ 'আবুল বারাক' বলে মুক্তি পান।[৮৩]

শিল্পী শাহাবুদ্দিন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। জাহিদ মুস্তাফা শিল্পী শাহাবুদ্দিন সম্পর্কে লেখেন, '...তাঁর মানসে জাগ্রত হয় প্রতিবাদী চেতনা। সময়ের এই সন্তান চিত্রকলার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত থেকে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন। শানিত সাহস ও শৌর্যবোধ তৈরি হয়। একাত্তরে জড়িয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে।'[৮৪]

শিল্পী হাশেম খানের লেখা থেকে শিল্পী শাহাদত চৌধুরী, ফতেহ আলী-র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায়।[৮৫] শিল্পী বীরেন সোমের লেখা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের যে তালিকা পাওয়া যায় তা হলো– শাহাদাত চৌধুরী, জি এম এ রাজ্জাক, হরিহর সরকার, মইনুল হোসেন, সৈয়দ সালাহউদ্দিন চৌধুরী, এম. এ. খালেক, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, জি. এম. খলিলুর রহমান, এ কে এম কাইয়ূম, সিরাজউদ্দিন এবং বনিজুল হক।[৮৬]

এভাবে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলার চারুশিল্পীরা লড়াই করেছেন কেউবা অস্ত্র হাতে আবার কেউবা তুলির ভাষায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের পাশাপাশি চারুশিল্পীরাও পালন করেন অনন্য ভূমিকা।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে শিল্পীর তুলিতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকলা নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পরপরই ঢাকা চারুকলা কলেজের কয়েকজন শিল্পী গড়ে তোলেন 'পেইন্টার'স গ্রুপ'। এ গ্রুপের সদস্যরা হলেন শিল্পী চন্দ্র শেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, কাজী হাসান হাবীব, মনসুরুল করিম প্রমুখ। ১৯৭২ সালে এই গ্রুপের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর গড়ে ওঠে 'ঢাকা পেইন্টারস গ্রুপ'। এ গ্রুপের শিল্পীরা হলেন তরুণ ঘোষ, দীপা হক, বিমল পাল, সুকুমার পাল, নজরুল হোসেন, কুহু, উত্তম দে প্রমুখ। এসব শিল্পীর কাজেও মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে নিজস্ব শৈলীতে।[৮৭]

স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতি তার নিজস্ব সংবিধান রচনা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়াই এর মূল লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই সংবিধানের মূল ভিত্তি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭২

সালের সংবিধান সুচারুরূপে পরিস্ফুটনে চারুশিল্পীরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন[৮৮] (চিত্র : ৬)। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পরে জেনারেল জিয়া সংবিধান থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর এদেশীয় দোসরদের এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এই সময়। জেনারেল এরশাদ আরো একধাপ এগিয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। এভাবে পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক ও স্বৈরাচারীশক্তি তাদের শাসন-শোষণ জিইয়ে রাখতে বাঙালির আত্মপরিচয়েরক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। এরশাদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় জনজীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। বিরোধী দলের বিক্ষোভ, প্রগতিবাদী মিছিল ও সমাবেশে পুলিশের হামলায় শত শত মানুষ প্রাণ হারায়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়, একই আইনে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়, সাংবাদিকরা জেল-জুলুমের শিকার হন। মোটকথা, জনমানসে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে রাজনৈতিকভাবে সচেতন সকল মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে চারুশিল্পীরাও এই আন্দোলনে শরিক হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজেদের আন্দোলন বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে গঠন করেন 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' যা পরবর্তী সময়ে স্বৈরশাসক এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ-এর নেতৃত্বে ১১৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন জোটভুক্ত হয় যাদের মধ্যে চারুশিল্পী সংসদ ও চারুকলা ইনস্টিটিউট অন্যতম।[৮৯] এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেও শিল্পী কামরুল হাসান এক প্রচণ্ড প্রতিবাদী সত্তা। ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক সম্মিলনী উৎসব হয়। এই দিন বিকেলে স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির আসনে টানা ছয় ঘণ্টা বসে থেকে কবিতা শোনার পাশাপাশি তিনি স্কেচ করতে থাকেন। কবি রবীন্দ্র গোপের ডাইরির পাতায় এরশাদকে ব্যঙ্গ করে আঁকলেন 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'। শিল্পী কামরুল হাসান এভাবে স্কেচ করা অবস্থায় ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।[৯০] জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও শিল্পী আপসহীনভাবে লড়ে গেছেন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পক্ষে। তিনি প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী শিল্পী সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের একজন।

আশি ও নব্বইয়ের দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংগ্রামরত তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন শিল্পী ঢালী আল মামুন, নিসার হোসেন, শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত 'সময়' গ্রুপ ও বিভিন্ন শিল্পী।[৯১] এভাবে চারুশিল্পীদের প্রগতিশীল ভূমিকা স্বৈরশাসকের পতনকে বেগবান করে তোলে।

এরশাদপরবর্তী সময়েও দেশে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদী স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির তাণ্ডব চলতে থাকে। ১৯৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সংঘটিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'তে চারুশিল্পীদের সম্পৃক্ততা এবং এই বিষয়ের সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তা লক্ষণীয়। বাঙালির প্রাণের উৎসব, সর্বজনীন উৎসব 'পহেলা বৈশাখ' উদ্যাপনও ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তান পর্বেও পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ উৎসব শাসকচক্রের বাধার সম্মুখীন হয় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনেও পহেলা বৈশাখ এক নতুন মাত্রা যোগ করে। মূলত আইয়ুব সরকারের সময় বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতার প্রতিবাদ হিসেবেই বৈশাখের প্রথমদিনে ছায়ানট রমনার বটমূলে নববর্ষ পালনের আয়োজন করে। ক্রমশ এই অনুষ্ঠান ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীতির বিরুদ্ধে ও বাঙালি ঐতিহ্য লালনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ পালিত হতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়।[৯২] ২০০১ সালের ১৭ ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মওলানা উবায়দুল হক বলেন, 'মুসলমানদের দুই ঈদ ছাড়া অন্য কোনো উৎসব নেই। পহেলা বৈশাখের উৎসব মুসলমানের জন্য নয়।'[৯৩] কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ তথা চারুশিল্পীরা সকল বাধাকে উপেক্ষা করে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন করে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র মধ্য দিয়ে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে চারুশিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ বিচারের দাবিতে শাহ্বাগ চত্বরে গড়ে ওঠে 'গণজাগরণ মঞ্চ'– এই আন্দোলনে চারুশিল্পীরাও অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভাস্কর রাশা, শিল্পী মনিরুজ্জামান ও ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর কথা।

২০১৭ সালে চারুশিল্পীদের অগ্রণী ভূমিকাতেই বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ইউনেস্কো-ঘোষিত বিশ্বঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। অতএব বলা যায় যে, চারুশিল্পীরা শুধু শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন না, বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রাণে ধারণ করে, লালন করে এবং বিশ্বসমাজে তাকে ছড়িয়ে দিয়ে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঋদ্ধ শিল্পীর সামাজিক দায়ও পালন করেন।

উপসংহার

ইসলামি জাতীয়তাবাদী চেতনায় জন্ম নেওয়া পাকিস্তানে ছবি আঁকার চর্চা ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। কারণ ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনে ছবি আঁকার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ লক্ষ করা যায়। মানুষ বা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কন বা মূর্তি নির্মাণ ইসলামি অনুশাসন বিরোধী। ফলে পাকিস্তানের রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থার মাঝে চারুশিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এতদসত্ত্বেও ঢাকায় চারুকলা চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এবং এদেশের চারুশিল্প প্রথম

থেকেই অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র লাভ করে। চারুশিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে ধর্মীয় কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে দেখা যায় স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের চারুশিল্প একটি প্রগতিশীল রূপ পরিগ্রহ করে।

স্বাধীনতার পর সাভারে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় *জাতীয় স্মৃতিসৌধের*। ১৯৭২ সালে গাজীপুরের চৌরাস্তায় নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্মারক ভাস্কর্য 'জাগ্রত চৌরঙ্গী'। ভাস্কর্য শিল্পচর্চা ইসলামি মৌলবাদীদের আক্রোশের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত *অপরাজেয় বাংলা* ভাস্কর্য নির্মাণে মৌলবাদীদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়, ব্যাহত হয় নির্মাণের স্বাভাবিক ধারা এবং এই ভাস্কর্যও গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় পর। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশকিছু ভাস্কর্যের ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর স্থাপত্য-ভাস্কর্য জাতিকে উজ্জীবিত করে সবচেয়ে বেশি। স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালির সকল আন্দোলন-সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে শহীদ মিনার। আজও বাঙালিরা সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনায় শানিত হতে জড়ো হয় শহীদ মিনারে, আর *অপরাজেয় বাংলা*'র পাদদেশে। লড়াইয়ে সংকল্পবদ্ধ হয় এখান থেকেই।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতা পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে চারুশিল্পের সম্পৃক্ততা চোখে পড়ার মতো। শিল্পীর শিল্পকর্ম ছিল প্রতিবাদের হাতিয়ারস্বরূপ, সকল আন্দোলন সংগ্রামে চারুশিল্পী বা তাঁদের অঙ্কিত শিল্পকর্মের প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় চারুশিল্পে সেই প্রতিবাদী সুরের ধারা যেন ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তবে একথা সত্য যে, সমাজে প্রতিবাদী চরিত্র জিইয়ে থাকে সব সময়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ সময়ের হতাশা-নিরাশা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসঙ্গতি, সমকালীন রাজনীতি শিল্পকর্মের উপজীব্য হয়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টাও লক্ষণীয়। নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এক কামরুল হাসানের একটি ব্যঙ্গচিত্র *দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে* ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসকের অবসানের পর বাঙালিরা নতুন করে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। সমাজে বিরাজ করতে থাকে ভণ্ডামি আর গোঁড়ামি, হতাশা-অস্থিরতা। এসব কিছু হয়ে উঠেছে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি, ব্যঙ্গচিত্রের ভাষা। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে শিল্পীর রাজনীতি সচেতনারও পরিচয় মেলে। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বাধা উপেক্ষা করে চারুশিল্পীরাই বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে বরণ করে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারাকে প্রবহমান রাখে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তির সমান্তরালেই প্রবহমান থাকে রক্ষণশীল, মৌলবাদী শক্তি, তারা নস্যাৎ করতে চায় সমস্ত প্রগতিশীলতাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদী অবিনাশী চেতনা কখনও ম্লান হওয়ার নয়, বরং তা জাতির সংকট, বিপর্যয়ে জাতিকে পথ দেখাবে চিরকাল এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ।

চিত্র : ১। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে চারুশিল্পীদের মিছিল।

সংগৃহীত : নাসিমুন আরা হক (সম্পা.), *বেঙ্গল বারতা*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

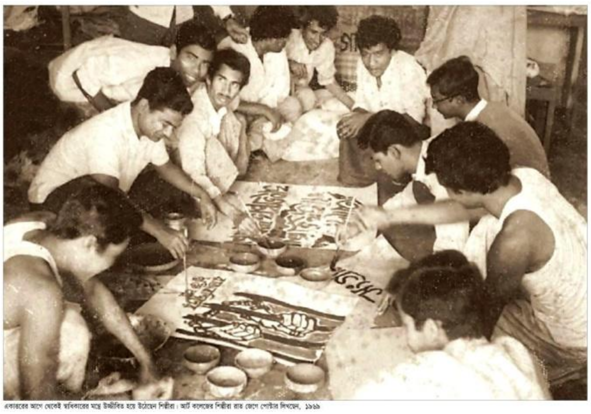

চিত্র : ২। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে রাত জেগে পোস্টার অঙ্কনরত চারুশিল্পীরা।
সংগৃহীত : *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৯

চিত্র : ৩। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের ব্যানারে বক্তব্যরত শিল্পী কামরুল হাসান। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৭১।

সংগৃহীত : প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ *বাংলাদেশ* ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২

চিত্র : ৪। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনে (১৬ই মার্চ) চারু ও কারু শিল্পীদের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলের বামদিকে প্ল্যাকার্ড হাতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই মার্চ ১৯৭১

চিত্র : ৫। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদের সদস্য শিল্পী কামরুল হাসান।

সংগৃহীত : *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩

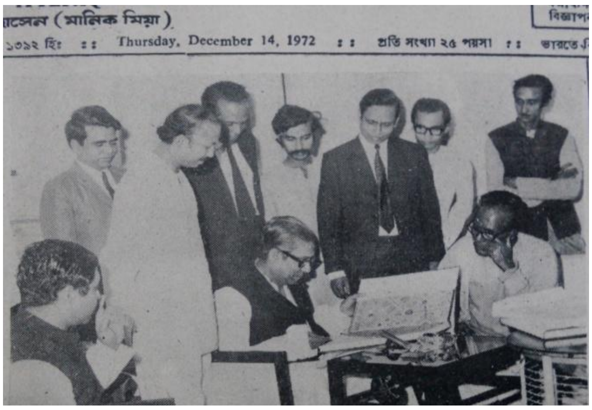

চিত্র : ৬। ১৯৭২ সালের সংবিধানের কপি দেখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ আরও অনেকে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. কামরুল হাসান, "আমার কথা: বাংলাদেশের শিল্পী আন্দোলন," আবুল হাসনাত (সম্পা.), *গণসাহিত্য*, তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, (মে, ১৯৭৫), পৃ. ১৮। কামরুল হাসানের এই লেখাটি সম্প্রতি আরো একটি পুস্তকে গ্রন্থিত হয়েছে, দেখুন, কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, সৈয়দ আজিজুল হক (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ১৭-৪৮

২. সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন, ১৯৪৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ছাত্রভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ক্লাস শুরু হয় ১৫ই নভেম্বর। সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন: সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৫৬-৬৪; জাফর ওয়াজেদ লিখেছেন ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট। জাফর ওয়াজেদ, "জন্মশতবর্ষে জয়নুল আবেদিন", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৬ই ডিসেম্বর, ২০১৪।

৩. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০; আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৩৩; সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৪. নজরুল ইসলাম, "বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশকের শিল্প ও শিল্পী", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *শিল্প ও শিল্পী*, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (নভেম্বর, ২০১১),পৃ. ১২

৫. *ঐ*, "ষাটের দশকের শিল্প ও শিল্পী : বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রাধান্য", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *শিল্প ও শিল্পী*, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ২০১২), পৃ. ২১-২২

৬. সৈয়দ আজিজুল হক, "জয়নুলের দায়বোধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪

৭. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী,২০১৩), পৃ.২৫৩; ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সময় ঢাকায় বামপন্থি মানবতাবাদী প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'।

৮. আমিনুল ইসলাম,"চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে বাঙালি শিল্পী", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, অষ্টম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর,২০১১), পৃ. ১২৯

৯. শাওন আকন্দ, "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা" (পর্ব-০১), নীলিমা আফরিন (সম্পা.), *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৯), পৃ. ১৭

১০. *তদেব*

১১. আবুল মোমেন, "কবি ও কর্মী" শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ৩৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা (মে, ২০১২), পৃ. ৪১-৪২

১২. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬১

১৩. মুস্তাফা মনোয়ার, "পাপেট গুরু মুস্তাফা মনোয়ার" আনোয়ার মুস্তাফা গৃহীত সাক্ষাৎকার, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, চৈত্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২

১৪. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩

১৫. মামুন কায়সার, *চিত্রশিল্পী ইমদাদ হোসেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৪২

১৬. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১৭. *তদেব*, পৃ.২৫

১৮. *তদেব*, পৃ.২৮; বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩),পৃ. ১৫৮

১৯. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪২

২০. *তদেব*, পৃ. ২৬১

২১. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

২২. শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

২৩. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

২৪. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, "বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে চিত্রকলার ভূমিকা", *আইবিএস জার্নাল*, ১৫শ সংখ্যা, ১৪১৪, পৃ. ২২

২৫. মোহাম্মদ ইদ্রিস, "আলোর পথের যাত্রী", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ* (ঢাকা: মানব প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১৫৯-১৬০

২৬. শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

২৭. *তদেব;* বশীর আলহেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৭০

২৮. প্রবোধকুমার সান্যাল, *সংবাদ*, ১১.২.১৯৫৭ (উদ্ধৃত),সাঈদ-উর-রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২০)* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০১), পৃ. ৩৪

২৯. মফিদুল হক, "মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১

৩০. সাঈদ-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৩১. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– Md. Abul Kashem, "History of the Student Movement of East Bengal and East Pakistan (Now Bangladesh), 1947-1969: An Analytical Study", (Unpublished Ph.D. Thesis, Jadavpur University, 1992), pp. 244-318

৩২. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩

৩৩. আনোয়ার হোসেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯; শাওন আকন্দ, "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা" (পর্ব-০২), নীলিমা আফরিন (সম্পা.), *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (এপ্রিল- জুন, ২০০৯), পৃ. ৪৫

৩৪. আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯-২১০

৩৫. *তদেব*, ২১২-২১৩

৩৬. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৩৭. মামুন কায়সার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৩৮. ১৩৭০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের দ্বার'– সনজীদা খাতুন, *সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ৬৮

৩৯. শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৪০. বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, সুবলকুমার বণিক (সম্পা.), (ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ৪৬

৪১. *তদেব*।

৪২. হাশেম খান, "একুশের আলপনা", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৪৩. বীরেন সোম, "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা", মতলুব আলী (সম্পা.), *বীরেন সোম* (ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ৯৮

৪৪. সৈয়দ আবদুল্লাহ, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২০০০*, শাহাদত চৌধুরী (সম্পা.), ৭ম বর্ষ ১৪ সংখ্য (২৫ মার্চ ২০০৫), (উদ্ধৃত), শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০

৪৫. বীরেন সোমের সাক্ষাৎকার (উদ্ধৃত), শাওন আকন্দ, *তদেব*, পৃ.৫২

৪৬. *তদেব*, পৃ.৫১; বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬

৪৭. নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর সাক্ষাৎকার (উদ্ধৃত), শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫২

৪৮. রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার (উদ্ধৃত), শাওন আকন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৪৯. হাশেম খান, "প্রথম নবান্ন", গোলাম সারওয়ার (সম্পা.), *কালের খেয়া* (*দৈনিক সমকাল*, শুক্রবারের সাময়িকী), (২৩ শে নভেম্বর ২০১২), পৃ. ৯-১০

৫০. *তদেব*

৫১. নজরুল ইসলাম, "সত্তর দশকের শিল্প ও শিল্পী: অন্যতম প্রেরণা মুক্তিযুদ্ধ", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা মে, ২০১২), পৃ. ৬৩; সৈয়দ আজিজুল হক, "নিসর্গ ও মানবের গাথা: জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন", (বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাটালগ), পৃ. ২২; 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ'– পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি– মৃণাল ঘোষ, "দেশাত্মবোধের বিশ্বগত রূপ: শিল্পী জয়নুল আবেদিন", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, একাদশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০১৪), পৃ. ৬৪-৬৫; সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন: সৃষ্টিশীল জীবন*সমগ্র (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৫১; আবুল মনসুর, *জয়নুল আবেদিন* (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন জয়নুল আবেদিন তাঁর 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি ত্যাগ করেন ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে ময়মনসিংহে মওলানা ভাসানীর জনসভায়, (পৃ.৭৯) আবার *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১-এ রির্পোট রয়েছে জয়নুল আবেদিন ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ তাঁর 'হিলাল-ই- ইমতিয়াজ' তঘমা ত্যাগ করেন।

৫২. আবদুল হক, *স্মৃতি সঞ্চয়-২, চল্লিশ বছরের সাহিত্য পরিক্রমা*, সৈয়দ আজিজুল হক (সংগ্রহ ও সম্পা.), (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ১৯-১২৮

৫৩. সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০৮), পৃ. ১৬০

৫৪. সন্তোষ গুপ্ত, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৬৯–মার্চ ১৯৭১)", প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১৯৩

৫৫. সৈয়দ আজিজুল হক কামরুল হাসানের 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' এর সাথে সম্পৃক্ততা উল্লেখ করেছেন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে। সৈয়দ আজিজুল হক, "কামরুল হাসান", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ.২৮৭। "বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ" প্রসঙ্গে সন্‌জীদা খাতুন বলেন, "একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে হাসান ইমামকে আহবায়ক এবং ওয়াহিদুল হক আর আতিকুল ইসলামকে যুগ্ম আহবায়ক করে "বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ" গঠিত হয়েছিল।" সন্‌জীদা খাতুন, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০০), পৃ. ৩৭। মফিদুল হক, *বাংলাদেশের মুক্তিসাধনা: টুকরো কথার ঝাঁপি* (ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ৮৮ এবং ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ.২৭৩-২৭৪, (ওয়াহিদুল হক-এরা লিখা উল্লেখপূর্বক) 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে সময় উল্লেখ করেন ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময়। ফলে এখানে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ে মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ এবং ৯ মার্চের *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত আলোকচিত্র ও পরিবেশিত সংবাদ থেকে বলা যায় যে,'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' গড়ে ওঠে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে।

৫৬. সৈয়দ আজিজুল হক, "কামরুল হাসান", পূর্বোক্ত পৃ. ২৮৭। আরও দেখুন– প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ *বাংলাদেশ*, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২

৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৭১

৫৮. মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য* (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ২০১৪), পৃ.২৮০

৫৯. মুর্তজা বশীর (উদ্ধৃত), আতিউর রহমান, *অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ১১৮

৬০. মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮১; আতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৬১. মুর্তজা বশীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১

৬২. *তদেব*, পৃ. ২৮১-২৮২

৬৩. নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৪৬

৬৪. 'স্বাধীনতা' শব্দকে ধারণ করে রাজপথে শিল্পীদের মিছিলের বিষয়ে মতলুব আলী মিছিলের তারিখ ২৩ মার্চ উল্লেখ করে বলেন, ... '৭১- এর তেইশে মার্চ ঢাকায় মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে ইয়াহিয়া বিরোধী পোস্টার- ফেস্টুনে সুসজ্জিত এক মিছিল বের করেন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা। আর্ট কলেজ থেকে যাত্রা শুরু করে শহর প্রদক্ষিণের পর মিছিলটি ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন আর্ট কলেজের অর্থাৎ তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের চারজন ছাত্রী, যাদের গলায় ঝুলানো ছিলো বড় বড় 'স্বা' 'ধী' 'ন' 'তা' লেখা চার অক্ষরের চারটি প্ল্যাকার্ড। পরদিন কাগজে বেরিয়েছিল সেই অনন্য সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর বহনকারী মিছিলের ছবি। চর্তুদিকে যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠেছিলো সেই সময়ে এমন প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ভয়াবহ কালরাত্রি ২৫ শে মার্চের আগে আর কোনো মহল এভাবে এগিয়ে এনেছিলেন কিনা সন্দেহ– মতলুব আলী, *শিল্প ও শিল্পী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৮৯। আবুল মনসুর, *জয়নুল আবেদিন* (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ২০১৩, পৃ. ৭৯) গ্রন্থে মিছিলের তারিখ উল্লেখ করেছেন ১২ই মার্চ। সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন: সৃষ্টিশীল জীবন* সমগ্র (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৫২-এ মিছিলের তারিখ উল্লেখ করেছেন ১২ই মার্চ, তবে তিনি এ মিছিলের তারিখ প্রসঙ্গে ভিন্নমতের কথাও

উল্লেখ করেছেন। মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য* (ঢাকাঃ বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ২০১৪), পৃ. ২৮৩–মিছিলের তারিখ উল্লেখ করেছেন ১৬ই মার্চ, ১৯৭১। *দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, আজাদ* প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকার আলোকে স্পষ্টভাবে বলা যায় এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার।

৬৫. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১

৬৬. *তদেব*।

৬৭. *তদেব*।

৬৮. মফিদুল হক, *প্রাগুক্ত*।

৬৯. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০

৭০. মইনুদ্দীন খালেদ, "কামরুল হাসানঃ লোকঐতিহ্যের আধুনিক রূপকার", মীজানুর রহমান (সম্পা.), *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ৫৬তম খণ্ড (এপ্রিল-জুন, ১৯৯৯), পৃ. ১০২

৭১. সৈয়দ আজিজুল হক, "কামরুল হাসান", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮

৭২. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকাঃসাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৬৯; রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধঃ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ৬৪

৭৩. কামরুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৭৪. বীরেন সোম, "কামরুল হাসানের পোস্টার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬শে মার্চ ২০১২

৭৫. *তদেব*।

৭৬. বীরেন সোম, *"বাংলাদেশের শিল্পীঃ প্রসঙ্গ চিত্রপ্রদর্শনী ১৯৭১"*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৬; *প্রথম আলো ব্লগ*, ১ মে, ২০১৩; ইমতিয়ার শামীম, " শিল্পীর স্বাধীনতা স্বাধীনতার সংগ্রাম", রফি হক (সম্পা.), *শিল্পপ্রভা*, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৩

৭৭. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৭৮. শফি আহমেদ, "একাত্তরের স্মৃতিঃ স্বপন চৌধুরীর চিত্রকর্ম", সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), *একাত্তরের স্মৃতিঃ স্বপন চৌধুরীর চিত্রকলা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৬), দ্র. ভূমিকা অংশ

৭৯. তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *মুক্তির গান*, ডিভিডি (ঢাকাঃ লেজার ভিশন, ২০০৭)-এর অন্তর্গত।

৮০. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

৮১. সন্‌জীদা খাতুন, "রূপান্তরের গান", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩

৮২. নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৮৩. শিল্পী আবুল বারক আলভীর সঙ্গে আলাপচারিতা, ১৫.২.২০১৪, ঢাকা।

৮৪. জাহিদ মুস্তাফা, "ধ্রুপদীগতির শাহাবুদ্দিন", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম,* পঞ্চমবর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (এপ্রিল, ২০০৮), পৃ. ১২২

৮৫. হাশেম খান, *গুলিবিদ্ধ একাত্তর* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১৪

৮৬. বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭-৫৮

৮৭. ইমতিয়ার শামীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৮৮. আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ.৩৮। সংবিধান অলংকরণের প্রধান দায়িত্বে থাকেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। অলংকরণ করেন শিল্পী জনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, আবুল বারক আলভী। পুরো সংবিধান হাতে লিখেন শিল্পী আবদুর রউফ।

৮৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১), পৃ. ১৪-১৫

৯০. তামান্না তাস্‌নিম, "পটুয়া কামরুল হাসান", আবুল হাসনাত ও অন্যান্য (সম্পা.), *বেঙ্গল বারতা,* (১৫ ডিসেম্বর ২০১১), পৃ.১৯। আরও দেখুন, আবদুল হক, *স্মৃতি সঞ্চয়-২, চল্লিশ বছরের সাহিত্য পরিক্রমা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

৯১. উম্মে সোহাগ, "চির নতুনের ডাকে আবারও জেগেছে শিল্পীসমাজ", রফি হক (সম্পা.), *শিল্পপ্রভা,* প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৩), পৃ. ২২

৯২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া* ৭ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ২১৪-২১৫

৯৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ১৩৩

হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী*-তে লোকজ জীবন

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ

হুমায়ুন কবির ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জনের দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন আজীবন কর্মসাধনায় নিমগ্ন থেকে। স্বনামে এবং ভিন্ননামে ত্রিশের দশকে কিছু ছোটগল্প লিখলেও, এমনকি পরবর্তীকালে বিদেশী গল্প অনুবাদ করলেও উপন্যাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ যে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, তা বোঝা যায় একটিমাত্র উপন্যাসই ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচনায়। *নদী ও নারী* উপন্যাসে আধুনিককালের শিল্প-সাহিত্যভাবনার আলোকে গ্রামীণ লোকসমাজভুক্ত ব্যক্তিমানুষের দোষ-গুণ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনুতাপ, ঈর্ষা, ঔদার্য ও ভালোবাসাস্নাত মানবস্বভাবের সার্বিক পরিচয় সচেতনভাবে বিধৃত। বিশেষত পূর্ব-বাংলার সহায়সম্বলহীন প্রান্তিক ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের জীবনধারার চালচিত্রকে সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে গ্রন্থনার তাগিদে তিনি পদ্মা নদীকে কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে অবলম্বন করেছেন। পদ্মাতীরবর্তী মুসলমান লোকগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও বহমান সংস্কৃতির চিত্রায়ণে লেখকের আন্তরিকতা ও শিল্পভাবনা উপন্যাসটির বিশিষ্টতার দাবিদার।

নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)-এর *নদী ও নারী-র* (১৯৫২)[১] বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে। পূর্বসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর *পদ্মানদীর মাঝি*-র (১৯৩৬) কথা স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা চলে, এই উপন্যাসে লেখক পূর্ব-বাংলার সহায়সম্বলহীন প্রান্তিক ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের জীবনধারা সময়ের প্রবহমানতায় কীভাবে বিবর্তিত হয়, তার শিল্পভাষ্য নির্মাণে পদ্মা নদীকে কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে অবলম্বন করেছেন। পদ্মাতীরবর্তী এ লোকগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও বহমান সংস্কৃতির চিত্রায়ণে লেখকের আন্তরিক আগ্রহ ও শিল্পানুধ্যান উপন্যাসটির আদ্যন্ত নিপুণ ভাষাবয়ব পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত এই মানুষগুলোর জীবনযাত্রা, জীবিকা ও সামাজিক পরিচয় তাদের প্রাত্যহিক বিশ্বাস-আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর অনির্দেশ্য কালচক্রে প্রকৃতির ভূমিকা নিয়তির মতোই অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘনীয়। ক্ষুধা মেটাতে ভূমি ও নদীকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ, প্রাচীন ধরনের উৎপাদন কাঠামো তথা কৃষিকাজ ও শিকারকে অবলম্বন, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাত এবং সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে একক অখণ্ড সত্তার মতোই গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই উপন্যাসভুক্ত কুশীলবদের মনোভঙ্গিতে আদিম অরণ্যাচারী লোকসমাজের স্মৃতিকেই নেপথ্যে বহন করে চলে। প্রকৃতির ওপর তাদের নির্ভরতা এতটাই প্রত্যক্ষ যে, এর ভাঙা-গড়ার খেলায় আকস্মিকভাবে বদলে যায় পদ্মাপারের রহিমপুর ও বিয়ানচরের লোকগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।[২] সহজ-সরল, অল্পেই তুষ্ট, শিক্ষাবঞ্চিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো সমুদয় প্রতিকূল পরিস্থিতিকে দৈব, নিয়তি বা বিধির বিধান হিসেবে অকপটে মেনে নিলেও দিনযাপনের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অনমনীয় তেজ তাদের বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। অস্তিত্বরক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিয়জন, বসতবাড়ি, সহায়সম্বল হারিয়ে কপর্দকশূন্য হলেও তারা পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এগিয়ে চলে জীবনের অনিঃশেষ গন্তব্যের পানে। বহুকাল ধরে বহমান স্রোতস্বতী পদ্মার বাঁক পরিবর্তন, ঋতুর পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ এবং খামখেয়ালীপনা এই জনগোষ্ঠীর অলিখিত ইতিহাসে রেখে যায় ভাঙন ও সৃষ্টির নিজস্ব স্বাক্ষর। তাই তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বিবিধ ক্রিয়াকর্মে, পারস্পরিক আলাপ, আড্ডা ও চালচলনে, আচার-উৎসবে, পালা-পার্বণে, মূল্যবোধ-অনুশাসনে অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পদ্মার অমোঘ উপস্থিতি অনস্বীকার্য। আদিম অরণ্যময় প্রকৃতি ও মহাকালের ব্যাপ্তিতে মানবজীবনের ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশের অনুপ্রেরণা পদ্মা-তীরবর্তী রহিমপুর ও এর সংলগ্ন বিয়ানচরের লোকজীবনের শৈল্পিক উপস্থাপনায় [৩] লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই উপন্যাসের বিশেষ প্রবণতা হলো বিভিন্ন লোকজ উপাদানের ব্যবহার।

১. লোকসংস্কার– উপন্যাসে বিধৃত পদ্মাতীরবর্তী রহিমপুর গ্রামের বাসিন্দাদের চেতনালোকে বিভিন্ন ধরনের লোকসংস্কার প্রচলিত, যা গ্রামবাসীর প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা নির্বাহের বাধ্যবাধকতা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে এসব লোকসংস্কার মেনে চলতে। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে, সাংস্কৃতিক আয়োজনে, এমনকি জীবনসংগ্রামের যে কোনো সংকটকালে তারা পূর্বপুরুষদের অনুসৃত এসব সংস্কার-রীতিনীতির শরণাপন্ন হয়।

১.১. পীর-ফকির সংক্রান্ত লোকসংস্কার– পীর-দরবেশ ও ফকিরের প্রতি নির্ভরতা লোকসমাজে লক্ষণীয়। তারা অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, ইচ্ছা করলেই যে কোনো সমস্যার সমাধানে সমর্থ; কারো অনিষ্ট চাইলে তাদের বদদোয়া বা অভিশাপে সবকিছু তছনচ হয়ে যেতে পারে, এমন ধারণা সংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসে গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে। উপন্যাসের 'নজুমিয়া' অংশের 'তিন' পরিচ্ছেদে আবির্ভাব ঘটে নামহীন এক ফকিরের। ধুলদির হাটে তার আসার খবর জানা যায় নজুমিয়ার অনুচর রমজানের মাধ্যমে। তার ধারণা, সেই ফকির 'কামেল ফকির'। তবে নজুমিয়া ফকিরের কেরামতি বা শক্তিতে আস্থাহীন বলেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। রমজান নজুমিয়াকে সতর্ক করে ফকিরের প্রতি তাচ্ছিল্যকর মনোভঙ্গির ব্যাপারে– 'অলিআল্লা দরবেশ– আমাদের মনের কথা জানে। তার নাম নিয়ে হাসি ঠাট্টা কোরো না। ... ফকির দরবেশ

কী না পারে? জানো সে তোমার কথা সব জানে'[৪] (পৃ. ৪১)। রমজান জানায়, ফকির নজুমিয়ার খোঁজ করছিল এবং তাকে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছে। তার ধারণা, ফকিরের দোয়া পেলে নজুমিয়ার সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ক্ষেতের ধান কাটার মজুর পেতে দেরি হবে না। অধিক মজুরির প্রলোভনে মজুরেরা নজুমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানপূর্বক তার কাছে ফিরে এলে রমজান এই ঘটনাকেও ফকিরের কেরামতি হিসেবে বিবেচনা করে। নজুমিয়া তাকে স্পষ্টভাবেই জানায়, আসগরের স্বল্পদরের মজুরির কারণেই ক্ষেতমজুরেরা তার প্রস্তাব নাকচ করেছে, এখানে ফকিরের কেরামতি অচল। একথা শুনে রমজানের অভিমত 'কামেল দরবেশ যেমন ভালও করতে পারে ওনারা বেজার হলে তেমনি বেহদ লোকসানও করতে পারে। ... ওনাদের কথা বলা যায় না। কখনো হাজার গুনা মাফ করে দেন, আবার কখনো একটা কথার তর সয় না' (পৃ. ৪০)। রমজানের বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে ধুলদির হাটে ফকিরের আগমনের চালচিত্র। হাটের পূর্বকোণের প্রাচীন বটগাছের নিচে ঝোপের পাশে সে আস্তানা গেড়ে বসে। তার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, 'মাথায় সবুজ পাগড়ি, হাতে তসবীহ, মুখে সাদা ধবধবে দাড়ি, চেহারায় শান্ত ভাব। দেখলেই ভক্তি আসে' (পৃ. ৪২)। ধ্যানস্থ অবস্থায় তাকে ডাকতে কৌতূহলী মানুষের সাহস না হলেও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মতির মা একপর্যায়ে তার সঙ্গে আলাপে উদ্যোগী হয়। ফকির তার সঙ্গে কথোপকথনের শুরুতেই চোখ মেলে মতির মায়ের কাছে জানতে চায়, সে তার হারানো ছেলের খোঁজ জানতে ব্যগ্র কি না। এ ঘটনায় 'ভিড়ের মধ্যে যেন একটা চমক খেলে গেল– ফকির বিদেশি, কেউ তাকে আগে কোনদিন দেখেনি। সে কী করে জানল যে ছেলে হারিয়ে মতির মা পাগলাটে হয়ে গেছে' (পৃ. ৪২)। মতির মা তার পা জড়িয়ে ছেলের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে ফকির পুনরায় ধ্যানে বসে। কিছুক্ষণ পর 'হঠাৎ বিকট শব্দে সোবহান আল্লা বলে ফকির চোখ মেলে চাইল। শূন্য দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মতির মা'র উপর চোখ পড়তেই বলল, তুমি তোমার ছেলের কথা জানতে চাইলে? সে ভাল আছে এবং শিগ্‌গিরই বউ নিয়ে দেশে ফিরবে' (পৃ. ৪৩)। মতির মা বারবার ছেলের হালহকিয়ত জানতে চাইলে তাকে নিবৃত্ত করতে সে কৌশল গ্রহণ করে– 'আল্লাতালার দয়া হলে মাঝে মাঝে পরদা খুলে যায়, আগামীকালের দু-একটা ছবি দেখতে পারি। বেশি যারা ভবিষ্যত নিয়ে টানা হেঁচড়া করে আল্লাতালা তাদের শাস্তি দেন।' এরপর সে এই গ্রামে আশ্রয় গড়ার আগ্রহ জানায়, পীরের হুকুমে তাকে ধুলদিতে থাকতে হবে। সমাগত মানুষের মধ্যে রোগা লিকলিকে ছোটখাট বৃদ্ধ হামদু মিয়া, যে তার ছয় ছেলে ও স্ত্রীকে হারিয়ে এখন নিঃস্ব, নিজের দুঃখের বৃত্তান্ত জানিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করে, 'ফকির যদি তাকে দয়া করে, ভাল দাওয়াই দেয়, তবে আবার ছেলেপুলে হলে ঘরের জৌলুস ফিরবে' (পৃ. ৪৩)। ফকির তাকে জানায়, তার কাছে 'বুড়োকে জওয়ান করবার দাওয়াই অবশ্যই আছে ...কিন্তু তার জন্য অনেক খরচ লাগে' (পৃ. ৪৪)। হামদু মিয়া সেই শর্তে অবলীলায় রাজি হলে উৎসুক জনতার মধ্যে তাকে নিয়ে আগ্রহ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে তারা বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার চেয়ে তাকে ঘিরে ধরে।

গ্রামের তরুণেরা ফকিরের প্রতি অনাগ্রহী হলেও নারীরা এবং বৃদ্ধরা বিভিন্ন প্রয়োজনে তার দ্বারস্থ হয়। 'কেউ চায় তাবিজ, সোয়ামির মন ফেরাবে। কেউ চায় ছেলে হোক, কেউ চায় ভূত পেত্নির দৃষ্টি না লাগে' (পৃ. ৪৪)। ফলে ফকিরও সুযোগ বুঝে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে সে বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নেয়। যেহেতু গ্রামের আপাতসরল মানুষেরা ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী, তাই একেই হাতিয়ার করে সে অর্থোপার্জনের বন্দোবস্ত করে। স্রষ্টার প্রতি ইমান রেখে গ্রামবাসীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সে অজুহাত সৃষ্টি করে। ফকিরের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও যদি কারো সমস্যার সমাধান না হয়, সেক্ষেত্রে এর দায় এড়াবার জন্যই সে এভাবে প্রতারণার শরণাপন্ন হয়। 'ফকির চালাক লোক, তাবিজ দিক আর দাওয়াই দিক, সবাইকে বলে, এ সব ইমানের কথা। ভক্তি থাকে তো ফল হবে আর ভক্তি না থাকলে ফল হবে না' (পৃ. ৪৪)। ইদ্রিস ফকিরের দৈবী শক্তিতে আস্থাশীল। তার ধারণা– 'ফকির দরবেশের কাছে নানা রকমের দাওয়াই থাকে। তারা ঝাড়ফুঁক করেও অনেক অসুখ ছাড়িয়ে দেয়' (পৃ. ৪৫)। রমজান ও ইদ্রিসের কথায় প্রভাবিত হয়ে যুক্তিবাদী নজুমিয়া শেষ পর্যন্ত তার মা আয়েষার বাতের ব্যথার ওষুধ নিতে ফকিরের দ্বারস্থ হবার কথা ভাবে। ফকিরের প্রতি সন্দিহান নজুমিয়ার সংশয় কেটে যায়, সে তাকে দেখেই 'পঞ্চায়েত' সম্বোধন করায়। এই পর্যায়ে তার ধারণা জাগে 'যে নিজে খাঁটি, সে-ই সাচ্চা মানুষের কদর জানে। হাটভরা এত লোক, আসগর মিয়া ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কই তাদের কাউকে তো ডাকে নি ফকির– ডেকেছে নজুমিয়াকে' (পৃ. ৪৬)। সে তাকে 'বাবা' সম্বোধন করে দোয়া ও দয়া প্রার্থনা করে এবং জানায় 'দোওয়া কর বালবাচ্চা নিয়ে যেন সুখে থাকি, মানইজ্জত বাঁচিয়ে জীবন কাটে, মরবার সময় শান্তিতে যেন চোখ বুঁজি' (পৃ. ৪৬)। ফকির তাকে শান্ত হবার পরামর্শ দেয় এবং জানায়, সে যতদিন তার অস্থিরতার প্রতিকার করতে না পারবে, ততদিন তার শান্তিলাভ ঘটবে না। ফকিরের বিশেষ কৌশল হলো, লোকসমাজে ধর্ম ও স্রষ্টার প্রতি মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে ভক্তদের সমর্থন আদায় করা। তাই সে কখনো বলে, 'মঙ্গল অমঙ্গল কাকে বল? সবই খোদার ইচ্ছা' (পৃ. ৪৬)। নজুমিয়া তার মায়ের বাতের ব্যথার প্রতিকারের জন্য তাবিজ চাইলে সে তাকে অপেক্ষায় রাখে নামাজ পড়ার দোহাই দিয়ে। সে ফকিরকে তোয়াক্কা না করেই আস্তানার ভেতর ঢুকে যায় এবং তার পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ভক্তরা নজুমিয়াকে বিদায় নিতে বলে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর ফকিরের নিকট এলে নজুমিয়া ধারণা করে, সে হয়ত তুকতাকের জন্য এসেছে। তাই একপর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ফকিরকে অপমান করলে সে চোখ বন্ধ করে দুহাত তুলে উৎসুক জনতাকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, একপর্যায়ে তা নজুমিয়ার জীবনে ফলে যায়। পদ্মা নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণের ইঙ্গিত ফকিরের ভাবোন্মত্ত সংলাপে যেভাবে প্রকাশিত হয়, তাতে তার প্রতি জনতার কৌতূহল আরো বাড়ে। এভাবেই সে ধুলদির হাটের বাসিন্দাদের নিকট ফকির হিসেবে সমীহ আদায় করে।

অচিরেই এই ঘটনা সম্পর্কে আয়েষা অবগত হয় এবং নজুমিয়ার সঙ্গে আলাপকালে জানায় 'ফকির মানুষ, তাদের বদদোয়ায় লোকসান করে' (পৃ. ৫২)। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত আয়েষা নজুমিয়াকে আদেশ দেয় পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চর দখলের আগে ফকিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। অবশেষে নজুমিয়া সেবারের নৌযাত্রা থেকে ফিরে এসে ফকিরের সৌজন্যে গ্রামে মিলাদের আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সে নতুন চরের বন্দোবস্ত শেষ করে গ্রামে ফিরতেই আয়েষার অনুরোধে তাকে মিলাদ মাহফিলের আয়োজনে উদ্যোগী হতে হয়। দিনে দিনে ফকিরের অবস্থান যে ধুলদির হাটে দৃঢ় হচ্ছে, নজুমিয়া তা উপলব্ধি করে। সে হাটের পাশেই চালাঘর তুলে মাদ্রাসা স্থাপন করে, গ্রামের কিশোরদের কোরআন মুখস্থ করায়। নজুমিয়া ফকিরের কাছে নিজের রূঢ় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং রহিমপুর গ্রামে মিলাদ পড়ানোর অনুরোধ করে। ফকির যথেষ্ট কৌশলী বলেই এই প্রস্তাবে যেচে রাজি না হয়ে জানায়, 'এখানকার বাসিন্দারা রাজি হলে হয়। দু-দশ ঘর মুরিদ আছে, সাকরেদ তালিবেইলেম আছে, তাদের ফেলে যাব কী করে? ...তুমি যদি জোর কর, তবে আমাকে যেতেই হবে' (পৃ. ৫৮-৫৯)। এরপর সে তার সুবিধা অনুযায়ী মিলাদের তারিখ নির্ধারণ করে। ফকির যে পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিলাদে উপস্থিত হয়, তা থেকে বোঝা যায়, তার বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। বড় ঘাসি নৌকায় অনুচরদের নিয়ে সে ধুলদির হাট থেকে রহিমপুর গ্রামে আসে। আরবি-ফারসি ভাষায় সে যেভাবে ওয়াজ করে, গ্রামবাসী তা বুঝতে অসমর্থ বলেই তার প্রতি তাদের ভক্তি আরো বেড়ে যায়। মিলাদ পড়ানো শেষে তার কাছে বিভিন্ন সমস্যায় পীড়িত গ্রামবাসী এলে সে যথাসাধ্য প্রতিকারের পরামর্শ দেয়। মিষ্টি কথা ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে তাদের আয়ত্তে আনতে সে বেশ পটু। আয়েষা নাতি মালেককে নিয়ে তার নিকট হাজির হয়, ফকিরের দোয়া পাওয়ার আশায়। এরপর ইব্রাহিম তার মৃগীরোগে আক্রান্ত মেয়েকে চিকিৎসার জন্য ফকিরের সামনে আনলে সে একে 'জ্বিনে ধরা' হিসেবে ঘোষণা করে। এর প্রতিকার হিসেবে সে সেই তরুণীর ওপর যেভাবে শারীরিক নিপীড়ন চালায়, তাকে কোনোভাবেই চিকিৎসা বলা চলে না। তবু অজমূর্খ গ্রামবাসী এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফকির সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার হিসেবে মেয়েটির বিয়ে দিতে তার বাপকে পরামর্শ দেয়। এর ফলে 'সকলে অবাক হয়ে ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের ভক্তি আরো বেড়ে গেল' (পৃ. ৬৩)। এভাবেই উপন্যাসে ফকিরের প্রতি গ্রামবাসীর অসীম বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১.২ মানত করা ও বদর পীরের নাম নেয়া– নদী, সাগরে, জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে কুমির, হাঙর বা অন্য কোনো জলজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হলে, এমনকি জলপথে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে লোকসমাজে, বিশেষত জেলেদের মধ্যে বিশেষ কিছু অনুশাসন প্রচলিত। যেমন– পাঁচ পীরের নাম স্মরণ করা, তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করার প্রতীকার্থে নৌকায় সিঁদুরের রেখা লেপন, বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তাদের উদ্দেশ্যে মানত

করা, মিলাদ পড়ানো প্রভৃতি। তবে এসব সংস্কার মোটাদাগে অধিকাংশ গ্রামীণ লোকসমাজে অনুসৃত। উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে অনুরূপ বিবরণ লক্ষণীয়–

ক. মালেক তার কথায় কান দিল না। আপন মনে বলে চলল, বাবা বলে যে জেলেরা সব জোয়ানমরদ। সাঁতরে পদ্মা পার হয়ে যেতে পারে, আর নৌকো ভাসাবার আগে কী যেন সব মানত করে নামে! (পৃ. ২৪)

খ. ততক্ষণে নৌকোর সাজ তৈরি হয়ে গেছে। সে বছরই নজুমিয়া একখানি বড় ডিঙি তৈরি করেছিল ... খালি গলুইয়ের কাছে সিন্দূরের পাঁচটি রেখা, পাঁচ পীরের মানত। (পৃ. ২৭)

গ. গাঁয়ের সবচেয়ে পাকা মাঝি বসির ধরল হাল। বদর বদর করে নৌকো নদীতে নামাল, মাঝি মাল্লা সবাই চেঁচিয়ে উঠল বদর বদর। ডাঙার লোকেরাও যোগ দিল, সকলের গলা ছাপিয়ে মালেকের সরু গলার আওয়াজ। (পৃ. ২৭-২৮)

ঘ. নদীর জলে প্রচণ্ড তুফান তুলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমির ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখন সকলে মিলে ধীরে ধীরে মরা কুমিরসুদ্ধ জাল টেনে তুলল। ... মাঝিরা চেঁচিয়ে উঠল– বদর বদর। পাড় থেকে সবাই সাড়া দিল–বদর বদর। ... আয়েষা এগিয়ে এল, বলল,– খোদার শোকর সবাই ভালয় ভালয় ফিরে এসেছ। সিরনি পাঠিয়ে দাও মসজিদে, আর একদিন মৌলুদ শরীফের বন্দোবস্ত কর। মনে থাকে যেন এ আমার দাদুর শিকার– দাদুর ধরা প্রথম কুমির। (পৃ. ২৯)

ঙ. মাঝ দরিয়ায় তীব্র স্রোতে নৌকার মুখ ঘুরে গেল। জলের মৃদু কল্লোলের বদলে এখন স্রোতের হিংস্র তীক্ষ্ণ ডাক। সবাই একসঙ্গে বদর বদর বলে চেঁচিয়ে উঠল। (পৃ. ৬৭)

চ. বিরাট নদী, অসীম আকাশ আর প্রচণ্ড বাতাস– তারই মধ্যে ছোট নৌকায় কয়েকটি প্রাণী। প্রাণপণে তারা ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল কিন্তু তাদের মুখের 'বদর বদর' ডাক নদীর গর্জনে চাপা পড়ে গেল। (পৃ. ৬৯)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহে লক্ষণীয়, 'ক' থেকে 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'নজুমিয়া'-র অন্তর্গত 'এক' পরিচ্ছেদ থেকে। নজুমিয়ার বালকপুত্র মালেকের কুমির শিকারের দৃশ্য রূপায়ণে কুশীলবদের যে সামষ্টিক অংশগ্রহণ, এতে পূর্বোক্ত লোকসংস্কারসমূহের প্রতিফলন ঘটেছে। জলে নামার আগে জেলেদের পাঁচ পীরের নামে মানত করা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও তাদের স্মরণে সনাতনী পূজার উপকরণ বা সিঁদুরের রেখা দিয়ে নজুমিয়ার নৌকার গলুইয়ের কাছে রেখা আঁকা লোকসংস্কারের প্রভাবগত। বলাবাহুল্য, লোকসমাজে এ-ধরনের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান নিতান্তই স্বাভাবিক। পাশাপাশি জলপথে কর্মসম্পাদনকালে বিপদে পড়লে 'বদর' পীরের নাম স্মরণ এবং মসজিদে শিরনি মানত করা প্রভৃতিও লোকসংস্কারভুক্ত। 'ঙ' এবং 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের 'আট' পরিচ্ছেদ থেকে, যেখানে নজুমিয়া পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চর দখলের বন্দোবস্তের জন্য এক বর্ষণমুখর দুপুরে উত্তাল, বিক্ষুব্ধ নদীর বুকে সঙ্গীদের নিয়ে পাড়ি জমাতে বিপদের সম্মুখীন হয়। 'বদর' পীরের নাম স্মরণ করে আসন্ন সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য এই লোকসংস্কার অনুসরণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ।

১.৩ তুকতাক, জাদু-টোনা করা– স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে বশীকরণের বিভিন্ন উপায় হিসেবে তুকতাক ও জাদু-টোনার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আয়ত্তে রাখার ধারণা বাঙালি লোকসমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। *নদী ও নারী* উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র আসগর ও নজুমিয়ার বাল্যকালীন বন্ধুত্ব একপর্যায়ে ঘোর শত্রুতায় উপনীত হয়, আমিনাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার প্রচেষ্টায়। আমিনা ও আসগর পরস্পরকে ভালোবাসলেও নজুমিয়া বৈষয়িক উন্নতির কারণে আমিনার মাকে কৌশলে বশীভূত করে। বিয়ের পর একপর্যায়ে অহেতুক সন্দেহবশত নজুমিয়া আমিনাকে তালাক দিলে আসগর তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপন্যাসে একাধিকবার আসগর ও নজুমিয়ার কথোপকথনে জাদু, তুকতাক প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন ধুলদির হাটে আগত জনৈক ফকিরের নিকট নজুমিয়া যখন তার মা আয়েষার বাতের ব্যথার প্রতিকারার্থে তাবিজ নিতে গিয়ে আলাপ করছিল, তখন সেখানে আকস্মিকভাবে আসগর উপস্থিত হয়। আসগরের ধারণা, নজুমিয়া হয়ত তার ক্ষতিসাধনের জন্য ফকিরকে দিয়ে তুকতাক করাতে সেখানে এসেছে। কারণ ইতঃপূর্বে সে তাকে কয়েকবার অপদস্থ করেছে। এরই পরিণতিতে তাদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপ নেয়। এরপর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়, যখন ফকির আসগরকে সমাদর করে এবং নজুমিয়া সেখান থেকে চলে না যাওয়ায় বিস্মিত হয়। এই পর্যায়ে নজুমিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে ধারণা করে, আসগর ফকিরকে দিয়ে তুকতাক করাতে চায় তার ক্ষতি সাধনের জন্য। তেমনিভাবে নজুমিয়া যখন অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখিয়ে আমিনার মাকে প্রলুব্ধ করে, বিষয়টি জানতে পেরে আসগর ক্ষুব্ধ হয়। বারবার অনুনয় সত্ত্বেও নজুমিয়া আমিনাকে আয়ত্তের চেষ্টা করায় একপর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে জানায় 'তুমি তাকে জাদু করেছ, গুণ করেছ' (পৃ. ১৮৬)। সমগ্র ঘটনা যাচাই করলে বৈষয়িকভাবে সমৃদ্ধ নজুমিয়ার কাছেই মেয়েকে সমর্পণের জন্য আমিনার মায়ের আগ্রহ প্রকাশিত হয় তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। তবু, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত আসগরের মনোভঙ্গিতে গুণ, জাদু, তুকতাক সংক্রান্ত লোকসংস্কারই অধিক প্রভাব ফেলে। এরূপ সংস্কার গ্রামীণ নারীসমাজে বহুল প্রচলিত। বাল্যকাল থেকেই অনাথ মালেককে প্রতিপালনকারী দাসী কুলসুম অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুরুর মা আমিনার তত্ত্বাবধানে আজিজকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে সে এরূপ ধারণা পোষণ করে, কুলসুম যেন মালেককে দেখাশোনা করার সুযোগ না পায়, সেজন্যই নুরুর মা তাকে নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে এই বিয়ের আয়োজন করেছে। মালেকের প্রতি কুলসুমের মমতা ও বাৎসল্য এতটাই প্রবল যে, সে তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। অথচ তার মতো একজন উঠতিবয়সী বিধবা নারীর পক্ষে যে আজীবন পরপুরুষের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ ধর্মীয়-সামাজিক বিধির পরিপন্থি, সে এই বিষয়টি মানতে অসম্মত। সেকারণেই নুরুর মায়ের প্রতি তার বিতৃষ্ণ মনোভঙ্গিতে রূপকথার খলনারীর (ডাইনি) আবহ উপস্থিত–

> এবার কুলসুম ফেটে পড়ল। তার মনের যত গোপন দুঃখ বেরিয়ে এল, জলভরা চোখে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব কথা আমার জানা আছে। বাচ্চাখেকো ডাইনি ও। মালেককে গুণ করেছে, তা না হলে যে

> মালেক একদণ্ড আমার কাছ ছাড়া থাকত না, সে-ই কিনা একবারটি আমার কাছে আসে না? আর আসতেও দেয় না ও! মালেক ঘরে এলেই আমাকে দূরে সরাবার জন্য যত ফাই-ফরমাস করবে তখুনি! যেন আমি আকাট বোকা, ওর চালাকি বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। নিশ্চয়ই ও মাগি ডাইনি, ওষুধ করেছে মালেককে। (পৃ. ১১৬)

১.৪ অভিশাপ দেয়া– লোকসমাজে বহুল প্রচলিত লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপন্যাসে অভিশাপ-সংক্রান্ত একাধিক দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে। সাধারণত, কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হলে বা বিপদ ঘটলে, এমনকি সে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বা সেরূপ আশঙ্কা থাকলে যে ব্যক্তির কারণে এমনটি ঘটে বা ঘটতে পারে, তার প্রতি অভিশাপ বা বদদোয়া উচ্চারিত হয়। এর পরিণতিতে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান না ঘটলেও সে একধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পায়, দুস্কৃতকারীর দণ্ডবিধানের প্রচেষ্টায়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিচে উল্লেখিত হলো—

ক. হঠাৎ চোখ মেলে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ফকির, এখনো তোমরা এখানে? সরে যাও, সবাই সরে যাও–এখান থেকে সরে যাও। হায় বেওকুফ নজু, দোস্তকে দুশমন বানালি আর এখন জীবনের শেষ পাড়ি দেওয়ার সময় আবার নতুন ঝগড়া ফ্যাসাদ! ঈশান কোণে ঝড়ের রেখা, নদীর জল দুলছে, তুফানে নৌকো মাতালের মতন টলছে, বাজপাখির মতন অন্ধকার মেঘের ছোঁ–সে বিপদের দিনে কে তোমাকে বাঁচাবে? যাও যাও, সব ঝুট, দু'দিনের দুনিয়া, দু'দিনের জিন্দেগি, আর তাই নিয়ে এত ঝগড়া ফ্যাসাদ। এত কাজিয়া। (পৃ. ৪৯)

খ. নজুমিয়া বলল ...কোথাকার এক ভণ্ড উজবগ এসে হাটে আড্ডা গেড়েছে, আর দেশসুদ্ধ লোক ফকির ফকির করে পাগল। (আয়েষা বলল)... আসল হোক আর মেকি হোক, ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন? ...ফকির মানুষ, তাদের বদদোয়ায় লোকসান ফলে। ..., খোদা জানে কার মধ্যে কি আছে, কিন্তু ফকির যখন তোমাকে নদীর ঝড়ের কথা বলেছে, তখন ফকিরকে খুশি না করা পর্যন্ত তোমার আর পদ্মা পাড়ি দিতে হবে না। এমনিতেই রাক্ষসী পদ্মা কত জনের সর্বনাশ করেছে, আর তাতে ফকিরের বদদোয়া। (পৃ. ৫২-৫৩)

গ. ধুলদির হাটে ফকিরের সঙ্গে নজুমিয়ার ঝগড়া হয়েছিল। ফকির বদদোয়া করেছিল। আজ হঠাৎ আয়েষার সেই শাপের কথা মনে পড়ে গেল। সারা মন দুঃখে বেদনায় ভরে উঠল। ...বুজরুকের সব স্তোত্রবাক্য মিথ্যা হয়ে গেল, কিন্তু তার বদদোয়া ফলে গেল। (পৃ. ৭৪)

উপন্যাসে অভিশাপ বা বদদোয়ার মাধ্যমে কারো অনিষ্টসাধন সংক্রান্ত লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় নজুমিয়ার মৃত্যুর ঘটনায়। বাল্যবন্ধু আসগরের সঙ্গে নজুমিয়ার সম্পর্ক শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় আমিনাকে বিয়ে করায়। এক্ষেত্রে নজুমিয়ার প্রতারণা ও শঠকৌশলই মূল ভূমিকা পালন করে। তাই বহু বছর পর বৃদ্ধাবস্থায় একদিন ধুলদির হাটে আসগর জনৈক ফকিরের সঙ্গে যোগসাজশ ঘটিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে তুকতাক করছে, এরূপ অহেতুক সন্দেহবশত নজুমিয়া জনসম্মুখে তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। এর পরিণতিতে ফকির বদদোয়ার ছলেই নজুমিয়ার জীবনের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অশুভ ইঙ্গিত দেয়। 'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সেই বৃত্তান্ত নির্দেশিত। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি এই ঘটনারই সম্প্রসারিত রূপ। আয়েষার কাছে এই ঘটনা গোপনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে কৌশলে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়। তার ধারণা,

ফকিরের সঙ্গে অহেতুক অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করায় তার অভিশাপ নজুমিয়ার ক্ষেত্রে ফলে যাবে। তাই নজুমিয়াকে ভরা বর্ষায় প্লাবিত পদ্মা নদী পাড়ি দেয়ার অনুমতি প্রদানে সে কোনোভাবেই সম্মত নয়। অবশেষে ফকিরকে সন্তুষ্ট করিয়ে তবেই নজুমিয়া এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবে বলে আয়েষা সিদ্ধান্ত নেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আষাঢ়ের দুরন্ত পদ্মায় কালবৈশাখীর দাপটে নজুমিয়া ও তার সঙ্গীদের নৌকাডুবির ঘটনায় শোকাহত জননী আয়েষার মনোলোকে ফকিরের অভিশাপ বা বদদোয়া সংক্রান্ত লোকসংস্কারের উপস্থিতি উল্লেখিত। নজুমিয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে ফকিরের বদদোয়ার পরিণতি হিসেবে আয়েষার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনায় লোকমানসে নিয়তি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রাবল্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

২. লোকাচার– উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৃষ্টি নামাতে বদনা বিয়ের আয়োজন, মিলাদের দাওয়াত প্রভৃতি। বদনা বিয়ের রীতি আদিম লোকাচারের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত। এই উপন্যাসেও এর প্রাসঙ্গিক বিবরণ লক্ষণীয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়েও বৃষ্টি না হওয়ায় রহিমপুরের কৃষকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। কেননা, পূর্ববর্তী দুই বছর অনাবৃষ্টির ফলে তাদের ভোগান্তির সীমা ছিল না। এবছরও অনুরূপ অবস্থা হলে না খেয়ে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না, এমন আশঙ্কাবশত গ্রামের মেয়েরা বদনাবিয়ের আয়োজন করে। যেমন–

> একদল মেয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। সবার আগে নুরু। তারা ক্রমে কাছে আসে। দুয়েকটা কথা বোঝা যায়। বৃষ্টির ছড়া গাইছে তারা। মেঘকে ডাকছে, দোহাই দিচ্ছে। কত রকমের মেয়েলি ছড়া। ... আসগর মিয়ার মুখ থমথমে মেঘের মতন অন্ধকার। চাপা গলায় বলে, মন্ত্র তন্ত্র বা ছড়া গানে যদি বর্ষা নামত তবে তিন-তিনটে বছর এমন ভাবে কাটে? ... মেয়ের দল মাথায় বদনা রেখে গান করছে। আসগর মিয়া নুরুর কাছে এসে তার বদনা নিয়ে মাটিতে আছাড় দিলে। ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়ের দল। বর্ষা নামানো বদনা ভেঙ্গেছে আসগর মিয়া। না জানি কী সর্বনাশ হয়! ... তাদের কান্না শুনে আসগর মিয়ার রাগ যেন আরো বেড়ে গেল, নে আরো গান গা। ... বাজান তুমি যে বদনা ভাঙ্গলে, এতে যে মন্দ হবে আমাদের! ... মিছেই ভয় পাচ্ছিস তুই। এসব গানটানের কোন দাম নেই। যদি থাকত, গত দুবছরে কেন বৃষ্টি নামে নি? কেন আকাল হল? (পৃ. ১২৪)

ধুলদির হাটের ফকিরকে সন্তুষ্ট করতে নজুমিয়া বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করে এবং তাকে ওয়াজ নসিয়তের আহ্বান জানায়। এই উপলক্ষে সে আয়েষার পরামর্শ অনুযায়ী গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু আসগরকেও তার বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত দেয়। গ্রামের চারশ-পাঁচশ লোকের জন্য কলাপাতা কেটে খাবারের থালার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়। 'মিলাদের মজলিসে ফকিরকে আদর করে বসানো হ'ল। টানা ফরাস, তার এক কোনায় ফকির সাহেবের জন্য তাকিয়া পাতা, দু'পাশে আতর দান, সামনে আগর বাতি আর ধূপলোবান' (পৃ. ৫৯)। কোরান

তেলাওয়াত শেষ হলে সে ওয়াজ শুরু করে। দরুদ পাঠের পর মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'দুপুর রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চলল, সমস্ত গ্রাম নজুমিয়ার তারিফ করতে লাগল। কারো জন্মকালের মধ্যে এত বড় জিয়াফত গ্রামে হয় নাই' (পৃ. ৬৩)।

৩. লোকসাহিত্য– উপন্যাসে বিধৃত রহিমপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ও রূপকথার অনুষঙ্গ উল্লেখিত।

৩.১ ছড়া– উপন্যাসের 'আসগর' খণ্ডের অন্তর্গত 'দুই' পরিচ্ছেদে গ্রাম্য বালকদের ছড়া আবৃত্তির ঘটনা রয়েছে। তারা নৌকা নিয়ে পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চরে বেড়াতে আগ্রহী হলেও মালেক তার বাবা নজুমিয়ার নিষেধ স্মরণ করে এই প্রস্তাবে সাড়া দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বন্ধু সাবু এই অভিযানে অংশ নিতে তাকে রাজি করাতে চাইলেও প্রতিবেশী এবং খেলার সঙ্গী নুরুর অনাগ্রহে সে শেষ পর্যন্ত এতে সম্মত হয়নি। তবে বালকদের অভিযান দেখতে সে নদীর তীরে হাজির হয়েছিল। সেখানে সমবেত বালকেরা পরস্পরকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পাশাপাশি জলে লাফালাফি এবং ছড়া আবৃত্তিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মালেকের আপত্তি থাকায় একপর্যায়ে সাবু তাকে রেখেই খেলায় যোগ দেয়।

> সাবু এমন ভাব দেখাল যেন সে নিজের মনে খেলা করছে– সাঁতরে এসে কোমর জলে দাঁড়াল, হাততালি দিয়ে বলে উঠল–
>
> এতটুকু পানি
> ঝপর পানি।
>
> সবাই এসে যোগ দিল তার সঙ্গে, হাত ধরাধরি করে সবাই গাইতে লাগল–
>
> এতটুকু পানি
> ঝপর পানি।
>
> একটি ছেলে ডুব দিয়ে সাবুর পা জড়িয়ে ধরল, সাবু চেঁচিয়ে উঠল,–
>
> এ গাঙে কুমির নাই
> ঝুপুর ঝাপুর নেয়ে যাই। (পৃ. ৮৭)

'আসগর' খণ্ডের অন্তর্গত 'আট' পরিচ্ছেদে বৃষ্টি নামানোর ছড়ার উল্লেখ রয়েছে। টানা তিন বছর আকালের পরিণতিতে গ্রামীণ জীবনে অভাব-অনটন ও সার্বিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এলে প্রাচীন লোকাচারের অংশ হিসেবে নুরু ও তার সঙ্গী বালিকারা বদনা বিয়ের আয়োজন করে। বৃষ্টিকে আবাহনের ছড়া আবৃত্তি করতে করতে তারা গ্রামের পথে হেঁটে যায়। নুরুর বাবা আসগর অনাবৃষ্টির কবলে ভুগে একপর্যায়ে এই লোকাচারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। তার দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে নুরু ও তার সঙ্গীদের ছড়া পরিবেশনের বৃত্তান্ত–

> একদল মেয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। সবার আগে নুরু। তারা ক্রমে কাছে আসে। দুয়েকটা কথা বোঝা যায়। বৃষ্টির ছড়া গাইছে তারা। মেঘকে ডাকছে, দোহাই দিচ্ছে। কত রকমের মেয়েলি ছড়া।

কচুর পাতা হলদি,
বৃষ্টি নাম জলদি।
কেউ বা বলে,
কচুর পাতায় করমচা
আয় বৃষ্টি নেমে যা'। (পৃ. ১২৪)

৩.২ প্রবাদ– প্রবাদ গ্রামীণ লোকসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদান এবং একইসঙ্গে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত। লোকসমাজে এর প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়মিত। এতে যেমন কোনো গোষ্ঠীর অতীত বৃত্তান্তের ছাপ থাকে, তেমনিভাবে প্রজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় মেলে। তাছাড়া পারস্পরিক আলাপে এর উপস্থিতিতে গতিময়তা ও বাগবৈদগ্ধ্য ক্ষেত্রবিশেষে সঞ্চারিত হয়। যেহেতু সমষ্টিমানুষের আচরণ, কর্মকাণ্ড, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ছাপ এতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাই উপযুক্ত পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগও লোকমানসে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়ে থাকে। উপন্যাসে এর কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। উপন্যাসের 'নজুমিয়া' খণ্ডভুক্ত 'এক' পরিচ্ছেদে কুমির শিকার করতে গিয়ে লোকজনকে সতর্ক রাখতে নজুমিয়ার হুশিয়ারি 'সাবধানের মার নেই' উচ্চারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'এ খণ্ডের 'দুই' পরিচ্ছেদে বিধৃত 'ধুলদির হাট'-এর বৃত্তান্ত উপস্থাপনে লেখকের বিবরণেও 'দশ মুখে তিলকে তাল করতে কতক্ষণ' প্রবাদটি বাঙ্ময় রূপ পায়। বিশেষত, রহিমপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বাসিন্দাদের হাটবারে হাটে আগমন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপের অবতারণা সম্পর্কে প্রবাদের প্রয়োগ যথার্থ বিবেচিত হয়। কেননা, লোকমুখে প্রচারিত নানা প্রসঙ্গের ভিত্তি বা উৎস সম্পর্কে জানা না গেলেও যা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়, সেটির আবেদন স্বীকার্য। 'তিন' পরিচ্ছেদে বাকপটু ইদ্রিসকে সংযত করতে নজুমিয়ার প্রবাদ (নিজের চরকায় তেল দেয়া) স্মরণ করানো, 'চার' পরিচ্ছেদে জনৈক ফকিরের কেরামতির প্রতি রমজানের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি পোষণ সম্পর্কে নজুমিয়ার সন্দেহ উত্থাপনে (ঝড়ে বক ওড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে) প্রবাদের প্রয়োগ সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হয়। তবে 'পাঁচ' পরিচ্ছেদে আয়েষার সংলাপে একাধিক প্রবাদের পাশাপাশি বাগধারার সমাবেশ (চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, পাকা ধানে মই দেয়া/ বুদ্ধির ঢেঁকি) লেখকের এতদ্বিষয়ক সচেতনতার দৃষ্টান্ত। ধুলদির হাটে ফকিরের সঙ্গে নজুমিয়ার বিবাদের বৃত্তান্ত এড়াতে রমজান সচেষ্ট হলেও ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাকপটু বৃদ্ধা আয়েষার কাছে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এই ঘটনা। প্রবাদ ও বাগধারার সন্নিবেশ ঘটিয়ে আয়েষা রমজানকে যেভাবে তিরস্কার করে, তাতে বোঝা যায়, লোকসমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এসব প্রবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভাত হয়। আরো কিছু দৃষ্টান্ত–

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন নজুমিয়ার মৃত্যুসংবাদে ধুলদিতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। (পৃ. ৭৩)

নিজের চরকায় গিয়ে তেল দে। (পৃ.৮১)

পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ,–তাতে তুই-ই ঠকবি। (পৃ. ৮৩)

ওই দেখ, বলে ঘরে কে, না আমি কলা খাইনি! (পৃ. ৯৩)

সাবধানের মার নেই, তাই সাবধানে চলাই ভালো। (পৃ. ১০২)

কথায়ই আছে, নিজে সাত পাঁচ না ভেবে কিছু করা উচিত নয়। (পৃ. ১০৯)

শাখেঁর করাত যেতেও কাটে আসতেও কাটে। (পৃ. ১১০)

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। (পৃ. ১২৩)

কথায় আছে একে মনসা, তাতে ধোঁয়ার গন্ধ। (পৃ. ২৪৫)

লোকের বাজে কথায় কান দিতে নাই । (পৃ. ১৪৫)

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। (পৃ. ১৫৬)

দশজনের মধ্যে থাকতে হলে দশজনের কথা শুনতে হয়। (পৃ. ১৫৯)

কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? (পৃ. ১৬২)

নদী ও নারী উপন্যাসে লেখক এমন কিছু বাক্যকে রূপ দিয়েছেন, যা অর্থগত পূর্ণতা এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ-সমাজ-মানবজীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ধারণের গুণে উপন্যাসে বিবৃত ঘটনারাশি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে প্রবাদপ্রতিম মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে–

মানুষ যত পায়, তত চায় আর তাতেই অশান্তি। (পৃ. ৪৬)

রাগ হিংসা আর ভয়– যতদিন এ তিনটি সাপকে না মারবে, ততদিনই অশান্তি। (পৃ. ৪৬)

কাফনের সঙ্গে সঙ্গে দুশমনী দোস্তি সব দাফন হয়ে যায়। (পৃ. ১১০)

পুরোনো পাতা যতক্ষণ না ঝরে, ততক্ষণ নতুন পাতা দেখা দেয় না। (পৃ. ১৯১)

৩.৩ রূপকথার অনুষঙ্গ– গ্রামীণ লোকসমাজে যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথার অনুষঙ্গ এই উপন্যাসে রয়েছে। লক্ষণীয়, বয়স্কদের দ্বারা বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের জন্যই শুধু নয়, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে ও যথোপযুক্ত ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনে এসবের উল্লেখ লোকভাষায় বিদ্যমান। এমনকি, উপন্যাসের ঘটনা, পরিস্থিতি এবং কোনো বিশেষ অনুষঙ্গের সমান্তরালে এসবের উপস্থিতি বারবার স্থান পায় লৌকিক ভাবপরিমণ্ডল নির্মাণের তাগিদে। নিচে প্রাসঙ্গিক কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হলো–

আয়েষা বলল যে সাত রাজার ধন কোন্ মানিক তুমি বঁড়শিতে গেঁথেছ, আমি জানব কেমন করে? (পৃ. ২৪)

গোল বাঁধত রোজ সন্ধ্যাবেলা। দাদী ছাড়া অন্য কারো হাতে সে [মালেক] কখনো খায় নি। দাদী ছাড়া আর কেউ তাকে ঘুম পাড়াতে পারত না। কথা গল্প কেচ্ছা ছড়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী–রাক্ষস-খোক্কসের গল্প তাকে কে বলবে? (পৃ. ৭৮)

[মালেক] কেচ্ছায় শুনেছে যে কুচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। নুরুর মাকে দেখে মালেক ভাবল যে রূপকথার পরি বুঝি এমনি সুন্দর হয়। (পৃ. ১১২)

নতুন ধানের শীষগুলো যেন সবুজ পরি, তাদের অঙ্গে এ কী জাদু! (পৃ. ১১৩)

মায়ের কোলে বসে নুরু একমনে রূপকথার গল্প শোনে। এক-আধটা প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে,– মা হেসে তাকে নিরস্ত্র করে। (পৃ. ১১৫)

> তাদের আনন্দ যেন জীয়ন কাঠি, যাকে ছোঁয়, তারই মন আনন্দে ভরে উঠে। (পৃ. ১৭৭)
>
> তোর মায়ের বয়স তখন পনেরো ষোল হবে– দেখতে ছিল যেন বেহেস্তের হুরী। ... এ রকম রূপবতী তো আমার চোখে কোনদিন পড়ে নি– সে যেন রূপকথার রাজকন্যা, চাঁদের দেশ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে। (পৃ. ১৮৫)

৪. লোকচিকিৎসা– রহিমপুর, ধুলদির হাটের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হয় এ তল্লাটের একমাত্র হাকিম এবং ভিনদেশী জনৈক ফকিরের নিকট। হাকিম সম্পর্কে নানা গালগল্প লোকসমাজে প্রচলিত। তার পারিবারিক বৃত্তান্ত ও হেকিমি শিক্ষা সম্পর্কে সন্দিহান হলেও গ্রামবাসী আরোগ্য লাভের জন্য নির্দ্বিধায় হেকিমের কাছেই ছুটে আসত। 'হাকিম সাহেবও কখনো দিত পানিপড়া, কখনো কাউকে দিত দুটো হজমিগুলি, কখনো বা বিড় বিড় করে কী সব আউড়ে ফুঁ দিয়ে দিত, বলত, যাও ভাল হয়ে যাবে। বলত সুরা ইয়াসিন পড়ে তিনবার ফুঁকে দিলাম, এবার আর ভয় নাই' (পৃ. ৩১)। প্রয়োজনীয় কবিরাজি বড়ি বানাতে তার প্রয়োজন হত কুমিরের কলিজা ও গুর্দা। ধূলিমাখা জোব্বা, ঢোলা পিরহান ও আঁটসাঁট পোশাকে সজ্জিত, উর্দু-আরবি-ফারসি মিশিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত পালোয়ানের মতো উন্নত দেহের অধিকারী হাকিমের প্রতি গ্রামবাসীর আস্থা ছিল অবিচল। তবে তার এই অবস্থান একপর্যায়ে করায়ত্ত হয় ধুলদির হাটে আগত জনৈক ফকিরের। গ্রামীণ লোকসমাজে জ্বিন-ভূতে ধরা, অশরীরীর উপদ্রব সংক্রান্ত ঘটনাদি হরহামেশাই প্রচারিত হয়। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ-সংক্রান্ত নানা গল্প-গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসব প্রাচীন সংস্কার যুগ যুগ ধরে নিরক্ষর লোকমানসে প্রভাব বিস্তার করে। এর সুযোগ নেয় হাতুড়ে চিকিৎসক, পীর-ফকির, ওঝা-কবিরাজেরা। যেহেতু কোরআনে জ্বিনের এবং সনাতন ধর্মশাস্ত্রসমূহে ভূত, প্রেতাত্মা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে, তাই এসব ব্যাপারে অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভীতিবোধ প্রবল। বিজ্ঞানভাবনার অভাব এবং যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা পরিস্থিতি বিবেচনার অসামর্থ্য লোকমানুষকে বাধ্য করে তাদের দ্বারস্থ হতে। ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে মিলাদের জন্য উপস্থিত হলে উক্ত গ্রামের বাসিন্দা ইব্রাহিম জানায়, তার পনের বছরের তরুণী মেয়েকে কী যেন ভর করেছে। ফলে তার স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্তপ্রায়। এর সংক্রমণ বাড়লে মেয়েটি 'ভীষণ চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, হাত পা ছুঁড়তে থাকে। শেষে যখন চিৎকার বন্ধ হয়, তখন মুখ ফেনায় ভরে যায়, দাঁতে দাঁত লেগে যায়, সমস্ত শরীর শক্ত হ'য়ে যায়। কখনো কখনো সারা দিনরাত অজ্ঞান হয়ে থাকে' (পৃ. ৬১)। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের অভাবে সে দিন দিন রোগা হতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী মেয়েটি স্পষ্টতই মৃগীরোগে আক্রান্ত। পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বানুযায়ী সে যে মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পারিপার্শ্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের অভিঘাতে, তা বলাই বাহুল্য। জ্বিন সংক্রান্ত আর্কিটাইপ তার চেতনালোকে যেভাবে ভ্রান্ত শ্রবণ-দর্শনের সন্নিবেশ ঘটায়, তা সিজোফ্রেনিয়ার অন্যতম লক্ষণ। অথচ এ-ব্যাপারে ফকির ঘোষণা করে, মেয়েটিকে জ্বিনে ধরেছে। উপন্যাসে তার সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে–

> একদিন সন্ধেবেলা নদী থেকে কলস ভরে ফিরছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারে বাঁশবনে দেখলাম কালো উলঙ্গ মূর্তি। চোখগুলো ভাটার মত জ্বলছে, যেন আমাকে আগুনে ঝলসে দেবে। কেমন করে যে বাড়ি পৌছোলাম, মনে নাই। কিন্তু মার কাছে শুনেছি যে উঠোনে পা দিয়েই চিৎকার করে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি। সেই থেকে অন্ধকার হলেই সে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। ...ওর লজ্জা সরম নাই– তোমরা এত লোক এখানে, তবু উলঙ্গ হয়ে নাচছে, এখুনি আমাকে গ্রাস করবে। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। (পৃ. ৬২)

মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ফকির তার নাড়ি টিপে চোখের পাতা উল্টে দেখে। এরপর সে তার স্বজনদের বলে এক গামলা পানি এবং হলুদ আনতে। পানি ছিটিয়ে আগুনে পোড়ানো হলুদ নাকের কাছে ধরতেই মেয়েটি সেখান থেকে সরে যেতে চায়। তখন ফকির জোরপূর্বক তাকে ধরে রেখে ছোট একটি দড়ি দিয়ে প্রহার করলে মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিৎকার করে এবং নির্যাতন থেকে মুক্তি চায়। ফকির উৎসুক জনতাকে জানায় যে এখন মেয়েটির ওপর ভর করা জ্বিন তার মুখ দিয়ে কথা বলছে। তাই জ্বিন ছাড়াতে সে আরেকজনকে আদেশ দেয় পুনরায় একইভাবে মেয়েটিকে প্রহারের জন্য। সে এরপর গামলাভরা পানিতে বিশেষ মন্ত্র সাতবার পড়ে মেয়েটির মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে দেয়। পরিশেষে সে মেয়েটির মাথায় হাত রেখে চিৎকার করে জ্বিনকে আদেশ দেয় তাকে চিরজীবনের মতো ছাড়বার প্রমাণ হিসেবে 'কলসভরা জল দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে সাত পা' (পৃ. ৬৩) এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মেয়েটি অস্বাভাবিক নাকীসুরে এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে তা পালন করামাত্রই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে কলসির পানিতে ভিজে সয়লাব হয়ে যায়। এরপর ফকির ইব্রাহিমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানায়, মেয়েকে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে দিয়ে দিতে। এই ঘটনায় গ্রামে ফকিরের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।

৫. লোকশিল্প– গ্রামীণ নারীসমাজে প্রচলিত সূচিশিল্পের উল্লেখ উপন্যাসে লক্ষণীয়। নুরু কখনো কখনো গৃহকর্মের অবসরে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পুরোনো শাড়িতে নানা রঙের সুতো দিয়ে নকশার বিচিত্র কারুকাজে কাঁথা বোনে।[৫] প্রতিদিনের ঘটে চলা নানা ঘটনা, বাল্যজীবনের অজস্র স্মৃতির সঙ্গে মনের ভেতর লালিত কল্পনাকে মিশিয়ে সে নানা দৃশ্য ও ছবিকে রঙিন সুতার অবয়বে ফুটিয়ে তোলে। কখনো কখনো এর সঙ্গে যুক্ত হয় মালেককে ঘিরে তার প্রেমানুভব ও রোমান্টিক ভাবনা–

> একলা ঘরে বসে গুন গুন করে কী গান গাইছে নুরু? কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যায় না। হয়তো সে নিজেই জানে না কোথায় কবে কার মুখে শুনেছিল, কিন্তু তার রেশ আজও তার মনে রয়ে গেছে। গুন গুন করে গাইতে গাইতে পুরানো শাড়ি জড় করে কাঁথা সেলাই করছে নুরু। সে কাঁথায় নকশা কত, ছবি কত। লাল কালো সুতোর তাগা, তাই দিয়ে কাঁথার জমিনে সে নানা ছবি তুলছে। তার ছেলেবেলার এক-একটা ঘটনা মনে পড়ে, আর কাঁথায় তার ছবি তুলতে চেষ্টা করে। মালেক, আসগর মিয়া আর তার মা–এই তিনজনাকে নিয়েই তার জীবন গড়ে উঠেছে, তাই যে ছবি সে আঁকতে চায়, তাতেই মালেকের কথা এসে পড়ে। অথচ মালেকের ছবি তুলতে তার হঠাৎ লজ্জা লাগে। কেউ কাছে না থাকলেও কাঁথা লুকিয়ে ফেলে। ... কাঁথাটি কী জন্য, কবে তার ব্যবহার হবে মনে পড়ে হঠাৎ সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে। এ যে তার বিয়ের কাঁথা–ফুলশয্যার রাতে নতুন বর বধূর বিছানায় ফুলকাটা রঙিন নকসি-কাঁথা বিছিয়ে দেয়,

আর সেই কাঁথা বধূকে নিজের হাতে সেলাই করতে হয়। তাই বিয়ের বয়সী সব মেয়েরাই বিয়ের কথা না ভেবে পারে না। (পৃ. ১৩৫- ১৩৬)

বালকবালিকারা স্বভাবতই বিভিন্ন খেলনার প্রতি আগ্রহী। বালক মালেককে বসির কাঁচা বাঁশের ধনুক এবং পাটখড়ির তীর বানিয়ে দেয়। এসব খেলনা দিয়ে সে যখন শিকারের চেষ্টা চালায়, তার সমবয়সীরা ঈর্ষান্বিত হয়। এই খেলার সূত্রেই তার সঙ্গে সাবু ও নুরুর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তরুণ মালেক নিজেই ছোট ছুরি দিয়ে বাঁশ, কাঠ, রঙিন ঘাসের খেলনা বানিয়ে তার প্রেমিকা নুরুকে উপহার দেয়। নুরু চায় না, সে ছাড়া অন্য কেউ মালেকের বানানো খেলনা উপহার পাক। যেদিন মালেক নুরুর জন্য খেলনা না নিয়েই বাড়ি ফেরে, সেদিন সে সরল বালিকাসুলভ অভিমান করে। এরপর সেগুলো মালেকের হাতে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে কেড়ে নেয়। মালেক কখনো কখনো নতুন ধানের ছড়া দিয়ে সাতনরী হার বানিয়েও নুরুকে উপহার দেয়।

৬. লোকজ্ঞান– জীবিকার তাগিদে, নিত্যদিনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতায় সময়ের পরম্পরায় সঞ্চিত লোকজ্ঞান বংশপরম্পরায় অনুসৃত হয়। কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক গড়ন, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষিকর্ম ও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গসংশ্লিষ্ট এই অভিজ্ঞতা তাদের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই উপন্যাসেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে–

ক. ঘা-খাওয়া কুমির আর ঘা-খাওয়া বাঘ, তাকে নিয়ে তামাশা করা চলে না। (পৃ. ২৬)

খ. ডাঙ্গায় জটলা, নৌকোর মধ্যেও সকলের সলাপরামর্শ। যদি কোনোক্রমে একেবারে কুমির ছুটে যায়, তবে সর্বনাশ হবে, কারণ জখমি কুমির মানুষ-খেকো হতে বাধ্য। মানুষের মতন সহজ শিকার তো আর দ্বিতীয় নাই! ... একে কুমির, তাতে জখমি, এ সময় পানিতে নামলে আর রক্ষা আছে? (পৃ. ২৬)

গ. আসগর এবং তার দলের লোক পশ্চিমের চর দখল করেছিল। নজুমিয়াকে খবর পাঠাল যে একখানি বড় চর পেলেই তারা খুশি। নজুমিয়া পূবের চর দখল করল, একবার ভাবল যে পশ্চিমের চরে দাবি জানায়, কিন্তু তার মাঝি বসির বলল, পঞ্চায়েত, আমি বুড়ো মানুষ, প্রায় চার কুড়ি বয়স হতে চলল, রাক্ষুসি পদ্মার অনেক খেলা দেখেছি। পশ্চিমের চর টেকে না, বছর দু'বছরে নদীর ধারে কেটে যায়, আর পূবের চর বিশ বছরেও ভাঙ্গে না। (পৃ. ৫৫)

ঘ. জানো তো সর্দার লোকে কী বলে? বৈশাখের পদ্মা রাক্ষসী! তাকে লোভ দেখিয়ে লাভ কী? ... নজুমিয়া ধমক দিয়ে উঠল, মেয়ে মানুষের মতো কথা বলো কেন? বৈশাখ মাসে পদ্মা রাক্ষসী, আষাঢ় মাসে পদ্মা দুরন্ত ভাদ্রের পদ্মা বিশ্বাসঘাতক, এসব কেচ্ছা শুনলে কাজ চলে না। ... আকাশ এখন পরিষ্কার, বেলাও বেশি হয়নি। যদি ঝড় ওঠেও, তবু বৈশাখী ঝড় বিকালের দিকেই আসে। ... নজুমিয়া বলল, ঝড় তুফানের কথা কী বলছ আম্মা? আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বাতাসও একেবারে বন্ধ, ঝড় তুফানের তো আজ নামগন্ধও নেই। ... আয়েষা বলল, এসব চালাকি রাখো। বোশেখ মাসের পদ্মাকে বিশ্বাস নেই। সকালে চারদিক পরিষ্কার, কিন্তু দুপুর না হতে হতে তুফানে চারদিক তোলপাড় করে তোলে। ... পদ্মার মেজাজ আমিও জানি–ওর ছলাকলার অন্ত নাই। আজ মনে হচ্ছে যে রাক্ষুসী শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে, তাই সে এত চুপ। (পৃ. ৬৫-৬৬)

ঙ. নদীর রকম সকম আজ আমার ভাল লাগছে না–বড্ড বেশী শান্ত আর স্তব্ধ। ... হঠাৎ দমকা বাতাসে নৌকো ট'লে উঠল। ... বসিরের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, খোদা করেন বাতাস যেন না

বাড়ে। বোশেখ মাসে একবার হাওয়া উঠলে কখন যে তুফান শুরু হয়ে যায়, তার ঠিকানা পাওয়া মুস্কিল। এ মাঝ দরিয়ায় তুফান উঠলে নৌকা সামলানো কঠিন হবে।' (পৃ. ৬৭- ৬৮)

চ. যে জেলের দল মালেককে ফিরিয়ে এনেছিল, তাদের সর্দার বলল, তোমরা ডাঙ্গার মানুষ, জলের খবর রাখ না, তা নইলে এ ভুল তোমার হত না মিয়া। আমরা মাছ ধরি হয় সাঁঝ বেলায়, না হয় ভোর রাতে। একবার রোদ তেতে উঠলে মাছ সব গভীর জলে ডুব দেয়, সাঁঝের আগে আর জাগে না। তাই আমরা অন্ধকার থাকতে খেপ ফেলি, সূর্যের তেজ বাড়লে বাড়ি রওয়ানা দিই। (পৃ. ১৬১)

'ক' ও 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কুমির শিকারের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত প্রসঙ্গাদির উল্লেখ থেকে অনুধাবন করা যায়, পদ্মাতীরবর্তী বাসিন্দারা নদীপথে যাত্রাকালে বা মাছ ধরতে গিয়ে ইতঃপূর্বে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সেই বৃত্তান্ত অন্যদের জানিয়েছে। 'গ', 'ঘ', 'ঙ', সংখ্যক উদ্ধৃতিসমূহে পদ্মা তীরবর্তী মানুষের স্থানিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঋতু পরিবর্তনের সমান্তরালে এ নদীর খেয়ালী রূপ অনুধাবনের সামর্থ্য। ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পদ্মার ভাঙা-গড়ার খেলা এতদঞ্চলের লোকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত সৃষ্টি করে। সে-কারণেই তারা এর খামখেয়ালি মেজাজ সম্পর্কে বরাবর সচেতন থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে পদ্মা পাড়ি দিতে গিয়ে তারা যেভাবে লড়াই চালিয়ে যায়, তা থেকে অনুধাবন করা যায়, এসব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা কতটা নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। 'চ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তাদের মাছ ধরার অভিজ্ঞতা সন্নিহিত।

৭. লোকপ্রযুক্তি– লোকসমাজের বাসিন্দারা প্রযুক্তিগত বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ হলেও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে নানা কৌশল অবলম্বনের সচেতন আগ্রহ তাদের আচরণে লক্ষণীয়। নিত্যদিনের প্রয়োজন মোকাবেলায় এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা রয়েছে–

রমজান বলল, – বঁড়শি কাটা অত সহজ নয়, সর্দার। গুণের সুতো তিনবার পাকিয়ে তাতে লোহার তার জড়িয়ে দিয়েছি, আর যেখানে বঁড়শির মাথা, সেখানে তারও চৌগুনো। যদি কাটতে চেষ্টা করে শালার (কুমিরের) দাঁতই ভেঙ্গে যাবে। (পৃ. ২৫-২৬)

৮. লোকখাদ্য– এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রাত্যহিক আহারের অংশ হিসেবেই শুধু নয়, বরং বিভিন্ন উৎসবে-আয়োজনেও এসব খাবারের প্রতি লোকমানুষের আগ্রহ লক্ষণীয়–

ক. আমাকে (সাবুকে) কত ভালবাসত তোর বাবা! কত আদর করত। কতবার মিছরি খেতে দিয়েছে, নতুন গুড়ের পাটালি দিয়েছে, একবার হাট থেকে কদমা এনেছিল তাও দিয়েছে। (পৃ. ৮৪)

খ. আসগর মিয়া রাতের খাবার অন্দর বাড়িতেই খায়। কিন্তু নিজে খেতে বসবার আগে কিষাণ মজুরদের খাবার তদারক করে, দেখে তারা ঠিকমত পেয়েছে কিনা। থালা ভরা মোটাচালের ভাত, গামলা ভরা ডাল, কুমড়ো বেগুনের তরকারি। ... কিষাণদের খাওয়া শেষ হ'লে আসগর মিয়া খেতে বসে। তার দুপাশে বসে মালেক আর নুরু। গরম গরম ভাত, বাঁটা লঙ্কা মাখানো বেগুন ভাজা। ঝালে চোখে জল বেরিয়ে আসে। মালেকের কিন্তু ঝাল না হ'লে খাওয়াও হয় না। কাঁচা

পেয়াজ, রসুন ভাজা থাকলে তো কথাই নেই। মালেক আহ্লাদে আটখানা। শেষকালে একবাটি ক'রে দুধ, দু-চারটে পিঠে আর খেজুর গুড়। (পৃ. ১১৪)

গ. মালেক ফিরেছে বলে আসগর মিয়া সারা গাঁয়ের লোকের জন্য জিয়াফতের ব্যবস্থা করল। মালেককে যারা নিয়ে এসেছিল, সেই মাঝিদের অনেক করে বলে কয়ে একদিন থেকে যেতে রাজি করল। ... খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা যা হল সে এক এলাহি কাণ্ড। পুরুষ্ট দেখে একটা বাছুর জবাই করে কালিয়া আর কাবাবের আয়োজন হল, সমুদ্রের রকম বেরকমের মাছ ভেজে তাতে শুকনো লঙ্কা কাঁচা মরিচের বাটনা বেটে নানা রকমের ঝালঝোল অম্বল তৈরি হল। নুরু যত্ন করে মালেকের জন্য নিজের হাতে নানা রকমের সালুন রাঁধল, মুরগির কোরমা, কই মাছের ব্যঞ্জন, ঘন দুধের ক্ষীর। ... মেহমানরা সবাই বসে গেলে আজিজ একটা বড় বাসন ভরে নুন নিয়ে এল–সকলের পাতে নুন পড়বার পর বড় বড় গামলা ভরা গরম ভাত এল। মোটা লাল চালের ভাত, কিন্তু খেতের ধানের চাল, তাতে তখনো ভাপ উঠছে। সে ভাতের গন্ধ আর স্বাদের তুলনা কোথায়? বাটি বাটি সালুন এল, গোস্ত দিয়ে রাঁধা ডাল, তারপরে মাছ ভাজা, রাঁধা মাছ, কত রকমের তরিতরকারি, শাকসবজি। সবার শেষে সেমাই, ঘনদুধ আর নতুন গুড়। গাঁয়ের লোক পেট ভরে খেল–আসগর মিয়া আয়োজনের ত্রুটি করে নি। এ রকম জিয়াফত সে তল্লাটে কখনো হয় নি। (পৃ. ১৫৮)

লোকসমাজে হুকায় ধূমপানের বিশেষ কদর রয়েছে। তামাক সেবনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি। এই উপন্যাসে 'নজুমিয়া' অংশের 'দুই' পরিচ্ছেদে ধুলদির হাটের হাকিম নজুমিয়াকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে তার দোকানঘরে হুক্কা খাওয়ার অনুরোধ জানায়। সে অন্যসময় কৃষক নজুমিয়াকে পাত্তা না দিলেও স্বার্থোদ্ধারের তাগিদে যেচে তাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়ার অনুরোধ করে। কারণ তার কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কুমিরের কলিজা এবং গুর্দা প্রয়োজন। নজুমিয়ার ছেলে মালেক একটি কুমির শিকার করেছিল। সে তাই নজুমিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে পিতলের ডিবেতে পান, সুপারি ও জর্দার বন্দোবস্ত করে। যেহেতু নজুমিয়া রহিমপুরের 'পঞ্চায়েত' বা গ্রামপ্রধানদের অন্যতম, তাই তাকে 'আপনি' সম্বোধনসহ ফরাসে বসিয়ে সমাদর করা হয়। সে-কারণেই সরকারি ডাবা হুঁকার পরিবর্তে তার জন্য বিশেষ গড়গড়ার ব্যবস্থা থাকে। নজুমিয়া সঙ্গীদের নিয়ে পদ্মা নদীতে যাত্রাকালে তার জন্য নৌকায় হুঁকার বন্দোবস্ত থাকে। রমজান, বসির ও ইদ্রিস একটানা দাঁড় বেয়ে ক্লান্ত হলে খানিকটা সময় জিরিয়ে হুঁকা টেনে পুনরায় বৈঠা বাইতে থাকে। বন্যায় রহিমপুর প্লাবিত হলে গ্রামবাসীকে নিয়ে আসগর বিয়ানচরে নতুন বসতের বন্দোবস্ত করে। সেখানে ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও তার বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। সে নিজেই তাদের তদারকির ব্যাপারে খেয়াল রাখে। 'সবাই খুশি মনে খায়। খেয়ে দেয়ে দাওয়ায় সবাই জটলা করে বসে। হুঁকো চলে এক হাত থেকে ও হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে সহজ জীবনের সুখ দুঃখের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা' (পৃ. ১১৪)।

৯. লোকভাষা– এই উপন্যাসে রহিমপুর ও বিয়ানচরের লোকসমাজে ব্যবহৃত যে ভাষা রূপায়িত হয়েছে, এতে আঞ্চলিক বাচনভঙ্গির প্রয়োগ, বিশেষত, পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের স্থানিক

উপভাষার ব্যবহার অনুপস্থিত। লেখক যেসব চরিত্রকে কুশীলব হিসেবে নির্মাণ করেছেন, তাদের মুখের সংলাপ শিষ্ট চলিত প্রমিত কথ্যরীতির অনুসারী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে অনুসৃত লোকভাষাকে বিবেচনায় রাখলে বলা যায়, স্থানীয় লোকসমাজের নিত্যদিনের চর্চিত ভাষাকে লেখক এই উপন্যাসে ব্যবহার করেননি। এর ফলে প্রায়শই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সংলাপ পাঠকের কাছে কৃত্রিম বিবেচিত হয়। অশিক্ষিত জনসমাজের প্রাত্যহিক কথোপকথনে এতদঞ্চলের মানুষের ভাষিক পরিমণ্ডলের বিশিষ্ট রূপটি আত্মস্থীকরণে লেখক সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। যদিও প্রবাদ ও বাগধারার ব্যবহার চরিত্রসমূহের মনোভঙ্গিকে অনেকটাই স্পষ্ট করে তোলে, তবু লোকভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ না ঘটায় উপন্যাসের প্রতিপাদ্য জীবনভাবনার সঙ্গে লোকসমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিপুণভাবে গ্রথিত হয়নি। ফলে উপন্যাসের কার্যকারণগত দিকটির বিশ্বাসযোগ্যতা পাঠককে কিছুটা সংশয়গ্রস্ত করে তোলে। এর কারণ সম্ভবত, বাল্যকাল থেকেই পিতার বদলির চাকরির কারণে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বসবাস ও পড়ালেখা করতে হয়েছে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিণতিতে সেখানকার পারিপার্শ্বিক জনজীবন ও স্থানিক পরিমণ্ডল সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তাঁর ছিল না।[৬] সমগ্র উপন্যাসে কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও এতদঞ্চলের ভাষিক বিশিষ্টতা তাতে কোনোভাবেই প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাসে লোকভাষাশ্রিত উপাদান হিসেবে প্রযুক্ত বিবিধ শব্দ ও বাগধারা নিচের তালিকা দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

৯.১ শব্দভাণ্ডার– উপন্যাসে লেখক সচেতনভাবেই বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত শব্দরাশি ব্যবহার করেছেন–

দেশজ শব্দ– ডাঙ্গা, পাড়, ভিটে, বনবাদাড়, জলা, ফাল, কানাঘুষো, শণ, খাটুনি, মুঠি, খন্দ, বাইনকুয়ো, স্যাঙাত, খেদ, খড়কুটো, উঠোন, রোসো, খিড়কি, বকর বকর, খুঁটো, জটলা, টানাহেঁচড়া, ঘের, গলুই, পাটাতন, লগি, ভীমরতি, বাগে, হিজল, ডিঙি, গাব, মাঝি, মাল্লা, গলুই, দাঁড়, মাচা, ঘাপটি, শালা, তল্লাট, হাট, চাষি, বেসাত, প্যাটরা, বিড়ি, ঠেস, আউড়ে, ছিলুম, উজবুক, কেশে প্রভৃতি।

ক্রিয়া– চাপড়ে, নিড়োয়, ঢাকাঢাকি, ঠেকেছে, লেপে, হাঁপাচ্ছিস, পিটিয়ে, ছিটকে, চালাচালি, নাইবার, তাগড়া, বকাঝকা, টিপলে, বেরোয়, ঝাঁপিয়ে, চরাবার, লুটছে, ভড়কে, লেপে, ধোওয়াপোছা, টানাহেচড়া, চাপড়িয়ে, উপুড়, খেঁকিয়ে, ঠেলাঠেলি, ফুসফাস, চোখাচুখি, গড়াগড়ি, ছুঁড়তে, লুটোপুটি প্রভৃতি।

বিশেষণ– ঝলসে, নুয়ে, উড়ু-উড়ু, উজালা, ঢিমে, সিধে, কড়া, হেলে, ছেড়া, লেপা, ফুলিয়ে, সোমত্ত, কালা, ঠাটা, তেতে, লুটোপুটি, চুরমার, ফাঁপড়া, জারিজুরি, তেলকুটে, গ্যাট, ধুঁকতে, জংলী, গোঁয়ার, কেউকেটা, মাখামাখি, খুড়খুড়ে, মুরোদ, মিছামিছি, তোয়াজ, চাষাড়ে, হেলে প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দ– তর্কাতর্কি> তক্কাতক্কি, মেয়ে>ছুঁড়ি, মূর্খ>মুখ্যু, গুর্দা>গুরদো, স্পর্ধা>আস্পর্দা, কবিরাজ>কোবরেজ, তালাশ>তল্লাস, বেচেইন>বৈচেন, পিছুটান>পেছুটান, প্রভৃতি।

৯.২ বাগধারা– বাগধারার ব্যবহার উপন্যাসে অবলম্বিত লোকভাষার বিশিষ্টতার পরিচায়ক। লোকমানুষের প্রাত্যহিক ওঠাবসা, চালচলন, কাজকর্ম সম্পাদন ও ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজন মেটাতে তাদের উচ্চারিত ভাষায় এর জোরালো উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাগধারা শব্দরাজির নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতক গণ্ডির মধ্যে সঞ্চার ঘটায় ব্যঞ্জনাময়, সম্প্রসারিত অর্থকে। পরোক্ষভাবে, এমনকি এর মাধ্যমে বিশেষ ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রচলিত বক্তব্যের সমান্তরালে নতুন বার্তার সংযোজন ঘটানোও সম্ভব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরিহাস ও তিরস্কারের পাশাপাশি প্রশংসা, স্তুতিও বাগধারার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়ে অভীষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট, জোরালো করে তোলে। শব্দের নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতকতার বাইরে গিয়ে সম্প্রসারিত অর্থ আরোপে এর উপযোগিতা সন্দেহাতীত। নিচে উপন্যাসে প্রযুক্ত প্রাসঙ্গিক বাগধারাসমূহ উল্লেখিত হলো–

রেগে মেগে আয়েষা আরো জোরে চরকা চালায়, দাসীবাঁদিদের উপর ঝাল ঝাড়ে। (পৃ. ২২)

ঘাটের লোকে বলে, হাকিমের দাওয়াইয়ের কেরামতি আছে, তা নইলে এ তালপাতার সেপাই কবে ঝড়ে উড়ে যেত। (পৃ. ৩৩)

যেই বেপারীরা বলল যে তবে চল পঞ্চায়েত নজুমিয়ার কাছে, সালিশ বসবে, অমনি বাছাধনেরা জব্দ। একেবারে ভিজে বেড়াল, আর কথাটি নাই। (পৃ. ৩৪)

এখনো যার নাক টিপলে দুধ বেরোয় সে নাকি একলা বিশ হাত কুমির মেরেছে। (পৃ. ৩৫)

একেবারে ষোলো আনা মিছে কথা নয় (পৃ. ৩৫)

একে গোঁয়ার গোবিন্দ, তাতে আবার পঞ্চায়েত (পৃ. ৩৬)

সে এসে হাজির হওয়ামাত্র তার উপরে ঝাল ঝাড়তে শুরু করল। (পৃ. ৩৭)

ফকির এসেছে তো আমার মাথা কিনে নিয়েছে। (পৃ. ৪০)

হামদু মিয়া তারস্বরে বলে উঠল, তোমাকে কে ফোঁপর দালালি করতে বলেছে? (পৃ. ৪৩)

বলি বুদ্ধির ঢেঁকি, যদি হাটে কিছু না-ই হবে তবে এমন গোমড়া মুখ কেন? কে তোর পাকা ধানে মই দিয়েছে রে? (পৃ. ৫১)

তার দেখবার লোক কে? কবরমুখো বাহাত্তুরে এক বুড়ো আর নাক টিপলে দুধ বেরোয় এমন এক ছুঁড়ি। (পৃ. ৭৯)

মালেকের টিটকারিকে থোড়াই কেয়ার করে কুলসুম। (পৃ. ৮২)

কুলসুম গলা চড়িয়ে বলল, এবার চাচার কাছে তো ননীর পুতুল, ফুঁ দিলে গলে যায়। (পৃ. ৮৯)

এক ছিলুম তামাক আর দু'গণ্ডা বিড়ি খরচ করতে পারলে বাঘের দুধেরও হদিস মিলে যাবে। (পৃ. ৩৮)

নায়েব মশায় উত্তর দিলেন, গরিবের আবার ঘোড়া রোগ কেন? (পৃ. ৯২)

মেয়েমানুষ অল্প বুদ্ধি আর বেটাছেলেরা বুঝি এক-একজন বুদ্ধির ঢেঁকি? (পৃ. ৯৩)

কুলসুমের ভীষণ রাগ হলো, ভাবল বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। (পৃ. ৯৮)

বসিরের একটা কিছু হ'লে মালেকের সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাবে। (পৃ. ১০২)

সে কথা কুলসুম বোঝে না, আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেতে চায়। (পৃ. ১১৭)

তুমি যে বিসমিল্লায় গলদ রেখেছ, তা কে জানে! (পৃ. ১১৯)

তোমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে, তা নইলে দিনরাত কুলসুম কুলসুম করে মাথার পোকা খসিয়ে দিতে না। (পৃ. ১৫২)

লোকে আমাদের মানিকজোড় বলে ঠাট্টা করত (পৃ. ১৮৪)

মামী যেন আকাশ থেকে পড়ল (পৃ. ১৮৫)

দেখতে দেখতে রটে গেল যে আমি গোল্লায় গেছি। (পৃ. ১৮৮)

উপন্যাসে পদ্মাসংলগ্ন চরাঞ্চলের কৃষিজীবী প্রান্তিক মুসলমান সমাজের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত পরিসরে শিল্পরূপ পেয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামীণ লোকসমাজভুক্ত মানুষেরা জন্মভূমি ও পরিবার ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমায় দুমুঠো খেয়েপরে বেঁচে থাকার তাগিদে। প্রকৃতির ওপর একান্ত নির্ভরশীলতাবশত তারা জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও তা সর্বদাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতায় জর্জরিত। পদ্মার তীরে তারা বসতি গড়ে তোলে, ফসল ফলায়, নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তাদের জীবন ও জীবিকা প্রকৃতির দাপটে বারবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবু জীবনসংগ্রামী মানুষেরা স্বীয় স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে নির্দ্বিধ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তারা অবিরাম লড়াই চালিয়ে যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেখানে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বিলীন হলেও তাদের সামষ্টিক জীবনপ্রবাহ নিরন্তর চলতে থাকে। এরই সঙ্গে যুক্ত থাকে ঐতিহ্যবাহী লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা তাদের সামূহিক বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, নৈতিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এর উৎসে রয়েছে পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিবিধ লৌকিক আচার-আচরণ, ঐতিহ্যগত পরম্পরা ও প্রকৃতিসম্পৃক্ত জীবিকা নির্বাহগত অভিজ্ঞতার নির্যাস। পদ্মাতীরবর্তী লোকগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র উপস্থাপনে এই উপন্যাস শিল্পনৈপুণ্যের দাবিদার।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এই উপন্যাসের প্রকাশকাল প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ জানিয়েছেন, (দ্রষ্টব্য : *উষালোকে*, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকা, 'পত্রিকার কথা'– অংশ, পৃ. অনুল্লেখিত) *নদী ও নারী* হুমায়ুন কবিরের লেখা একমাত্র উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, *Men and Rivers* নামে (হিন্দ কিতাবস্ সংস্করণ, ১৯৪৫)। পরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় *নদী ও নারী* নামে (ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড সংস্করণ, ১৯৫২)। তিনি এই তথ্য গ্রহণ করেছেন যে গ্রন্থ থেকে, সেটি হলো, *The Bengali Novel*, Humayun Kabir, Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1968, p. 126. আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত *নদী ও নারী*-র সংস্করণে প্রকাশকাল উল্লেখ না থাকায় এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সৈয়দ মুর্তাজা আলী জানিয়েছেন, *নদী ও নারী*-র প্রকাশ সাল ১৯৫২ ও *Men and Rivers*-এর প্রকাশ সাল ১৯৪৫ (*হুমায়ুন কবির'* : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : সৈয়দ মুর্তাজা আলী, এ. বি. বুক স্টোর, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ১২৩, ১২৭)। শাহরিয়ার ইকবাল উল্লেখ করেছেন, উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশকাল ১৯৪৫ সাল (*হুমায়ুন কবির*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮)।

হুমায়ুন কবিরের অনুজ আকবর কবির জানিয়েছেন, *Men and Rivers* বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৪৫ সাল আর *নদী ও নারী* বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল। (মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত *উষালোকে*, নভেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ১১৭)। বুদ্ধদেব বসু *নদী ও নারী*-র সমালোচনা লিখেছিলেন চতুরঙ্গ (১৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা), কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯ (খ্রিষ্টীয় ১৯৫২ সালে) সংখ্যায়। এর দুবছর আগে চতুরঙ্গ পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭ ও মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ (খ্রিষ্টীয় ১৯৫০-৫১ সালে) পর পর দুই সংখ্যায় 'পদ্মা' নামে *নদী ও নারী*-র প্রথম খণ্ড 'নজুমিয়া' প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পর এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে, চতুরঙ্গ পত্রিকায়। ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এ বইয়ের বিজ্ঞাপন। ... এসব তথ্য বিবেচনা করে ধরে নেয়া চলে, সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও আকবর কবির-উল্লেখিত *নদী ও নারী*-র প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত (এসব তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য *উষালোকে*, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকা, 'পত্রিকার কথা'– অংশ, পৃ. অনুল্লেখিত)।

২. এই উপন্যাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচকদের বিপরীতধর্মী অভিমতের দৃষ্টান্ত–

ক. 'নদী ও নারী'র সংলাপে কোনো স্থানীয় চরিত্র ফোটেনি–অনেক সময় কেতাবি ভাষা ঢুকে পড়ে তার সুর কেটে দিয়েছে।... আধুনিক উপন্যাসের আদর্শে 'নদী ও নারী' বিচার্য বলে আমার মনে হয় না, একে বলা যেতে পারে পুরোনো অর্থে উপাখ্যান, কিংবা ক্রনিকল, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা থেকে মূল গল্পাংশটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে লেখক তাকে বিস্তার করেছেন দৃশ্যের পর দৃশ্যে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, একটি কেন্দ্রিক চরিত্রের শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত বহুবর্ষব্যাপী প্লটের উপর সুখ-দুঃখের রং বুলিয়ে গেছেন।... ট্র্যাজিক সুরের বদলে করুণ রসে (এর) পরিসমাপ্তির পিছনে হয়তো পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রভাবই বর্তমান। (বুদ্ধদেব বসু, "হুমায়ুন কবির-এর 'নদী ও নারী' ", *হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ*, আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান সম্পাদিত, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৩)

খ. হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী* Epic form-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদীপ্রবাহ, জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ-উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং সর্বোপরি অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও ভবিষ্যৎসঞ্চারী চিরজয়ী জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার রূপায়ণে হুমায়ুন কবিরের সার্থকতা সন্দেহাতীত। এ-উপন্যাসে জীবনপ্রবাহ যেমন নদীর বহমানতার সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থিত, তেমনি ভাষাভঙ্গিও নদীর মতই গতিচঞ্চল, তরঙ্গময়। জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে ... হুমায়ুন কবির অবলোকন করতে চেয়েছেন জীবনকে। শৈল্পিক উত্তরাধিকার ও সমকালসংলগ্ন ফর্ম-নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসপ্রবাহে দূরসঞ্চারী। (সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা', *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১২-১১৩)

গ. উপন্যাস, বিষয় ও প্রকরণে হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) *নদী ও নারী* বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। যে-ভৌগোলিক পরিসরকে হুমায়ুন কবির তাঁর উপন্যাসের কাহিনী-উৎস হিসেবে নির্বাচন করেছেন, বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে তা স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনজীবন উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে ইতঃপূর্বেও গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সমষ্টির জীবনচৈতন্যের সঙ্গে নদী, মৃত্তিকা ও নারীর এমন অস্তিত্বময় সংযোগ সেখানে অনুপস্থিত। যে বিশাল ক্যানভাসে নদী ও মানুষের গতিময় জীবনের চলচ্ছবি তিনি রূপায়িত করেছেন, তা নতুন মানচিত্র ও জীবনসন্ধানী সংগ্রামশীল মানুষের রূপককথায় (allegory) পরিণত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টিতে জীবনের মহাকাব্যিক সম্ভাবনা তার সমগ্র স্বরূপ নিয়েই বিদ্যমান ছিলো বলে মনে হয়। যে জীবন ভঙ্গুর, পদ্মার ভাঙনশীল রূপের কাছে নিয়ত পরাভূত, সেই জীবনকে অস্তিত্বের প্রয়োজনে পদ্মারই মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। অর্থাৎ নদী এখানে কেবল বিনাশী শক্তি নয়, প্রাণদায়িনীও বটে। নদীর এই স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্বের বিন্যাস *নদী ও নারী*-কে আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্যে উন্নীত করেছে (রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৮-২৯)।

বুদ্ধদেব বসুর তিন পৃষ্ঠার এ সমালোচনার আড়াই পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে পূর্ববঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে। এরপর তিনি এ উপন্যাসের আলোচনা টানতে সূত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*-কে। স্বাভাবিকভাবেই দুই উপন্যাসের উল্লেখের কারণটিও অনুমান করা চলে। তাঁর বিবেচনায় এটি যে মানিকের উপন্যাসের ধারেকাছেও যায়নি, সেই বিষয়টি পাঠককে জানাতেই তিনি এই সমালোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে নিছক একটি বাক্যে তিনি এর সম্ভাবনা নির্দেশ

করেছেন– 'ভূমিজীবী মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার সমাজ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার অচেতন বীরত্ব [?]– এইসব সমাবেশের ভিতর দিয়ে বইখানা মূল্যবান হয়ে উঠেছে' (পৃ. ২০৩)। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ উপন্যাসে হুমায়ুন কবিরের সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারেননি। ফলে, রহিমপুর ও বিয়ানচরের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক চালচিত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁর দৃষ্টিতে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। আর পালাগান এই উপন্যাস রচনার উৎস, এই অভিমত যথার্থ নয়। বরং লেখকের মৌলিক ভাবনা প্রকাশের সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবেই এটি নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত পালায় বর্ণিত সহজ-সরল, স্নিগ্ধ গ্রামীণ জীবনের যে অনাবিল আবেদন, এর প্রভাব এই উপন্যাসেও নিজস্ব রূপে ও পরিচয়ে উদ্ভাসিত। পালার কয়েকটি চরিত্রের ও স্থানের নাম, জলদস্যু কর্তৃক মালেক অপহৃত হবার বৃত্তান্তগত ভাবানুষঙ্গ গ্রহণ ব্যতীত সর্বত্রই তিনি নিজস্ব ভাবনা, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কিত ধারণার আলোকে আন্তরিক অবস্থান থেকে তাদের চালচিত্র গ্রন্থনা করেছেন। সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন এবং রফিকউল্লাহ খান এই উপন্যাসকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূল্যায়নে সচেষ্ট। ফলে এই উপন্যাসে বিধৃত পদ্মা-তীরবর্তী কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃতিনির্ভর, দৈবতাড়িত জীবনপ্রবাহ সময়ের ধারাবাহিকতাকে মান্য করেও অস্তিত্বসংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার প্রচেষ্টাকে যে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা আলোকপাত করেছেন।

৩. *নদী ও নারী* উপন্যাস লিখতে গিয়ে হুমায়ুন কবির জনৈক লোককবি রচিত পালা 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা' পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমালোচক মাসুদ রহমান জানিয়েছেন–

> 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা' পালার প্রথম সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪)। ১৯২৮ সালে তিনি চট্টগ্রামের দেওগাঁ পাহাড়ের নিকটস্থ বড় উঠান গ্রাম নিবাসী হযরত আলীর নিকট থেকে পালাটি শোনেন এবং সংগ্রহ করেন। পরে এটি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যায় সঙ্কলিত হয়। ১৯৩৫ সালে পালাটি আরো সামান্য কিছু বেশি পংক্তিযোগে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, 'কবরের কান্না' নামে। এটি তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৫ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। তবে হুমায়ুন কবির সম্ভবত আশুতোষ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকেই কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত হন। কারণ আশুতোষ চৌধুরীর কিছু সংগ্রহ তিনি দেখেছিলেন (মাসুদ রহমান, *হুমায়ুন কবির : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৭৭-৭৮)

কিন্তু এ উপন্যাস প্রসঙ্গে শিপ্রা দস্তিদার যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকে সন্দেহ জাগে, তিনি আদৌ এর নিরপেক্ষ মূল্যায়নে সচেষ্ট কি না! তাঁর অভিমত–

> 'নদী ও নারী' হুমায়ুন কবিরের মৌলিক রচনা বলেই বিবেচিত।... এখানে ...ঔপন্যাসিক যা পারেন নি তা হচ্ছে, কাহিনীর সঙ্গে সেই বিশেষ অঞ্চলের জীবন সমগ্রকে যুক্ত করা। ... রূপকথার গল্প যেভাবে বর্ণিত হয়, 'নদী ও নারী' উপন্যাসের গল্পও খণ্ডে খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে স্বাভাবিক বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে, ... লোকগাথায় যেভাবে জীবনের গল্প বলা হয় অনেকটা সেইভাবেই হুমায়ুন কবির পদ্মাতীরের কিছু মানুষের গল্প বর্ণনা করেছেন। ... লোকজীবনের সারাৎসার থেকে উপাখ্যান বা পালাগানের যে উপাদান পাওয়া যায় তা-ই উপন্যাসের উপজীব্য। (শিপ্রা দস্তিদার, "ঔপন্যাসিক হুমায়ুন কবির ও 'নদী ও নারী'র অন্তরালের প্রসঙ্গ", *হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩)

শিপ্রা দস্তিদার যেসব বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি *নদী ও নারী*-র মৌলিকত্ব সম্পর্কে সমগ্র প্রবন্ধেই একপাক্ষিক মন্তব্য করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন, এ উপন্যাসের যে কালজয়ী মর্যাদা, এর অনেকটাই নামহীন সেই লোককবির প্রাপ্য। তিনি হুমায়ুন কবিরের মৌলিকত্ব স্বীকারে অসম্মত এবং লোকগাথার কবিকে অধিক কৃতিত্ব দিতে চান। কিন্তু এই অভিমত আমাদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পূর্বোক্ত পালার কবি তাঁর রচনার ভিত্তিতেই পাঠকের দ্বারা মূল্যায়িত হবেন। হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস পাঠের সূত্রে নামহীন সেই লোককবির প্রতি ঋণ স্বীকার করলেও সৃষ্টিশীলতার বিবেচনায় মানতেই হয়, নিঃসন্দেহে *নদী ও নারী* রচনার পুরো কৃতিত্ব লেখকেরই। এতে লোককবির জোরালো স্থানলাভ অযৌক্তিক। স্মতর্ব্য, এ উপন্যাসের বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণই পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর মৌলিকত্ব না থাকলে এমনটি কখনোই সম্ভব হত না। শিপ্রা লক্ষ করেননি, লেখক লোকগাথা বহির্ভূত অনেক উপাদান উপন্যাসে সংযুক্ত করেছেন যা বিশেষভাবেই বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। এসব উপাদানের সম্মিলনে এই উপন্যাস নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে ওঠে এবং তাৎপর্যমণ্ডিত লোকজীবনের বৈচিত্র্যময় রূপরেখাকে শিল্পভাষ্যে উন্নীত করার যথাযোগ্য দাবিও জানায়। শিপ্রার অভিমতের ধারাবাহিকতায় বলতেই হয়, স্থানিক পটভূমি, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা তথা ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী বাসিন্দাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র বাস্তবতার আবহযোগে অনুপুঙ্খরূপে যে ফুটে উঠেছে, এই প্রসঙ্গে প্রায় সব সমালোচকই একমত। রূপকথা বা লোকগাথার আদলে নয়, বরং তিনটি পৃথক শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে বিন্যস্ত মোট বাইশটি পরিচ্ছেদে (তিনটি সংক্ষিপ্ত অবতরণিকাসহ) নজুমিয়া-আসগর-আমিনা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নুরু-মালেকের জীবনাখ্যানকে লেখক উপন্যাসে শিল্পাবয়ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবাস্তব, অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনা ও কাল্পনিক প্রসঙ্গের সমাহারে গড়ে তোলা লোকগাথা বা রূপকথার চেয়ে পারিপার্শ্বিক জীবন,

সমাজ-সমকাল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হুমায়ুন কবিরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাস্তবতার শর্তবন্দি এ উপন্যাস লিখতে। মাসুদ রহমান পূর্বোক্ত পালার সঙ্গে উপন্যাসটির প্রতিতুলনাপূর্বক এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন:

> হুমায়ুন কবির প্রধানত ঘটনাবলী ব্যবহার করেছেন, চরিত্রগুলোর নামও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তারপর ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছেন। পালার যাবতীয় অবাস্তবতা, অলৌকিক বিষয়াবলী বর্জন করেছেন। অনেক নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনের স্বার্থে অনেক শাখা কাহিনী যুক্ত করেছেন। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা চরিত্রগুলোর জীবনবোধই নিজ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। পূর্বোল্লিখিত চারটি শাখা কাহিনীর তিনটিই (কুমির শিকার, হাকিম প্রসঙ্গ, ফকির বিষয়ক) নতুন সংযোজন। আর চতুর্থ শাখা কাহিনীতে এনেছেন বেশ পরিবর্তন। পালাতে রঙদিয়া (উপন্যাসে বিয়ানচর) গ্রামটিই আক্রান্ত হয় এবং হার্মাদরা নুরু ও মালেক দুইজনকেই বন্দী করে নিয়ে যায়। তারপর মালেককে হত্যা করতে উদ্যত হলে নুরু 'মা' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাতেই দমকা হাওয়ার ঝাপটায় নৌকার পালের দড়ি ছিঁড়ে যায় এবং ঘুরতে ঘুরতে নৌকা যে চরে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে কিছু জেলে অবস্থান করছিল, তাদের সাথে ডাকাত দলের যুদ্ধ হয়। জেলেদের জয় হয় অবিশ্বাস্যভাবে–একজন বুড়ো জেলের নিক্ষেপিত মরিচের গুঁড়ায় ডাকাতেরা ঘায়েল হয়। উপন্যাসে একাকী মালেক সাগরে ডিঙিতে থাকার সময় ডাকাত কর্তৃক বন্দী হয়। তার মুক্তির ঘটনাও অবিশ্বাস্য নয়। উপন্যাসের যেখানে শেষ, পালার কাহিনী সেখানে শেষ নয়। মালেক পাঁচ বছর পর ফিরে আসে "সদাইগর" (সওদাগর) হয়ে, সে তখন "মস্ত তোয়াঙ্গর" (গণ্যমান্য ধনীব্যক্তি) আর ইতোমধ্যেই বসন্ত রোগে মারা গেছে নুরুসহ বাড়ির সবাই। সবাই বলতে নুরুর বাপসহ মা আমিনাও। পালাতে উপন্যাসের মতো আমিনা পূর্বেই মারা যায় নি। যাহোক, মালেক নুরুর কবরের কাছে যায়–কবরের ভিতর থেকে নুরু কথা বলে "ভুলি নাইরে তোমার কথা"। মালেক ধনসম্পত্তি ত্যাগ করে সেই কবরের পাশে "দেওয়ানা" হয়ে রয়ে যায়। আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের দাবিতে কবির ঐসব অবাস্তবতা বর্জন করেছেন। কাহিনীকে একটি সামাজিক-ব্যক্তিক জীবন অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন-চিত্র হিসেবে পুনর্গঠিত করেছেন। পালার কাহিনীর মূল অংশ অনেকটা গৌণ হয়ে গেছে–সেখানেই কবিরের সার্থকতা এবং মৌলিকতা। (মাসুদ রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল এই উপন্যাসকে 'কালজয়ী' আখ্যা দিয়েছেন। ('প্রসঙ্গ-কথা', *হুমায়ুন কবির*, শাহরিয়ার ইকবাল, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত)। অন্যদিকে স্বীয় প্রবন্ধে শিপ্রা দস্তিদার কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন, যা থেকেও প্রতীয়মান হয়, এই উপন্যাস নিজ গুণেই সর্বভারতীয় পাঠকের মনোযোগ ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, যা এখনো অটুট রয়েছে।

> খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ উপন্যাসটির পরপর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ওরিয়েন্ট লংম্যানস এবং ওরিয়েন্ট অ্যান্ড গ্রীন কোম্পানি থেকে। ... সঙ্গত কারণেই 'Men and Rivers' উপন্যাসটি 'নদী ও নারী'র অনুবাদ নয়। ... ইংরেজিতে লিখিত এই উপন্যাসের কাহিনীও 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা'। উল্লেখ্য যে প্রকাশের অল্পদিন পরেই এই উপন্যাস মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) স্তরের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। একজন ভারতীয় লেখক রচিত এটিই প্রথম ইংরেজি উপন্যাস যা ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি পড়াবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল (আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩০- ২৩১)।

৪. এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত মূল উপন্যাসের সব উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য : হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৯। উদ্ধৃতির পাশে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীতে নির্দেশিত।

৫. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জানিয়েছেন–

> লোকশিল্পে যে ছবি বা নকশা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে মনের মাধুরীর সমাবেশ অনেকখানি রয়েছে। আমাদের লোকশিল্প রূপ পেয়েছে মাটিতে, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, মানুষের দেহের উল্কিছাপে, বেতের বন্ধনীতে, সুতার শিকায়, নানা রঙে, নানা রেখায় আর নানা ভঙ্গিতে। ... ঘরের মেঝেতে নকশিকাঁথাটি মেলে ধরে পল্লীবধূ তাঁর কলমি ফুলের মতো সুন্দর আঙুলখানি দিয়ে সরু সূত্র-জালে ... পদ্মফুলটিকে জীবন্ত করে তুলছেন ... পল্লীশিল্পের কথা ভাবতে প্রথমেই নকশিকাঁথার কথা মনে পড়ে। এই কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ধানের ছড়া, চন্দ্র, তারা. ঘোড়া, হাতি, দেব-দেবীর ছবি অথবা কোনো গ্রাম্য ঘটনার ছকি বুনট করা হয়। নকশিকাঁথা সাধারণত দুই পাটের অথবা তিন পাটের হয়ে থাকে। চার পাঁচ পাটের কাঁথা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাতে কোনো কারুকার্য থাকে না। কাঁথাকে মেঝের উপর তুলে ধরে তার উপরে বসে কাঁথা সেলাই করতে হয়। সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় হতে সুতো তুলে অথবা হাট হতে তাঁতিদের কাছ থেকে নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতো

কিনে এনে কাঁথা সেলাই করা হয়। ঘরের মেঝেতে পা মেলে পায়ের আঙুলের সঙ্গে সুতোর এককণা জড়িয়ে এক একটি গুচ্ছ সুতো পাক দেওয়া হয়। পাক দেওয়া হলে তাদের এক-একটি আঙুলের মধ্যে আটকিয়ে দুটো দুটো পাক দেওয়া সুতো একত্র করে উল্টো পাক দেওয়া হয়। এইভাবে সুতো তৈরি হলে তাদের হাতের কব্জিতে জড়িয়ে আবার পাকিয়ে রাখা হয়। কাঁথা সেলাই-এর সময় খুলে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানো হয়। ['পূর্ববঙ্গের নকশি কাঁথা ও শাড়ি', *জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪-২৫]

৬. সমালোচক জানিয়েছেন–

কবিরউদ্দিন আহমেদ (লেখকের পিতা) ... ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে মনোনীত হয়েছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি চাম্পারান (বিহার), মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, রাঁচি, কৃষ্ণনগর, বরিশাল, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, নওগাঁ, পাবনা ও কলকাতায় কর্মরত ছিলেন। [শাহরিয়ার ইকবাল, 'হুমায়ুন কবির : পরিবার-পরিচিতি ও সংসার-জীবন', আবুল আহসান চৌধুরী ও মাসুদ রহমান সম্পাদিত *হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯]

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

ভাত ও বাঙালি : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মো. সালেহ মাহমুদ*

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম অধ্যয়ন মানবাচরণ আর মানবাচরণের একটি বিশেষ দিক তার খাদ্যাভ্যাস। খাদ্যের সমাজতত্ত্ব উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত খাদ্যসংশ্লিষ্ট সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে। বাঙালির খাদ্য তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভাত। এটি বাঙালির প্রধান খাদ্য। এই প্রবন্ধটি ভাতের সমাজতত্ত্ব অনুসন্ধানে ধান-চাল-ভাতের আদি উৎস-সহ ভাত সম্পর্কিত বাঙালি সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দুর্ভিক্ষ-হাহাকার, শ্রেণিবিভাজন, জেন্ডারবৈষম্য, প্রবাদ-প্রবচন, উৎসব ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছে। বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে ভাতের সংযোজন অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। বাঙালির জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে রয়েছে ভাতের নিবিড় সম্পর্ক, যার মধ্য দিয়ে ভাত হয়ে ওঠে তার প্রধান খাদ্য। ভাতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে ব্যক্তির রুচিবোধ, ধর্মীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতা, অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, শ্রেণিমর্যাদা, শ্রমবিভাজন, জেন্ডার, বয়স, অন্তর্ভুক্তি-বর্জন, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি বিষয়। রাজনৈতিক চরিত্রে দেখা যায়, ভাতের অধিকার আদায়ে বাঙালি দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে আসছে, আবার এই অধিকার আদায়ের ব্যর্থতায় হাজারো মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়েছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ বাঙালি সমাজে ভাতের গুরুত্ব অনুধাবনে রয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ প্রবাদ-প্রবচন, খনার বচন আর ধাঁধা। সর্বোপরি, সনাতনী ব্যবস্থা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাতের আবেদন অনস্বীকার্য। ভাত খাদ্যের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিটি বাঙালির চিন্তা-চেতনা, মননজগৎ এবং জীবনযাপনের গভীরে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবনাচরণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ মৌলিক চাহিদাও বিশ্লেষণ করে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে মৌলিক চাহিদার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। এই জীবনযাপন একদিকে যেমন তার চাহিদাকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তেমনি তার চাহিদাকে ঘিরে জীবনযাপন গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকার প্রধানতম মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। খাদ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামো। খাদ্যের সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি নবীনতম শাখা, যার একদিকে রয়েছে খাদ্য উৎপাদন, চাহিদা-যোগান, বণ্টন ও ভোগ, অন্যদিকে রয়েছে খাদ্যসংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, নীতি-নৈতিকতা, অন্তর্জাগতিক ভাবনা, সাংস্কৃতিক আবেদন এবং পরিবেশ

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়াদি। খাবার এবং বেঁচে থাকা এই দুয়ের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক রয়েছে; বিতর্কের কেন্দ্রীয় ভাবনায় রয়েছে। 'আমরা বেঁচে আছি তাই খাই, না আমরা বাঁচার জন্য খাই'। সক্রেটিস যেমনটি বলেছেন : 'অন্য মানুষেরা খাওয়ার জন্য বাঁচে, আমি বাঁচার জন্য খাই'। ঠিক একইরকম বলেছেন সিসেরো : 'তুমি বেঁচে থাকার জন্যেই খাবে, খাবার জন্যে বাঁচবে না'।[১]

খাদ্য সামাজিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি সামাজিক অসমতা ও শ্রেণিবিভাজন তৈরি করে থাকে। খাদ্যাভ্যাসের মধ্য দিয়ে সামাজিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক এবং জলবায়ুগত পরিবেশের প্রতিফলন ঘটে। খাদ্যের বিনিময় ব্যবস্থা পারস্পরিক এবং আন্তর্নির্ভরশীলতাকে জানান দেয়। ফিসলার (Fischler) দেখান যে, খাদ্য চূড়ান্ত বিচারে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।[২] নির্দিষ্ট কোনো খাদ্যের সঙ্গে যেমন উচ্চশ্রেণি এবং উচ্চ পদমর্যাদার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি ভিন্ন কোনো খাবার সমাজের নিম্নবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্কৃতি বলে দেয় কোন খাবারটি কিংবা খাবারের কোন অংশটি নারী-পুরুষভেদে কে গ্রহণ করবে; একইভাবে বয়সভিত্তিক খাদ্যের বিভাজন রয়েছে। খাদ্যে রয়েছে আমিষ-নিরামিষ গ্রহণ-বর্জন বিতর্ক। আবার শুধু খেলেই চলে না; বরং কখন খাবেন, কিভাবে খাবেন, কোন পাত্রে খাবেন, কিভাবে পরিবেশন করবেন তা-ও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এতে খাদ্য প্রকরণ এবং খাদ্যাভ্যাস দ্বারা ব্যক্তির রস-রুচির পাশাপাশি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটি-বাঙাল, হিন্দু-মুসলমান, শাক্ত-বৈষ্ণব, দেশি-বিলেতি, সাহেব-বিবি-গোলাম তথা জাতপাত নিরিখে তৈরি হয় নানা খাবার, নানা বাসন এবং নানা আসন। জীবনধারণের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা থেকে বিশেষ উৎসব আয়োজনে পরিবেশিত খাদ্য-তালিকা ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো খাদ্যের যেমন সামাজিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি আবার বিশেষ কোনো খাবারের প্রতি রয়েছে নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবু। সব মিলে খাওয়া-দাওয়ার জগৎ মোটেই অন্দরমহলের ব্যাপার নয়; বরং এটি এক বিস্তৃত পরিসর।

মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই খাদ্য। বাঙালি ভোজনরসিক, ভোজনবিলাসী; সে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সব ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকে। খাদ্যের প্রকরণে প্রথমেই আসে ভাতের কথা। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এটি বাঙালির প্রধান খাদ্য, বাঙালিকে বলা হয় 'ভেতো বাঙালি'। বাঙালি আর কিছু না হোক তিনবেলা ভাত পেলেই খুশি; সে যেন ভাতের দাস, ভাতের পূজারী। ভাত ব্যতিরেকে তার আহার অর্থপূর্ণ হয় না। বস্তুত বাঙালির খাওয়া বলতে ভাত খাওয়াকেই বুঝায়। রংগলাল সেন বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনায় উল্লেখ করেন : 'একসাথে অসংখ্য চাল সিদ্ধ করে ভাত খাওয়ার মাধ্যমে বাঙালি এক অনন্যসাধারণ মন-মানসিকতারও অধিকারী হয়েছে'।[৩] ভাত ব্যঞ্জন ছাড়া খাওয়া যায় না; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পঞ্চব্যঞ্জন, ছত্রিশব্যঞ্জন, এমন কি

পঞ্চাশ ব্যঞ্জনেরও কথা আছে। কবি বিজয় গুপ্তের *মঙ্গলকাব্য পদ্মাপুরাণ*-এ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার বর্ণনায় আছে: 'রন্ধন করিল দেবী আপনার মন/পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল তখন'।[৪] ভাতকে কেবল খাদ্য হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই; এর রয়েছে বিবিধ রূপ, আকার, বর্ণ আর প্রকৃতি। এটা বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ; এই খাদ্যদানাটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। একটা সময় ছিল যখন গ্রামীণ বাংলায় ধনী ও দরিদ্রের খাদ্য তালিকায় ছিল যথাক্রমে ভাত ও গমের রুটি। ভাতের রয়েছে রাজনৈতিক চরিত্র, ভোট ও ভাতের রাজনীতি। ভাতের অধিকার আদায়ে বাঙালি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে আসছে, আবার ভাতকে বর্জনের মধ্য দিয়ে পালন করছে অনশন ধর্মঘট। ভাতের কথোপকথনে রয়েছে কত শত কথা, উপকথা, তন্ত্র-মন্ত্র, গান, কবিতা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা আর খনার বচন। ভাতে শক্তি, ভাতে ভক্তি, ভাত নিয়ে হাহাকার-চিৎকার, ভাতের কাড়াকাড়ি, ভাতের ছড়াছড়ি। ভাত শান্ত-স্নিগ্ধ পরিপূর্ণ, এটি আবার প্রতিবাদের এক অনন্যমূর্তিও। এটি কখনো মূর্তমান আবার কখনো এক অনন্য বিমূর্ত চরিত্র। এটি আছে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, ভাব-ভাবনায়, মস্তিষ্ক-মগজে, আনন্দ-আবেগে, মিছিলে-ময়দানে, বক্তব্যে-শ্লোগানে, অধিকার-বঞ্চনায়, ক্ষুধা আর মঙ্গায়।

খাদ্যের সমাজতত্ত্ব : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

প্রথাগত সংজ্ঞায় খাদ্য সাধারণত উদ্ভিদ বা প্রাণিজগৎ থেকে উৎপন্ন একটি উপকরণ, যেটি যথাযথ পুষ্টি ধারণের মধ্য দিয়ে শারীরিক আত্তীকরণে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান ও শারীরিক বিকাশকে জাগিয়ে তোলা-সহ জীবনীশক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। আবার মানুষের খাদ্য গ্রহণ কেবল প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ কার্যই নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, কৃষিবিজ্ঞান আর মনস্তত্ত্বের মতো বৃহৎ প্রেক্ষাপট; বিশেষত খাদ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া, সংস্কৃতি, রুচিবোধ, ধর্ম, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, গ্রহণযোগ্যতা-নিষিদ্ধতা, ভূগোল ও পরিবেশ এবং স্থান-কাল-পাত্রের মতো বিষয়াদি। খাদ্যের দার্শনিক সংজ্ঞায় টেলার (Teller) বলেন : 'being fed and watered are necessary for survival, but that eating and drinking have a value which goes beyond feeding and watering'।[৫] অর্থাৎ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ টিকে থাকার জন্য আবশ্যক হলেও এটি কেবল এই দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর বাইরেও অনেক আবেদন রয়েছে। খাদ্যের মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি কিভাবে এবং কেন খাদ্য গ্রহণ করে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে থাকে। খাদ্যাভ্যাস অন্তর্নিহিতভাবে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষুধাহীনাবস্থা কিংবা খাদ্য গ্রহণে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হওয়ার পরেও ব্যক্তির আহার মানসিকতা বা ভোজন চাহিদা তৈরি হতে পারে; যেমনটি ফরাসি প্রবাদে রয়েছে, 'ভালো খাদ্য ক্ষুধার জন্ম দেয়'।[৬] মানসিক চাপ, অসুস্থতা, অবসাদগ্রস্ততা, চেতন-অবচেতন তাড়না, হতাশা ও ভাবাবেগপূর্ণ অবস্থা, ভয়, রাগ, ক্রোধ, নিরাপত্তাহীনতা, আনন্দ-তৃপ্তি, সহযোগিতা-সহমর্মিতা, প্রেম-ভালোবাসা, বিকারগ্রস্ততা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অনিদ্রা, নৈরাশ্যবোধ, ইতিবাচক-নেতিবাচক অভিযোজন-ক্ষমতা, ভগ্নমনস্কতা,

ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা, ইতিবাচক ভবিষ্যৎ ভাবনা ইত্যাদি বিষয় ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণকে প্রভাবিত করে থাকে।

খাদ্যের সমাজতত্ত্ব নির্ণয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ বৃহত্তর কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গিতে খাদ্য উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, শ্রম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান, পারিবারিক ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা, ভোক্তার প্রত্যক্ষণ, অভিরুচি, পছন্দ, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে থাকেন। মার্ক্সীয় দর্শনে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোতে ধান-চাল-ভাতের উৎপাদন ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। কার্ল মার্কস (Karl Marx) মৌল সমাজ কাঠামোর আলোচনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। আবহমান গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকাশক্তি কৃষি। আর কৃষি পণ্য হিসেবে ধান-চাল উৎপাদনের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয় গ্রাম বাংলার উৎপাদন প্রণালি। ধান উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন শক্তির সমাহার ঘটে, যেমন : ভূমি, শ্রম, পুঁজি, ঋণ, লাঙ্গল-জোয়াল, চাষের বলদ, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, মাড়াই যন্ত্র, গভীর-অগভীর নলকূপ, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি। অন্যদিকে, উৎপাদন সম্পর্কে ভূমি মালিক, মালিক কৃষক, সচ্ছল কৃষক, বর্গাদার-বর্গাচাষী ও ভূমিহীন কৃষক, মহাজন-খাতক, ডিলার, শ্রম বিনিয়োগ, কৃষি কর্মকর্তা ইত্যাদি স্বতন্ত্র সত্তার বহুমাত্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের জাল তৈরি হয়। এই সম্পর্কের গভীরে রয়েছে মালিকানা, বন্টন ও ভোগের দ্বন্দ্ব, শ্রেণিবৈষম্য, বিপ্লব-বিদ্রোহ, আনুগত্য, শোষণ, বঞ্চনা, মুনাফা-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়। আবার ধান-চাল উৎপাদন প্রণালির ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি স্বতন্ত্র উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। আর এই উপরিকাঠামোতে রয়েছে ধান উৎপাদনে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, উৎপাদন-পরবর্তী আচার-অনুষ্ঠান (নবান্ন উৎসব, মুখে ভাত, অন্নপ্রাশন), গ্রামীণ লোকসাহিত্য ইত্যাদি। সর্বোপরি, মার্ক্সীয় ভাবনার মতোই বাঙালি গ্রামীণ সমাজ কাঠামো কেবল ধান-চাল উৎপাদন এবং ভাত গ্রহণের মধ্য দিয়েই টিকে রয়েছে যুগের পর যুগ। ধান-চাল উৎপাদনকারী কৃষকের সংজ্ঞা টিউডর শানিন (Teodor Shanin) উল্লেখ করেন, 'ক্ষুদে কৃষি উৎপাদনকারী যারা সরল হাতিয়ার ও পরিবারের শ্রমের সাহায্যে নিজেদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোগের জন্য এবং সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাধারীদের পাওনা মেটানোর জন্য উৎপাদন করে থাকে'।[৭] এ ভি চায়ানভ (A V Chayanov) দেখিয়েছেন, কৃষকের প্রেষণা ধনতন্ত্রীর প্রেরণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কৃষকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানো, মুনাফা অর্জন নয়।[৮] তবে গত পঞ্চাশ বছরে কৃষি প্রযুক্তিতে যে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে তার মধ্য দিয়ে কৃষি, কৃষক, উৎপাদিত পণ্য; সর্বোপরি, পুরো কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখনকার কৃষি উৎপাদন কেবল গৃহস্থালির ভোগের জন্য নয়; বরং বাজারের জন্য করা হয়। কৃষক গৃহস্থালিভিত্তিক উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতি বা ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থায় প্রোথিত হয়েছে।

খাদ্য গ্রহণ বা অগ্রহণযোগ্যতার সাংস্কৃতিক আবেদন দেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়া এবং খাদ্যের পুষ্টিমানের ওপর নির্ভরশীল নয়। ওয়ারদে (Warde) খাদ্যের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে বয়স, জেন্ডার, শিক্ষা, শ্রেণি, নৃ-তত্ত্ব এবং জনপদকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৯] বস্তুত সংস্কৃতি কখনো কখনো অত্যন্ত পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবারকে বাতিল করে দেয়, আবার কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যহানিকর খাবারকে গ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে থাকে। খাদ্যই বলে দেয় আমি বা আমরা কোন সংস্কৃতির মানুষ। ব্রিলাত সাভারিন যথার্থই বলেছেন : 'তুমি কী খাও আমাকে তা বল, তাহলে আমি বলে দেব যে তুমি কী?'[১০] ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাসে প্রেক্ষাপট (*context*) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যেটি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়। মেনেল, মারকট, ও ভ্যান ওটারলু (Mennell, Murcott and Van Otterloo) খাদ্য ব্যবস্থা বিশ্লেষণে ক্রিয়াবাদ, কাঠামোবাদ এবং উন্নয়নবাদ এ তিন ধরনের প্রেক্ষাপটের কথা উল্লেখ করেন।[১১] সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানীগণ ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, এতে খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ ব্যবস্থা কিভাবে সুসংগঠিত এবং কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে তা দেখা হয়। কাঠামোবাদ খাদ্য গ্রহণে মানব চিন্তার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে থাকে। এটি সামাজিক প্রপঞ্চ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিশেষত ক্রমাধিকারতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি-বর্জন, শ্রেণিসীমা এবং সামাজিক পদমর্যাদা বিশ্লেষণ করে। বারথেস (Barthes) মনে করেন, খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর তথ্যের সমাহার ঘটে, যেটি সংশ্লিষ্ট ভোক্তা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পদমর্যাদা এবং স্বাস্থ্যগত মূল্যকে জানান দেয়।[১২] উন্নয়নবাদ খাদ্যের অগ্রাভিরুচি এবং খাদ্যকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের বিবর্তনবাদী চিত্র তুলে ধরে। মেনেল Mennell ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মানুষের খাদ্য গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণে দেখান কিভাবে বিভিন্ন খাদ্য প্রকরণ বিলুপ্ত হচ্ছে এবং নতুন নতুন খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠছে।[১৩] ফালক (Falk) যুক্তি দেখান যে, মানুষ ভোজ্য এবং অভোজ্যের মাঝে একটি মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকে, যেটা তার বিমূর্ত ভাবনার ভালো-মন্দ, অভ্যন্তরভাগ-বহির্ভাগ, সংস্কৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদির পার্থক্যবোধের মতোই। প্রতিটি খাদ্যের একটি প্রতীকী মূল্য রয়েছে; আর তাই ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে খাদ্যের অর্থনির্দেশকতা এবং প্রতীকী চরিত্রকে গ্রহণ করে থাকে। পারিবারিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন প্রক্রিয়া যেমন পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক যত্নআত্তি এবং দায়িত্ববোধকে জানান দেয়, তেমনি এহেন কর্ম বাড়ির মেয়ে সদস্যদের মাধ্যমে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন ফুটে ওঠে। জেলেফি (Jelliffe) অধিকাংশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধারণত পাঁচ ধরনের খাদ্যের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি : সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিটি সমাজের প্রধানতম খাবার, যেখান থেকে ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় ক্যালরির সিংহভাগ পেয়ে থাকে; দ্বিতীয়টি : মর্যাদাপূর্ণ খাবার, যেটি অনেকটা বিশেষ মুহূর্তের কিংবা সমাজের উচ্চশ্রেণির খাবার; তৃতীয়টি : শরীরবৃত্তীয় খাবার,

যেটি প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য এবং দেহের কল্যাণ নিশ্চিত করে; চতুর্থটি : সংবেদনশীল খাবার, যেটি ব্যক্তি খাদ্যের পুষ্টিগুণের কারণে গ্রহণ অথবা বর্জন করে থাকে; পঞ্চমটি : ব্যক্তির বয়স, জেন্ডার, শারীরিক গঠন, অসুস্থতা ইত্যাদি বিবেচ্য খাবার।[১৪]

ধান-চাল-ভাতের আদিকথা

বাঙালির অন্নের অন্যতম উৎস ধান। ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত। খাদ্য তালিকায় ভাত সংযোজনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ধান-চাল-ভাতের অস্তিত্ব জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী, নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের স্থায়ী আবাসন তৈরি এবং পুরোদস্তুর কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে ভাতের ইতিহাস সম্পর্কিত। বিশেষ করে কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস বদলে মানুষ যখন ঝলসানো কিংবা সিদ্ধ মাংস খাওয়া শুরু করে, তখন থেকেই ভাত জাতীয় খাবার গ্রহণ শুরু। পিএনএস (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য চাল উৎপাদনকারী ধানের বয়স প্রায় ৮-১৩ হাজার বছরের মতো।[১৫] অনুমিত হয়, খ্রিষ্টজন্মের ২৫০০ বছর আগেও ধান চাষের প্রচলন ছিল।[১৬] ভাতের প্রথম বিস্তার ঘটেছিল চীনের পার্ল উপত্যকা থেকে শুরু করে পূর্ব-এশিয়া হয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বঙ্গদেশে ধানের আমদানি হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গায় ধান চাষ হতো শুকনো মাটিতে। ভারতবর্ষেই সম্ভবত পানিতে ডোবানো জমিতে প্রথম ধানের চাষ হয়।[১৭] এরপর ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্তী নেপাল ও বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভাত তৈরির উপযোগী ধান চাষ শুরু হয়। প্রমাণ হিসেবে ভারতবর্ষের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধানের তুষ, পুড়ে যাওয়া ধান ও চালের নিদর্শন, মৃৎপাত্রের গায়ে ধান-চালের নিদর্শন পাওয়া যায়, যা খাদ্যদ্রব্য হিসেবে এতদঞ্চলে ভাতের ইতিহাস বিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই ভূখণ্ডে অস্ট্রিকভাষী আদিবাসীদের মধ্যে চালের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। সিন্ধু সভ্যতার যুগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মানুষও চালের ব্যবহার জানত, বৈদিক যুগেও চালের নানারকম ব্যবহার ছিল।[১৮] প্রাচীন শিলালেখ এবং অন্ত্যমধ্যযুগের 'টেরাকোটা'র মধ্যেও খাদ্যচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় সর্বপ্রাচীন যে শিলালেখটি মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত, সেটি মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ। এটি একটি রাজাদেশ; আদেশের মধ্যে একস্থানে বলা হয়েছে, রাজশস্যভার থেকে দৈবদুর্বিপাকের জন্যে কোনো এক দুর্ভিক্ষের সময় ভিক্ষুদের ধান দেয়া হয়েছিল।[১৯]

বাঙালিরা যে প্রধানত ধান্যোপজীবী ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর—এ চারটি মঙ্গলচরণ শ্লোকে। ঐ শ্লোকে কামনা করা হয়েছে, মেঘ যেন 'তোমাদের শ্রেয় শস্যেও অঙ্কুরোদ্গমের কারণ' হয়। ধানের মধ্যে শালিধান ছিল

বিশেষ জনপ্রিয়; আনুলিয়া শাসনে শালিধানের উল্লেখ আছে। শালিধান প্রধানত হেমন্তের ফসল ছিল।[২০] এছাড়া 'ব্রীহি' নামে আর এক প্রকার ধানও প্রচুর জন্মাত। আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত কেদাপভট্টের *বৃত্তরত্নাকর* গ্রন্থে উদ্ধৃত বাঙালির খাদ্য তালিকায় নতুন চালের ভাত বা টাট্কা গরম ভাত (নবৌদ নি), কচি সরিষা শাক (তরুণং সর্যপশাকম্), হড়হড়ে দই এবং সস্তায় বা স্বল্প খরচে মিষ্টির নাম পাওয়া যায়। এরপর আনুমানিক ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের *প্রাকৃতপৈঙ্গল* গ্রন্থে সাধারণ অল্পবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক ভোজনপর্বে কলাপাতায় ঢালা 'ওগরা' বা ফেনফেনে গরম ভাত, তার সঙ্গে একটু গাওয়া ঘি ও দুধ, ময়না মাছ ও নালিতা শাকের কথা উল্লেখ আছে।[২১] ভবদেভট্টের *প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ* গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার খাদ্য সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে ভাত, মাছ, মাংস, ফলমূল, শাক-সবজি এবং দুধ অর্ন্তভুক্ত ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত সেকালের বাঙালির আহারের তালিকার প্রথমে ছিল ভাত ও ঘি এবং শাক-সবজি এবং পরে তরি-তরকারি এবং সবশেষে প্রিয় খাদ্য ছিল দুধ-ভাত। রসায়ন অধিকারে (চিকিৎসা সংগ্রহ) চক্রপাণি বলেছেন, প্রথমে দুধ পান করতে হবে, তারপর ভালো করে সিদ্ধ ঝরঝরে শালিধানের চালের ভাত।[২২] ধান-চাল-ভাতের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং এর আবেদন সর্বজনবিদিত।

প্রধান খাদ্য হিসেবে ভাত

ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে ধান যে দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপাদিত ফসল সে-দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত হবে এমনটিই স্বাভাবিক। বাঙালির জাতীয় স্বাস্থ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ভাত সরবরাহে ধান উৎপাদন জড়িত। ভাত ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান।[২৩] চাল থেকে প্রস্তুতকৃত ভাত এবং ভাত জাতীয় খাদ্য বাঙালির মৌলিক চাহিদায় প্রথম স্থান দখল করে আছে। বিশ্বের, বিশেষত এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য ভাত। এটি শুধু বাঙালির প্রধান খাদ্য নয়। মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার প্রায় ৯০% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত এবং এটি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% ক্যালরির চাহিদা মেটায়।[২৪] ১৯৪০ সালের এক সরকারি তথ্য থেকে দেখা যায়, বেঁচে থাকার জন্যে রোজ গড়ে যে ৩৬০০ ক্যালোরির প্রয়োজন, গরিবরা তার মধ্যে ৩৫০০ ক্যালোরিরও বেশি চাল থেকে পেয়ে থাকে।[২৫] ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভাত খাওয়া মানুষের সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, আর চতুর্থ স্থান দখল করেছে যথাক্রমে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ। তবে মোট জনসংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গড়ে ২১৭ কেজি চালের ভাত খেয়েছে, যা ইন্দোনেশিয়ায় ১৫১ কেজি, চীনে ১০৪ কেজি এবং ভারতে ৭৬ কেজি।[২৬] অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন মাথাপিছু ৪৩৮ গ্রাম চালের ভাত খেয়ে থাকে, যার পরিমাণ ২০৫০ সালে হবে ৪০৫ গ্রাম।[২৭] আর এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে বাঙালিকে 'ভেতো বাঙালি' বলা হয়। যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোনো ভনিতা

না করে বলে দিয়েছেন, 'ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালি'।[২৮] অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবিধ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'তেজোহানিকর ধান্য'ই উদ্যমী আর্যদের অলস করেছিল, পূর্বাংশে চলে আসা সেই আর্যতান্ত্রিক আলসেমির সন্তানদল আধুনিক বাঙালি নানাভাবে তার মাশুল দিচ্ছে ইংরেজ উপনিবেশ পর্বে ও তার আগে। গৃহ সুখপরায়ণ উদ্যমহীন ভাতখেকো বাঙালির জীবনে পরাধীনতা যেন অনিবার্য।[২৯]

আর্য অথবা মুসলমানরা কেউই এই দেশে ধান আনেনি, ধানের চাষ এই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে। ভারতে আসার সময় আর্যরা ছিল পশুচারী, অনেক পরে প্রাগার্যদের কাছ থেকে কৃষিকাজ শিখে নেয়। যুদ্ধ করে প্রাগার্যদের পরাজিত করে আর্যরা বনজঙ্গল পুড়িয়ে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে। তখন থেকেই ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। পরবর্তীকালে, আর্য, সেন, তুর্কি, আফগান, মোগল এবং সবশেষে ইংরেজরা বঙ্গভূমি দখল করেছে; তবু বাঙালিদের ভাত খাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আসেনি। তবে মোগলরা দীর্ঘকাল বঙ্গ শাসন করলেও ভাষা, পোশাক এবং খাদ্যের দিক দিয়ে নিজেদের একেবারে ভিন্ন মনে করত। নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় মাংস-রুটি খেতে অভ্যস্ত মোগলরা বাংলার মাছ-ভাতকে ঘৃণা করত।[৩০] এতৎসত্ত্বেও, ভাত হয়ে উঠেছে বাঙালির সাংস্কৃতিক ভিত্তি। ইতিহাসের শুরুর দিকে ভাত খাওয়া হত সাধারণত শাক এবং অন্যান্য ব্যঞ্জন-সবজি সহযোগে। নানা শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ *প্রাকৃতপৈঙ্গল* গ্রন্থে রয়েছে, যেমন : 'মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা'।[৩১] প্রণব রায় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বর্ণনায় বলেন, 'বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত; মুসলমান-শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার দিকে ভাতের সঙ্গে প্রধান তরকারি ছিল ডাল'।[৩২]

ভাতের গুরুত্ব বিবেচনায় খাবার হোটেলের নামফলকে সহসাই চোখে পড়ে, 'ভাতের হোটেল', 'ভর্তা-ভাত হোটেল', 'এখানে ভাত পাওয়া যায়' ইত্যাদি লেখনী। এই দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ভাত আর মাছের ভূমিকা অগ্রগণ্য। অসংখ্য নদীর স্রোতধারায় পুষ্ট এবং সারা বছরের প্রচুর বৃষ্টিধারায় সিক্ত দেশের বদ্বীপাকার সমভূমি যুগ যুগ ধরে ধান চাষ ও মাছ ধরাকে এখানকার অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি হিসেবে পরিগণিত করেছে।[৩৩] কবি ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙ্গালি সকল/ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল'।[৩৪] মাছ আর ভাত একে অপরের পরিপূরক; একটি ছাড়া অন্যটি বিকল। সেজন্য 'মেছো বাঙালি' ও 'ভেতো বাঙালি' ইত্যাদি প্রবাদের প্রচলন রয়েছে। একটা সময়, বাঙালির গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ ছিল, যেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধানতম নির্দেশক। তখন মানুষের প্রাচুর্য না থাকলেও পেটে ভাতের অভাব ছিল না। ধান-চাল উৎপাদন এবং ভাত গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাঙালি এক ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী হয়ে আছে, যা অভিভূত করেছে গোটা বিশ্বকে। ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এবং গল্প লেখক উইলিয়াম সমারসেট মম (William Somerset Maugham) ভারত ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেন–

> তাজমহল, বেনারসের ঘাট, মাদুরার মন্দির অথবা ত্রাভাংকোরের পর্বতমালা, এদের কোনোটিই আমাকে অভিভূত করতে পারেনি। ... এদেশে হাজার বছর আগে যখন আর্যরা এসেছিল তখন থেকে বংশ পরম্পরায় একমুঠো ভাতের জন্য মেহনতি কৃষক, যার একমাত্র কামনা তার শরীর আর সত্তাকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখা, সেই কৃষকের ছবি আমাকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছে।[৩৫]

ভাতের শ্রেণিবিভাজন

প্রায় প্রতিটি যুগেই ধনী এবং দরিদ্রের খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য ছিল। খাদ্য প্রকরণে ভাতেরও রয়েছে শ্রেণিচরিত্র আর বর্ণ পরিচয়, যার সঙ্গে রয়েছে ব্যক্তি-মানুষের আর্থসামাজিক ও পদমর্যাদার সম্পর্ক। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আমন, আউশ, বোরো-সহ ষাট-পঁয়ষট্টি প্রকার ভাত রান্নার বর্ণনা রয়েছে।[৩৬] ভাত প্রধানত সাদা রঙের হয়, তবে চালের জাতের ওপর নির্ভর করে হালকা সোনালি, বাদামি, লালচে রঙেরও ভাত হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে সাধারণ ও দরিদ্রশ্রেণির কাছে সামান্য ফেনফেনে ভাত, সঙ্গে সস্তা শাকভাজা বা চুনোমাছের তরকারিই ছিল যথেষ্ট, আর গ্রামের মানুষের কাছে টাট্‌কা গরম ভাত, সরষে শাকভাজা বা সেদ্ধ শাক, পাতলা দই আর কিছু সস্তার মিষ্টিই ছিল পরিতৃপ্তির বস্তু। চতুর্দশ শতকের শেষভাগের গীতিকবিতার সংকলিত গ্রন্থ *প্রাকৃতপৈঙ্গল*-এ উল্লেখ আছে : 'ওগগারা ভত্তা গাইক রম্ভা পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা'।[৩৭] অর্থাৎ কলা পাতায় সফেন গরম ভাত গব্যঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করাই ছিল বাঙালির সাধারণ রীতি। মধ্যযুগে বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*-এ গৌরাঙ্গের আহার হিসেবে 'দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স' এর উল্লেখ রয়েছে। আবার উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে অন্ন পরিবেশন করা হত সে অন্নের কিছু বিবরণ *নৈষধচরিত*-এ দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায় : 'গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি'।[৩৮]

ভাতের শ্রেণিকরণ রন্ধন প্রণালির ওপরও নির্ভর করে, যেমন : ঝুরঝুরে জুঁই ফুলের মতো ভাত, আঠালো দলা পাকানো ভাত, নতুন চালের ভাত, পুরানো চালের ভাত, সিদ্ধ কিংবা আতপ চালের ভাত, খুদের (চালের অতি ক্ষুদ্র অংশ) ভাত, ফেন গেলে ভাত ইত্যাদি। ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, চীন, কোরিয়া, জাপান-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশের মানুষ আতপ চালের ভাত খায়; যা আঠালো ও সুস্বাদু। অন্যদিকে, বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশের মানুষ সেদ্ধ চালের ভাত খেয়ে থাকে। আবার রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, মাটি কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে রান্না ভাতের স্বাদে কিছুটা ভিন্নতা পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আম-কাঁঠাল পাকা শুরু হয়, তখন আম-কাঁঠাল আর দুধ-ভাত এই চারে মিলে খাবারের এক ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। গৃহবধূ তার স্বামী-সন্তান এবং মেয়ে জামাইকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আম-কাঁঠাল মিশ্রণে দুধ-ভাত খাইয়ে থাকে। আবার ভোজের শেষ পর্বে বাঙালি ডেজার্ট (dessert) হিসেবে দুধ-ভাতের সঙ্গে একটু খেজুরে গুড় গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতি নিত্য নতুন প্রকরণের মধ্যে পাওয়া যায় বাসমতি, কালিজিরা, চিনিগুড়া, মিনিকেট,

বাঁশকাঠি, সীতাশাল, রূপসাল, দুধের সর, গোবিন্দভোগ ইত্যাদি নানা জাতের চালের ভাত। তবে সব ধরনের চাল ক্রয়ের সাধ্য সবার নেই; চালের দামের সঙ্গে ওঠানামা করে ভাতের ধরন ও মান। চিকন এবং মোটা চালের ভাত যথাক্রমে ধনী ও গরিবের খাবার, সরকারি রেশনের লাল চালের লাল ভাত ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের খাবার। আতিয়ার রহমান তাঁর অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেন : 'দক্ষিণ বাংলার অভিজাত ও সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ; তবে অভিজাতগণ চিকন এবং সাধারণ লোকেরা মোটা চালের ভাত খেতেন'।[৩৯] ভাতের উন্নত সংস্করণে রয়েছে পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি, ফ্রাইড রাইস, যেগুলো অভিজাতদের বিলাসী খাবার। অবশ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত পোলাও এবং কালিয়ার কথা উল্লেখ করেন; তিনি যে-পলান্নের কথা লিখেছেন তা অবশ্য পোলাও এবং বিরিয়ানির দেশীয় সংস্করণ বলে ধারণা করা হয়।[৪০] অন্যদিকে, শুধু-ভাত (ব্যঞ্জন ব্যতীত), নুন-ভাত, পান্তা-ভাত, বাসি-ভাত, ডাল-ভাত, ভর্তা-ভাত, জাউ-ভাত ইত্যাদি আপামর জনসাধারণের খাবার। পথশিশুরা সারাদিনের ক্ষুধানিবৃত্ত করতে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলা হোটেলের পচা ভাত গোগ্রাসে গিলে জীবন বাঁচিয়ে থাকে। সকালবেলায় একজন শ্রমিক পূর্বরাত্রে পানিতে ভেজানো পান্তা-ভাত খেয়ে সারাদিনের কাজ শুরু করে থাকে। লবণ ও মরিচ সহযোগে এই জলসিক্ত ভাত দরিদ্রের জন্য বেশ তৃপ্তিকর প্রাতরাশ। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম উল্লেখ করেন, প্রাচীন বাঙালি রমণী সাধভক্ষণের সময় যেসব মুখরোচক ব্যঞ্জন প্রস্তুত করত তার মধ্যে পান্তাভাত উল্লেখযোগ্য।[৪১] *চণ্ডীমঙ্গল*-এ ব্যাধপত্নী গর্ভবতী নিদয়ার গরম ভাত ফেলে পান্তা আর আমানি ভালো লাগার কথা রয়েছে : 'পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন/ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় মন'।[৪২] কালকেতুর ভোজন তালিকায় আমানির বর্ণনায় রয়েছে : মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে/এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।[৪৩] 'বনদুর্গাব্রতে' পঞ্চপ্রকরণের মধ্যে ঝাঁই বা পোড়া ভাত অন্যতম।[৪৪] ভাতের অন্যতম প্রকরণে রয়েছে পাচৈ; আউশ ধান একদিন ভিজিয়ে রেখে পরদিন পানি ছেঁকে বাঁশের চালুনের মধ্যে কলা পাতা বিছিয়ে চার-পাঁচ দিন ঢেকে রাখতে হয়। ধানগুলো কুনিয়ে উঠলে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে ছেঁটে চালসহ ধানের শিকড় গুঁড়া করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর, আতপ চালের ভাত রেঁধে তাতে পরিমাণমত গুড়, লবণ এবং চাল-শিকড় মিশ্রিত পানি মিলে পাচৈ তৈরি করা হয়। গ্রীষ্মকালে পূর্বরাতের ভাতকে সকালে কাঁচা মরিচ, রসুন, সরিষার তেল আর লবণ মিশিয়ে ভাতের এক ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়, যাকে গ্রামাঞ্চলে 'কর্করা ভাত' বলা হয়ে থাকে। একইভাবে, শীতের সকালে ভাতকে পেঁয়াজ, মরিচ, তেল, হলুদ আর ধনিয়া পাতা দিয়ে গরম করে 'ভাজি ভাত' খাওয়া হয়ে থাকে। কখনো কখনো চাল এবং বিভিন্ন ডাল মিশিয়ে মসলাযোগে তেলে ভেজে নিয়ে সিদ্ধ করে খিঁচুড়ি তৈরি করা হয়, যা তরকারির সঙ্গে বা এমনিতেও খেতে সুস্বাদু। আবার চালকে মিহিভাবে গুঁড়া করে পিঠা তৈরি করা যায়; দুধ, চিনি ও চালের মিশ্রণে পায়েস বা পুডিং তৈরি হয়।

বৈশাখী আয়োজনে পান্তা-ইলিশ পুঁজিবাদী আগ্রাসনের নতুন সংযোজন, যা গরিবের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আবার সম্প্রতি, অর্থলিপ্সু আর মুনাফালোভী ব্যবসায়ী শ্রেণি প্লাস্টিক চাল উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে, যা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। ব্যবসায়ীরা মোটা চালকে মেশিনের মাধ্যমে সরু করে চিকন চাল হিসেবে বিক্রি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। ভাতের বিবর্তনবাদী চরিত্রে হারিয়ে গেছে গমের ভাত, যবের ভাত এবং কাউন চাল, লাল চাল, ঢেঁকিছাঁটা চাল ও চিনা চালের ভাত। ভাতের শ্রেণিকরণে হাভাতের বর্ণনায় কবি রফিক আজাদ লিখেছেন : 'ভাত চাই—এই চাওয়া সরাসরি—ঠাণ্ডা বা গরম/সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হ'লে/ কোনো ক্ষতি নেই—মাটির শানকিভর্তি ভাত চাই/ দু'বেলা দু'মুঠো পেলে ছেড়ে দেব অন্য সব দাবি'।[৪৫]

শৈশবে ভাত

প্রতিটি বাঙালির শৈশবকাল ঘিরে ভাত সম্পর্কিত এক অনন্যজীবন রয়েছে। ভাত নিয়ে রয়েছে অসংখ্য শিশুতোষ কবিতা, গান, লোকছড়া আর লোককথা। ভাতের একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে দুধ-ভাত। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনায় কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখেছেন : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। এটি শুধু দুধ-ভাতের কথা নয়; বরং এটি একটি রূপক ভাবনা। দুধ-ভাত প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এখানে সন্তানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা-সহ ভালো থাকার সামগ্রিক অনুষঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। 'মুখে ভাত' বাঙালির অন্যতম একটি উৎসব, যেটি অনেকটা পারিবারিক পর্যায়ে পালন করা হয়ে থাকে। নবজাতকের জন্মের প্রথম বছরের শেষের দিকে তার মুখে ভাত দেয়া হয় এই আশীর্বাদ করে যেন ভাতই হয়ে ওঠে তার প্রধান খাদ্য। আবার অবুঝ শিশুরা যখন না খাওয়ার বায়না ধরে, তখন তাদের খাওয়াতে মায়েদের বলতে শোনা যায়, 'আয়রে খোকন ঘরে আয়/দুধ-মাখা ভাত কাকে খায়'; আর তার খাবার কাক খেয়ে ফেলতে পারে এই ভয়ে শিশুটিও যেন শান্ত-সুবোধ বালক-বালিকার মতো খাবারটুকু খেয়ে নেয়। ভাত নিয়ে রয়েছে অনেক শিশুতোষ লোকছড়া ও লোককবিতা, যেমন : 'তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই/মামা দিল দুধ-ভাত পেট পুরে খাই/মামী এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই'; 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা . . ./ধান ভাঙ্গলে কুঁড়ো দেবো সোনার থালে ভাত দেবো'; 'আলিফ বে তে সে/মা চারডো ভাত দে/মা গেল ঐ পাড়া/ভাত হইল কর্করা/মা কইল আসি ভাত হইল বাসি'; 'ও বগি তুই চাস কী/পান্তা ভাত খাস কি'; 'কাঠ্‌বেড়ালি! কাঠ্‌বেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও? গুড় মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও?'; 'বাবুরাম সাপুড়ে.../করে নাকো ফুসফাস, মারে নাকো ঢুসঢাস/ নেই কোনো উৎপাত, খাই শুধু দুধ-ভাত'; 'বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে আয় না যানা গান শুনিয়ে/দুধ-ভাত দেবো সন্দেশ মাখিয়ে' ইত্যাদি। এসব কেবল শিশুকে খাওয়ানো, ঘুমানো আর আনন্দ-বিনোদনের ছড়া-কবিতা। আবার শিশু যখন বড় হয়ে বাংলা-ইংরেজির পাঠ

নিতে থাকে, তখন তাকে বাংলা থেকে ইংরেজি অথবা ইংরেজি থেকে বাংলার যে অনুবাদ শেখানো হয় তার শুরুর বাক্যগুলোর মধ্যেই থাকে : 'আমি ভাত খাই/I eat rice.' শিশুরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গায়ের কাপড় আর জুতা-মোজা খুলেই চিৎকার করে বলে ওঠে : 'মা আমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে তাড়াতাড়ি ভাত দাও'; বিভিন্ন রকমের খাবারের মধ্যে ভাতই তার প্রধান খাবার। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় সবাই ছোটবেলায় তার মাকে চুলায় হাঁড়িতে চাল বসিয়ে ভাত রান্না করতে দেখেছে। পাপড়ি রহমান লিখেছেন–

> ... এ যেন হাঁড়ি ভর্তি ঘোলা জল। আমরা অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম কখন চাল ফুটবে, চাল ফুটে ভাত হবে। জল ফুটে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি হতো না; জলের সঙ্গে দুই-চারটা চাল হাঁড়ির গলায় উঁকি দিয়েই নিচে তলিয়ে যেত; কেবল জল আর চালের খেলা! চাল ফুটতে শুরু করলে বাড়িময় সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তো।[৪৬]

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভাতের এক বিশেষ অবদান রয়েছে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ভাত খাওয়ার আনন্দই আলাদা। এতে পরস্পরকে কাছে পাবার এবং ভাগাভাগি করে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরিবারের সকল সদস্য একসঙ্গে ভাত খাবার তাগিদে বাবার জন্য অপেক্ষা করা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ছোটবেলায় কোনো কিছুতে রাগ হলেই তার সমস্ত প্রকাশ ঘটে ভাতের ওপর গিয়ে 'নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে'। আজও স্মৃতি হাতড়িয়ে শিশুকালে চলে গেলে প্রায় সবার মনে হবে কত সহস্রবার মাকে বলেছে : 'আমি ভাত খাব না/আমি কিছুতেই ভাত খাব না'। আবার রাগ কমে গেলে দেয়ালে লিখে রেখেছে : 'আর একবার সাধিলেই খাইব' কিংবা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছে : 'মা আজ কী দিয়ে ভাত'। আবার ভিন্নচিত্রে দেখা যায়, বেপরোয়া সন্তানকে আনুগত্যে আনতে মধ্যবিত্ত-দরিদ্র পরিবারের বাবাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, 'আজ থেকে তোমার/তোর ভাত বন্ধ'। অন্যদিকে, অসুস্থ হলে বাবার হাতে ভাত খাওয়া এক চিরায়ত ব্যাপার। পাপড়ি রহমান লিখেছেন–

> সান্নিপাতির জ্বরটা আজই সারলো বাবা। বাবা তুমি কোথায়? মাটির নিচে কী ঘুমেই তুমি মগ্ন! একবারও কি আসতে পারো না? একবার আসো তো বাবা। মাত্র একবার। একটা সবুজ-রঙা-কচি- কলাপাতা কেটে নিয়ে আসো। আর এক থালা ভাত। কালিজিরা চালের জাউ-ভাত। বাবা আমি তোমার হাতের ভাত খেতে চাই।[৪৭]

রাজনীতিতে ভাত

ভাতের রাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের ওপর সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন যখন ক্রমেই বেড়ে চলছিল, তখন মওলানা ভাসানীর পরামর্শে পূর্ব-বাংলার অবস্থা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অবহিত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর গমন করেন। একমাসের অধিককাল সেখানে অবস্থান করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গ্রেফতারের আশঙ্কায় বলে ওঠেন : '... যা হবার পূর্ব বাংলায় হোক, পূর্ব বাংলার জেলে ভাত

পাওয়া যাবে, পাঞ্জাবের রুটি খেলে আমি বাঁচতে পারব না'।[৪৮] আবার পরবর্তীকালে পাঞ্জাব থেকে ভারত হয়ে পূর্ব-বাংলায় ফেরার পথে গ্রেফতারের আশঙ্কায় বলেন–

> ... পূর্ব বাংলা সরকারকে খবর দিলেই আমাকে হয় দর্শনায়, না হয় বেনাপোলে গ্রেফতার করতে পারবে। আমি যে ভারতবর্ষে থাকতে পারব না একথা পারমিটে লেখা আছে। কলকাতার সরকারি কর্মচারীরা খবর পেলে আমাকে কলকাতার জেলের ভাতও খাওয়াতে দ্বিধাবোধ করবে না।[৪৯]

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাবের প্রতিবাদে ১১ই অক্টোবর আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক জনসভায় খাদ্যসমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মওলানা ভাসানী ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন; এজন্য তিনি (১৪ই অক্টোবর) কারাবরণ করেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-বাংলায় খাদ্যজনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকারি তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র রাজধানী ঢাকা নগরীর দিকে ক্রমবর্ধমানহারে মফস্বল এলাকার নর-নারীরা আসতে থাকে। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করে বলতে থাকে–

> ... ম্যায় ভুখা হুঁ; ভাত চাই; ভাত দাও– নয় গুলি কর; ক্ষুধার জ্বালায় বাঁচি না; গ্রামাঞ্চলে রেশনিং চাই; আমার শুধু ভাত চাই; ডাল ভাত; অন্ন বিনা বাঁচি না; চাউল চাই, ভাত চাই; হা' অন্ন, হা' অন্ন; ভাত যখন দিবে না, গুলি করিয়া আমাদের পেটের জ্বালা নিভাইয়া দাও।[৫০]

জনগণের এহেন দাবি উপেক্ষা করে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬) এক নির্দেশবলে সমগ্র শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সর্বপ্রকার সভা, মিছিল এবং প্লাকার্ড, পতাকা, পোস্টার বহন এমপ্লিফায়ার, মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন।[৫১] বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের হয়[৫২]; হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নর-নারী ভাতের দাবিতে মিছিলে উপনীত হলে পুলিশের গুলিবর্ষণে মোট আটজন নিহত ও ষাটের অধিক ব্যক্তি আহত হয়।[৫৩]

১৯৭০-এর নির্বাচনের পূর্বে মওলানা ভাসানী 'ভোটের আগে ভাত চাই' দাবি উত্থাপন করেন, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু বলে বলেন : 'ভোট পেলে ভাতের জন্য কারো কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে না, বাঙালিরা ভাতের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে'।[৫৪] পরবর্তীকালে, এই বাংলা থেকে পাকিস্তানিদের তাড়াতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণে হুঙ্কার দিয়ে বলেন : 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'[৫৫]; যেন ভাতের সরবরাহ বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তানিরা এমনিতেই পালিয়ে যাবে বাংলা থেকে। বঙ্গবন্ধুর এহেন ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান সেনাদের হাতে বন্দি মুক্তি সৈনিক আজাদকে ভাত খাওয়াতে না পারার দুঃখে মা সাফিয়া বেগম জীবদ্দশার পরবর্তী চৌদ্দ বছরের শেষ দিন পর্যন্ত মুখে ভাত দেননি। আনিসুল হক *মা* উপন্যাসে লিখেছেন–

> ... একবেলা রুটি খেয়েছেন, কখনও কখনও পাউরুটি খেয়েছেন পানি দিয়ে ভিজিয়ে। মাঝে মধ্যে আটার মধ্যে পেঁয়াজ-মরিচ মিশিয়ে বিশেষ ধরনের রুটি বানিয়েও হয়তো খেয়েছেন। কিন্তু ভাত নয়।[৫৬]

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনে জর্জ হ্যারিসন (George Harrison) গেয়ে ওঠেন, 'Bangla Desh, Bangla Desh/Where so many people are dying fast/…Now won't you give some bread to get the starving fed/We've got to relieve Bangla Desh/Relieve the people of Bangla Desh'। একইভাবে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে জীবন বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরের উদ্দেশ্যে এ্যালেন গিনসবার্গ (Allen Ginsberg) কালজয়ী কবিতা September on Jessore Road-এ লিখেছেন : 'Whom shall we pray to for rice and for care?/Who can bring bread to this shit flood foul'd lair?' যার বাংলা সংস্করণে কিংবদন্তি শিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের কণ্ঠে বেজে উঠেছে : 'কাকে বলি ভাত-রুটি কথা'। আবার স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে চরম দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন আর দুর্ভিক্ষে ভাতের অভাবের এক ভিন্নরূপ ফুটে ওঠে। অর্থলিপ্সু একদল মানুষের অপরিণামদর্শী লুটপাটে দেশজুড়ে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ভাতের অপ্রাপ্তিতে বাংলার মানুষের অনুভূতিকে দেখে-শুনে, উপলব্ধি করে কবি রফিক আজাদ *ভাত দে হারামজাদা* কবিতায় লিখেছেন : 'ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি: উদরে, শারীরবৃত্ত ব্যেপে/অনুভূত হ'তে থাকে।প্রতিপলে।সর্বগ্রাসী ক্ষুধা.../ভাত দে হারামজাদা, তা-না হ'লে মানচিত্র খাবো'।[৫৭] এ এক চরম আক্রোশ, চরম খেদ; যেন ভাত আর মানচিত্র একে অপরের পরিপূরক। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার রক্তমাখা দৃশ্যকে বুকে ধারণ করে ৪০ বছর ভাত খাননি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জের জাটিয়া ইউনিয়নের কুমারলি গ্রামের বঙ্গবন্ধু প্রেমিক হারুন সালেহ রতন। তাঁর ভাষায়–

> ষড়যন্ত্র করে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের এতগুলো মানুষকে নৃশংভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা মেনে নেয়া যায় না। সেদিনের রক্তাক্ত দৃশ্য এখনও আমাকে কাঁদায়। সে সময় আমার মুখে ভাত দিলেই বমি হয়ে যেতো। কিছু খেতে বসলেই বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের রক্তাক্ত দৃশ্য আমাকে কাতর করে ফেলত। খেতে পারতাম না।[৫৮]

স্বাধীনতা-পরবর্তী পয়তাল্লিশ বছরে আজও বাংলার মানুষ 'ভাত ও ভোটের অধিকার' আদায়ে চিৎকার করে বলে যাচ্ছে : 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই'; কিংবা 'কেউ খাবে, কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না'। আবার কখনো কখনো উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে। ভাত আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের জীবনযাপনের অন্যতম প্রতীক। কবি ধীমানপূরবী লিখেছেন : 'মা আমি ভাতের জন্য যুদ্ধ করেছি; তুমি আমাকে ভাত দাও/… নবাগত বাংলাদেশ; রাজ্য চালাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না… /তুমি আমাকে ভাত দাও; আমি ভাত খাব…'।[৫৯]

ভাতের অভাব

খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, গবাদি পশুর মড়ক, ফসলের রোগ, পঙ্গপাল ইত্যাদি কারণে খাদ্যঘাটতি দেখা যায়। আর এ ঘাটতির প্রথম আঘাতটি খাদ্য হিসেবে ভাতের ওপর আসে। ভাতের কষ্ট সবচেয়ে বড় কষ্ট। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবচনগুলোতে ভাতের অপর্যাপ্ততার কথা রয়েছে, যেমন : 'টালত মোর ঘর নাহি পরবেশি/হাঁড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী'।[৬০] অর্থাৎ টিলার ওপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই/হাঁড়িতে ভাতও নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে বঙ্গীয় অঞ্চলে সর্বপ্রাচীন দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। এ লিপিতে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অধস্তন কর্মকর্তাদের প্রতি ধান মাড়াইয়ের মৌসুমে বিপন্ন এলাকায় ধান সরবরাহের এবং তা মুদ্রায় পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়।[৬১] ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* গ্রন্থে কালকেতুর খাবারের বর্ণনায় খুদের জাউ এবং কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এহেন দারিদ্র্যের মাঝেও প্রজাপীড়ক জমিদাররা অনেক বেশি খাজনা আদায় করত, তা কালকেতুর বর্ণনায় পাওয়া যায় : 'পার্ব্বণী পঞ্চক যত/গুড়া লোণ সানা ভাত/ধানকাটি কলম-কসুরে/যত বেচ চালু ধান/তার নাহি নিব দান/অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে'।[৬২] মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে ভারতচন্দ্র দরিদ্রবেশী অন্নদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন : 'অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার'[৬৩]; 'যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান/হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান'; 'এই দেখ বৃদ্ধ বাপ/অন্ন বিনা পান তাপ/বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে/ গেল চারিপর দিন/অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ/যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে'।[৬৪] খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ বাংলার নবাবদের ভোজনবিলাসিতা এবং দরিদ্রের খাদ্য তালিকার তুলনা করতে উল্লেখ করেন–

> ... বাংলার ভোজের সময় প্রচুর আয়োজনের কথা উল্লেখ করলেও সুলতানী আমলে গৌড়ের এক মুসলমান বাড়িতে নিমন্ত্রিত পর্যটক মানরিককে এত ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হয়েছিল যে সেগুলি খেতে তার তিন ঘন্টা সময় লেগেছিল। কিন্তু মানরিক এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে গরীব লোকেরা সেসময় ভাত, লবণ, শাক ও অল্প কিছু তরকারির ঝোল খেত।[৬৫]

ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব হিসেবে মুদ্রা-খাজনা আদায় ব্যবস্থা কৃষকদের প্রধান ফসল (বিশেষত ধান) বিক্রয়ে বাধ্য করে, যা ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে সস্তায় চাল ক্রয় ও মজুদ এবং পরবর্তী সময়ে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রির সুযোগ করে দেয়। ইংরেজ বণিকদের সৃষ্ট কপর্দকহীন কৃষকের ঘরে অন্নাভাবের দরুন এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : বাংলা ১১৭৬ সন, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা ও বিহারে কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়ে। এ সময় চালের অভাবে ভাতের ফেন ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা গরিবের অন্যতম উপায় ছিল। ইতিহাস গবেষক এল এস ও ম্যালী উল্লেখ করেন–

> চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে? কে খাওয়াইবে? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমূর্ষু দেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।[৬৬]

পরবর্তীকালে, ১৭৮৭ সালে বাখেরগঞ্জ জেলায় ইংরেজ বণিকদের মুনাফার লোভ এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। বাখেরগঞ্জের ইতিহাস রচয়িতা হেনরি বিভারিজ্ লিখেছেন–

> এই দুর্ভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর যে জেলার প্রাচীনতম ব্যক্তিও এইরূপ কোন দুর্ভিক্ষ আর কোনদিন দেখে নাই। এই দুর্ভিক্ষে ষাট সহস্রাধিক অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে এবং বহুসংখ্যক কৃষক এক মুষ্টি অন্নের সন্ধানে বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।[৬৭]

ধারাবাহিকভাবে, ১৮৮৬ সালে বাংলার কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তবে প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ছিল উড়িষ্যা। ১৮৯৬-৯৮ সালের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় বাংলা-সহ বিহার, বোম্বে, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ৩৫-৩৮ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।'৭১ –এর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭০এর ঘূর্ণিঝড়, খরা ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য, সার ও তেল সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়।[৬৮] আর এ সব দুর্ভিক্ষেই মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে ভাতের অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

দারিদ্র্য কষ্টপীড়িত মানুষ ভাতের কষ্ট দূর করতে অনেক সময় ভাতের মাড় কিংবা জাউ ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করে থাকে। খাদ্যের অপ্রতুলতার সময় ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি আলু গ্রহণ করা হয়, আবার দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো কারণে চাল কমে গেলে কাঁঠালও বিকল্প খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। ভাতের অভাব পূরণে বিকল্প খাদ্য হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে বলতে শোনা যায় : 'ভাতের বদলে আলু খাও, ভাতের ওপর চাপ কমাও'। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের অনেক সময় সকাল-দুপুর-রাত পালাক্রমে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ভাতের অভাবের এক চরম পর্যায়ে দরিদ্র ব্যক্তিটির 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' এই রকম অবস্থা তৈরি হয়। ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই বলে থাকে : 'দু'মুঠো ভাত দে মা'; যেন তার আর কিছুই প্রয়োজন নেই, একটু ভাত হলেই চলবে। দীন-দরিদ্র মানুষ আসক্তি-সুধা মেটাতে ভাতের পাচৈ খেয়ে অ্যালকোহলিক স্বাদ নিয়ে একটু টাল-মাতাল হয়ে থাকে। ভাতের সঙ্গে রয়েছে বেকারত্ব এবং কর্মহীনতার নিবিড় সম্পর্ক। ছন্নছাড়া কর্মহীন পেটুক প্রকৃতির মানুষদের বলা হয়ে থাকে : 'হাড় হাভাতির দল'; 'কাজ নেই, কর্ম নেই কেবল বসে বসে শুধু অন্ন ধ্বংস' করছিস। আবার সেই কর্মহীন মানুষটি কর্মঠ হয়ে একটু ঠাট বজায় রেখে পরিপাটি চলা শুরু করলে তিরস্কারের সঙ্গে বলা হয় : 'দুই দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় অন্ন'। আবার অভাবী মানুষটি তার নিয়মিত খাদ্যের বাইরে গেলেই বলে থাকে : 'ভাত পায় না চা খায়'; 'পেট জ্বলে ভাতের তরে, সোনার আংটি হাতে পরে'। ভাতের কষ্ট উপলব্ধি করে স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের প্রতি রুষ্ট হয়ে লিখেছেন : 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন–ইহা আমি বিশ্বাস করি না'। ইদানীং একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে খাবার তালিকায় ভাতের পরিমাণ কমে যাওয়া। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র কৃষক দিনে যে পরিমাণ ভাত খায় শহরের সচ্ছলেরা তার চেয়ে অনেক

কম ভাত খেয়ে থাকে। ভাত বর্জনই যেন অর্থনৈতিক সচ্ছলতার লক্ষণ। কিংবা ভাত খেলে ওজন বাড়ে, আর তাই ওজন ঠিক রাখতে অনেকেই ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বিশেষত, বাংলার আধুনিক মেয়েদের একটা অংশ দৈহিক সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে শরীরের ওজন কমিয়ে হালকা-পাতলা হবার জন্য ভাত খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।

দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর হাভাতের এক সাম্যবাদী চিত্র তুলে ধরেছেন কবি নজরুল ইসলাম তাঁর 'মানুষ' কবিতায় : 'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু/আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু'।[৬৯] একইভাবে, 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় ক্ষুধার্ত শিশুর ভাতের অপ্রাপ্তিতে লিখেছেন : 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন/বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক'বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন'।[৭০] কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'ঐতিহাসিক' কবিতায় দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় লিখেছেন : 'একদা দুর্ভিক্ষ এল/ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায় .../চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?/এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন'।[৭১] মহাশ্বেতা দেবী 'ভাত' নামক ছোটগল্পে একজন কৃষক মজুরের অন্নচিন্তা, অন্নাভাব আর অন্ন সংস্থানের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন; দেখিয়েছেন, ভাতের অভাবে কিভাবে একজন মানুষ প্রেত হয়ে গিয়েছিল আবার পেটে ভাত পড়তেই মানুষ হয়ে উঠেছিল, কিভাবে ভাতের স্পর্শে মানুষ স্বর্গসুখ পায়। কবি মহাদেব সাহা ভাতের অভাব উপলব্ধি করে লিখেছেন : পেটে খিদে এখন বুঝি কবিতার জন্য কি অপরিহার্য/জুঁইফুলের চেয়ে কবিতার বিষয় হিসেবে আমার কাছে তাই/সাদা ভাতই অধিক জীবন্ত/আর এই ধুলোমাটির মানুষ।[৭২] ভাতের অভাবের সামাজিক বাস্তবতার অন্যতম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আমজাদ হোসেনের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'ভাত দে' চলচ্চিত্রে, যেটি প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র হিসেবে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে। একইভাবে 'ডাল ভাত', 'এক মুঠো ভাত' চলচ্চিত্রগুলোতে ভাতের অভাবের এক করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জুয়েল মোস্তাফিজ 'ভাতের ভূগোল' গ্রন্থে ভাতের বাজার আলোচনায় উল্লেখ করেন : 'ভাত ডাকে পৃথিবীকে, পৃথিবী ডাকে ক্ষুধাকে, সূর্যের উদাম জঙ্গল থেকে ছুটে আসে ক্ষুধার পাখিরা, ভাতের গায়ের গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে মহাকাল'।[৭৩]

জীবনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বিশ্বায়ন আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধনীকে অধিকতর ধনী করছে আর গরিবের হাঁড়ি ভাতশূন্যই রয়ে গেছে। গরিবের দরকার ভাত; আজ সর্বজনীন উৎসব আর জাতীয়-আন্তর্জাতিক গুরুগম্ভীর আলোচনার চেয়ে ভাত অতি জরুরি। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, খাদ্য থাকাটাই খাদ্য-সরবরাহের একমাত্র পূর্বশর্ত নয়; এক্ষেত্রে বহুবিধ মধ্যবর্তী শক্তির প্রভাব নির্দিষ্ট পরিবারবর্গের ক্রয়ক্ষমতাকে বিপন্ন করে, তাই সামাজিক শ্রেণিবর্গকেই অন্নের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৭৪] এমন ভাবনা আর্যদের রচিত *ঋগ্বেদ*-এ ছিল 'যেন অন্নের ওপরে অধিকার থাকে, যেন অন্নের সবচেয়ে নিকটে থাকতে পারি'।[৭৫] কবি ধীমানপূরবী 'ভাত' নামক কবিতায় লিখেছেন : 'ভাষা আন্দোলন, শরণার্থী ক্যাম্পের নাকাল দেহ

অথবা মুক্তিযুদ্ধ/তোমার কাছে এক থালা ভাত চাই .../বেশি নয় একটা ভাত হলেও চেটেপুটে খাব/দেখাব আমার রক্তের চেয়ে ভাতের দাম কতো'।[৭৬]

ভাত নিয়ে বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, খনা ও ধাঁধা

খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যাভ্যাস বাঙালির চিন্তা ও মনন জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের মেধা ও জ্ঞানের ফসল বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, খনা আর ধাঁধা। ভাতের অভাবকে এক কথায় বলা হয় 'হাভাত'। নতুন চালে স্বাদ বেশি বটে, কিন্তু প্রবাদ বলে : 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে'। সমগোত্রীয় সাদৃশ্য বোঝাতে বলা হয় : 'হাঁড়ির ভাত একটা টিপলে সব বোঝা যায়'। এহেন কথায় সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক নমুনায়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ভিন্নগোত্রীয় বৈসাদৃশ্য বোঝাতে বলা হয় : 'কীসের মধ্যে কী পান্তা-ভাতে ঘি'। পান্তা-ভাতের সঙ্গে ঘি একেবারেই যেমন বেমানান, তেমনি 'গরম ভাতে ঘি' খুবই মানানসই; একইভাবে 'অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি'। কোনো কর্ম সম্পাদন করতে অর্থের প্রয়োজন হয়; অর্থের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভাতের সঙ্গে মিল রেখে বলা হয়ে থাকে : 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না'। আবার, ভিন্ন কোনো উপকরণ পুরো কর্মকে পণ্ড করে দিতে পারে, এরূপ অবস্থায় বলা হয়: 'বাড়া ভাতে ছাই দেয়া'। নিজের খেয়ে, নিজের পড়ে মানুষ নিজ কর্ম সম্পাদন করবে এমনটাই স্বাভাবিক। আর এ স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় ঘটলে বলা হয় : 'ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'। ব্যক্তির এহেন আচরণকে অর্থহীন, ফলাফলশূন্য মনে করা হয়। সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন-ভোগে সাধারণত এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই জড়িত থাকে, এর ব্যত্যয় ঘটলে বলা হয় : 'পুরানো পাগলে ভাত পায় না, নতুন পাগলের আমদানি'। শত্রুকে শায়েস্তা করার কৌশলে বলা হয় : 'হাতে নয় ভাতে মারো'; আবার অতিরিক্ত ভয়ে মানুষ বলে বসে : 'পেটের ভাত চাল হওয়া'। বৃষ্টি আহবানে মন্ত্র বা ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় বলা হয় : 'কানা মেঘা রে তুইন আমার ভাই/একটুখানি পানি দেরে শাইলের ভাত খাই'।

গুরুজনেরা কৃষি সম্পর্কিত খনার বচন ব্যবহার করে জ্ঞানদান করতেন। কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের কৃষিতত্ত্বের পাশাপাশি খনার বচনের গুরুত্ব রয়েছে। ভাতকে ঘিরে রয়েছে নানা খনার বচন, যেমন : 'পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল/তার দুঃখ হয় চিরকাল/তার বলদের হয় বাত/তার ঘরে না থাকে ভাত'; 'গরুর পিঠে তুললে হাত/গিরস্থে কভু পায় না ভাত'; 'সোম ও বুধে না দিও হাত/ধার করিয়া খাইও ভাত'; 'যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট/তত জ্বালে ভাত নষ্ট'; 'ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেকে বসে'—এ খনার বচনগুলো জানিয়ে দেয় কী ধরনের কাজের মাধ্যমে কৃষকের ভাতের অভাব হবে। আবার অন্যদিকে, 'কলা রুয়ে না কাট পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত'; 'ভাদ্দরের টান আশ্বিনের বান/সেই বছর হয় ষোল আনা ধান'—এটি কৃষকের ভাত-কাপড়ের সংস্থানের কথা বলে। পরিমিত আহারবোধ নিয়ে রয়েছে বচন : 'উণা ভাতে দুনা বল/অতি ভাতে রসাতল' অর্থাৎ ভাত পেট ভরে না খেয়ে কিছু

কম খেলে শক্তি বাড়ে। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে মান রক্ষার অপচেষ্টায় বলা হয় : 'ভাত পায় না কুড়ের নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর'; 'ঘরে নেই ভাত কোঁচা তিন হাত'; 'ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই'।

ভাত নিয়ে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় প্রবচন। প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হলেও এগুলো ব্যক্তি-মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সমষ্টির বহিঃপ্রকাশ। যেমন : 'আপন বুদ্ধিতে ভাত, পরের বুদ্ধিতে হাভাত'; 'পরের কথায় লাথি-চাপড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড়'; 'উচিত কথার ভাত নাই'; 'উচিত কথায় বন্ধু বেজার, গরম ভাতে বিড়াল বেজার'; 'দুই সতীনের ঘরকন্যা, ঘরের গিন্নি ভাত পায় না'; 'অন্ন বিনা চর্মদড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি' ইত্যাদি। ভাত রান্নার কৌশল নিয়েও রয়েছে লোকবচন, যেমন : 'চাউল দিবে যত তত/জল দিবে তার তিন তত/ফুটলে দিবে ভাতে কাঠি/তারপর দাও জ্বালে ভাটি'। বিবাহিত সংসার জীবনের দায়িত্ববোধ নিয়ে লোককথা, যেমন : 'যখন আছে দুই পাও যথা ইচ্ছা তথা যাও/যখন হবে চার পাও ভাত-কাপড় দিয়া যাও'। সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করলেও তাদের মঙ্গল কামনায় বলে ওঠেন : 'না দিল ভাতি তাও জ্বলুক বাতি'।

লোকসংস্কৃতির বুদ্ধিদীপ্ত শাখা ধাঁধা, যার মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার নানাচিত্র ফুটে ওঠে। ধাঁধার ভাষা রহস্যাবৃত ও প্রশ্নবোধক। ভাত নিয়ে রয়েছে অনেক ধাঁধা, যেমন : 'আসবে তারা যাদের স্বভাব, ভাত ছড়ালে হবে না অভাব'; 'আছাড় দিলে ভাঙ্গে না, টিপ দিলে গলে, এক বেলা না পেলে বাঙালির না চলে'; 'টিপির ভর সয় না, আছাড় দিলে ভাঙ্গে না'; 'পাঁচ চাকর তুলে দিল, বত্রিশ ছেলের ঘাড়ে, দূরে ছিল জাসী বুড়ি, টেনে নিল তারে'; 'উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দালান বাড়িকোঠা, ভাত শালিকে বলে গেল ফলের আগায় পাতা' ইত্যাদি। লালন সাঁই জাত-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে মানবধর্মকে স্থান দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়/লালন বলে জাত কারে কয় এই ভ্রমও তো গেল না'।

ভাতের জেন্ডার প্রেক্ষাপট

গ্রাম বাংলায় নারী-পুরুষভেদে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে ভাতের যোগসূত্র রয়েছে। প্রচলিত ধারণা মতে, কেবল পুরুষরাই ভাতের সংস্থান করে থাকে। এরূপ ধারণা থেকে গ্রামীণ জনপদে মনে করা হয় : 'ভাত দেয় ভাতার'; এখানে ভাতার বলতে স্বামীকে বোঝানো হয়। সেই ভাতার তার স্ত্রীকে মোটা ভাত আর মোটা কাপড় দিতে পারলেই স্ত্রী যেন বেজায় খুশি। আবার ভাত-কাপড়ের যোগান দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী তার স্বামীর গুণকীর্তন না করলে স্বামী বা তার পরিবারের লোকজন বলে ওঠেঃ 'ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও নাঙ্গরের'। অন্যদিকে, স্বামী ভাতের সংস্থান করতে না পারলে স্ত্রীও যেন উল্টো বলে বসেঃ 'ভাত দিবার সাধ্যি নাই ভাতার হবার চাই'। কিংবা স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে বিবাহ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত পর্যায়ে স্ত্রী বলে বসে : 'আমি তোমার

(স্বামী) ঘরে ভাত খেতে চাই না'; এক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে বলে থাকে : 'সে তার ভাতার/স্বামীর ভাত খাবে না' কিংবা 'তার কপালে স্বামীর ভাত নেই'। ভিন্নচিত্রে দেখা যায়, স্বামী ঘরে না ফেরা পর্যন্ত স্ত্রীর অনাহারে থাকা কিংবা খাবার টেবিলে ভাত-তরকারি সাজিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করা চিরায়ত সমাজের দীর্ঘদিনের প্রথা। হিন্দুধর্মের অনুসারীদের অনেকেই মনে করেন, স্বামীর আগে ভাত খেতে নেই। দৈনিক *কালের কণ্ঠ* এক প্রতিবেদনে লিখছে : গীতা চক্রবর্তী এবং দুলাল চক্রবর্তী বিবাহিত জীবনের ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও 'স্বামীর আগে স্ত্রীর ভাত না খাওয়া' মা-ঠাকুরমা'র এই অনুশীলন মেনে চলেছেন। গীতা চক্রবর্তীর ভাষায়–

> মাঝে মাঝে ক্ষুধার জ্বালা হতো অসহ্য। তখন খেয়ে নিতে ইচ্ছা হলেও মনে পড়ত মা ও ঠাকুরমার অমর বাণীটির কথা। তাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, ঘরে স্বামী আসার আগে যে স্ত্রী ভাত খেয়ে নেয় তার কপালে বড় দুঃখ আছে। স্বামীর আগে খাবার খেলে সেই পরিবারে ভর করে অলক্ষুণে।[৭৭]

ভাতের এহেন চরিত্র বিশ্লেষণে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন বলেন–

> আমরা একসাথে অনেক ভাই ভাত খেতে বসতাম। মা আমাদের ভাত দেওয়ার আগে ডেচকি থেকে একটি প্লেটে রেখে দিতেন কিছু ভাত। এটাকে বলা হত 'আগ ভাত'। অর্থাৎ ডেচকির আগের ভাত বাবার জন্য নির্ধারিত ছিল।[৭৮]

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীর ভাত-কাপড়ের যোগান-সহ যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারে বিবাহের ক্ষেত্রে ঘটকরা সহসাই মেয়ের বাবাকে বলে থাকে, 'ঐ বাড়িতে বা ঐ ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হলে ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না'। অন্যদিকে, স্বামী বেকার বা কর্মহীন হয়ে স্ত্রীর উপার্জনে নির্ভরশীল হয়ে পড়লে গ্রামীণ সমাজে বলা হয় : 'স্ত্রীর ভাত খাওয়া'; আর এই পরিস্থিতি স্বামীর জন্য বিব্রতকর ও অসম্মানজনক মনে করা হয়। গ্রামীণ বধূরা গামলায় ভাত-তরকারি সাজিয়ে লুঙ্গি-গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে মাঠে নিয়ে কর্মরত স্বামীর ক্ষুধা নিবৃত্ত করে থাকে। এহেন আচরণ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। আবার ভিন্নচিত্রে দেখা যায়, মাঠকর্ম শেষে স্বামী বাড়ি ফিরে ভাত না পেলে কিংবা ভাত পরিবেশনে দেরি হলে স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালি-সহ কখনো কখনো শারীরিকভাবে প্রহার করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শাস্তি* গল্পে বর্ণিত–

> দুখিরাম পথের কাঁদা আর জল ভাঙিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ... কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে"। বড় বউ তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।" গৃহিণীর রুক্ষবচন ... দুখিরাম ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।[৭৯]

গ্রামীণ বধূদের শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন করতে গিয়ে স্বামী সহসাই ভাত-কাপড়ের খোটা দিয়ে থাকে, যাকে লোককথায় বলা হয় : 'কথায় চড় থাপ্পড়, কথায় ভাত-কাপড়'। আর এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রীও বলে থাকে : 'ভাত দেবার মুরোদ নাই কিল দেবার গোঁসাই'। আবার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে স্ত্রীকে অপয়া আখ্যা দিয়ে 'ভাতার খেকো' আখ্যায়িত করা হয়; যেন স্বামীর মৃত্যুর জন্য স্ত্রীই দায়ী। এই কথায় কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা আর বাস্তবতা বিবর্জিত ভাবনা প্রকাশ পায়। আচারনিষ্ঠ উচ্চবর্ণে হিন্দু বিধবারা আতপ চালের ভাত খেয়ে থাকে, যা নারীদের প্রতি খাদ্যবৈষম্য তৈরি করে। *নৈষধচরিত* গ্রন্থে ভাতের বিস্তারিত বর্ণনায় আছে : 'ওগগারা ভত্তা রম্ভা পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুক্তা/মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কাশন্তা পুনবন্তা' অর্থাৎ যে রমণী কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, নালিতা মানে পাটশাক প্রতিদিন পরিবেশন করতে পারে তার স্বামী পুণ্যবান।[৮০] বাংলা লোকগানে রয়েছে ভাতের কথা, যেমন : 'বউ গিয়েছে বাপের বাড়ি/বাড়িত আসার খবর নাই/বউয়ের ওপর রাগ করিয়া ভাত পোড়াইয়া করি ছাই'।[৮১] গ্রামীণ সমাজে সাধারণত মা-মেয়ে-স্ত্রীরা সকলের শেষে আহার গ্রহণ করে থাকে, আর সে যদি দরিদ্র পরিবারের সদস্য হয় তাহলে দিনশেষে তার থালায় পোড়া ভাত কিংবা হাঁড়ির তলানীর ভাত জোটে। যা গ্রামীণ মেয়েদের পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ।

ভাত উৎসব

ভাত নিয়ে রয়েছে বিবিধ উৎসব আয়োজন। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে অধিক শস্যপ্রাপ্তি, বৃষ্টি প্রার্থনা এবং সন্তান ও পশুসম্পদ কামনায় নবান্ন উৎসব পালিত হয়ে থাকে। নতুন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় পরিজন নিয়ে এই উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত '*নবান্ন*' কবিতায় লিখেছেন : 'ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ/পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।'[৮২] বাংলাদেশে প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায় নবান্ন উৎসব পালন করত। এই সম্প্রদায়ের গৃহস্থরা হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসে নবান্ন উৎসব পালনে মেতে উঠত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল নতুন চালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা; পরে দেবতা, অগ্নি, কাক, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিবেদন করে গৃহকর্তা ও তার পরিবারবর্গের নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ।[৮৩] বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তাদের প্রধান ফসল ঘরে তোলার পর নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে। সাঁওতালরা পৌষ-মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তুলে সাতদিন সাতরাত গান-বাজনা এবং মদ্যপানের মাধ্যমে সোহরায় নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে। উসুই গোষ্ঠী অন্নদাত্রী লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মাইলুকমা উৎসব পালন করে। জুমচাষি ম্রো চামোইনাত উৎসবে মুরগি বলি দিয়ে নতুন ধানের ভাতে সবাইকে ভুঁড়িভোজন করায়। ফসল তোলার পর গারোরা ফল ও ফসলের প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পানাহার ও নৃত্যগীতবহুল ওয়ানগাল্লা উৎসব পালন করে। বাঙালি বৌদ্ধরা কৃষি কাজ করার পূর্বে আল্পনি বা

অম্বুবাচী নামে একটি বিশেষ পূজা করে থাকে। আল্পনিতে তৈরিকৃত বিশেষ খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ভাত, সুজি, পিঠা; যা চাষের জমিতে গিয়ে সকলকে প্রদান করা হয়ে থাকে।[৮৪] বৈষ্ণবরা কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট পাহাড়ের মতো উঁচু করে ভাত সাজিয়ে এক ধরনের উৎসব পালন করে থাকে। এই উৎসবে অন্ন এবং গোবর দিয়ে গোবর্ধন পাহাড়ের প্রতীক তৈরি করে পূজা করে থাকে।[৮৫]

আত্মীয়-পরিজনদের নতুন বউ দেখানোর অনুষ্ঠান হিসেবে বৌভাত, শিশুর সুস্থ ও মঙ্গল কামনায় মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন, বন্ধুদের সবাই মিলে চড়ুইভাতি ইত্যাদি ভাতকেন্দ্রিক উৎসব উল্লেখযোগ্য। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বৌভাত অন্যতম। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বিয়ের পরদিন অথবা তৃতীয় দিন বরের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। নববধূকে আমন্ত্রিত অতিথিরা আশীর্বাদ-সহ উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। হিন্দু রীতিতে এই দিন নতুন থালা বাটিতে নানা রকম রান্না, মাছের মাথা, মাছের লেজ, দই মিষ্টি এবং শাড়ি ও প্রসাধন সমাগ্রী সাজিয়ে বর বধূর হাতে তুলে দিয়ে বলে থাকে : 'আজ থেকে তোমার জন্মের ভাত-কাপড়ের ভার নিলাম'। নববধূকে প্রথম রান্না করতে দেওয়া হয় এবং এরপর সাজগোজ নিয়ে বধূ স্বামী, শ্বশুর, দেবর, ভাসুর এবং আরও সব গুরুজনকে ভাত পরিবশেন করে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্নের গুরুত্ব বিবেচনায় শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত*-এ দময়ন্তীর বিয়ের ভোজ বর্ণনায় রয়েছে, 'পরিবেশিত অন্ন থেকে ধোঁয়া উঠছে, তার প্রতিটি কণা অভগ্ন, একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময়'।[৮৬] শিশুর প্রথম শক্ত খাবার খাওয়ার দিনটিকে 'মুখে ভাত' বা 'অন্নপ্রাশন' উৎসব বলা হয়ে থাকে, যা পারিবারিক পর্যায়ে বাঙালির একটি উৎসব। হিন্দুধর্মে শিশুর জীবনের সঙ্গে অন্নপ্রাশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত নবজাতকের নাম রাখার রীতিকে হিন্দু সমাজে বলা হয় অন্নপ্রাশন। অনেকের ধারণা ছেলেদের জন্য বিজোড় ও কন্যার জন্য জোড় মাসে 'অন্নপ্রাসান' করার রীতি রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম অনুসারীদের মাঝে অন্নপ্রাশনকে আঞ্চলিক ভাষায় 'ভাত ছোঁয়ানী' বলা হয়ে থাকে। এদিন শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করে স্নানের পর শিশুকে নববস্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়; অতঃপর উপাসনা শেষে প্রধান ভিক্ষুকে দিয়ে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত ছেলে হলে ৬ থেকে ৮ মাস এবং মেয়ে হলে ৫ থেকে ৭ মাস বয়সে অন্নপ্রাশন করা হয়।[৮৭] অন্নপ্রাশন নিয়ে রয়েছে ছড়া : 'ছোট আমি বড়ই ছোট নেইকো আমার দাঁত/তবুও আমায় সবার চাপে খেতে হবে ভাত/তোমরা সবাই এসো কিন্তু খাইয়ে দিতে ভাত/নইলে আমার উঠবে নাকো অনেক সাধের দাঁত'। হিন্দু ধর্মে 'আইবুড়ো ভাত' বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্ন গ্রহণ অনুষ্ঠান। পাত্র স্নান করে ভাত খাওয়ার পূর্বে নতুন ধুতি ও গেঞ্জি এবং পাত্রী লাল ছাপা কাপড় ব্লাউজ পরিধান করে থাকে। সাধারণত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পাত্র-পাত্রীকে আইবুড়ো ভাত খাইয়ে থাকেন এবং গুরুজনেরা ধান দূর্বা দিয়ে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করেন। চাকমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বিজু।

বিজুকে কেন্দ্র করে ভাত থেকে তৈরি করা হয় দু-ধরনের উৎকৃষ্ট মদ; যার একটি দো-চোয়ানী, আরেকটি ভাত পঁচিয়ে ভাতের রসজগরা বা কাঞ্জি। গ্রাম বাংলায় আত্মীয়-স্বজনের মাঝে পারস্পরিক নিমন্ত্রণে 'দুটি ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন' বাক্যটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যদিও সেখানে কেবল ডাল-ভাতের ব্যবস্থা থাকে না।

ভাত প্রার্থনা, ভক্তি-অভক্তি

মড়ক, খরা, বন্যায় চাষাবাদ না হলে অন্ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই অন্নের জন্য প্রার্থনা আর্যদের প্রধান একটি ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর ঋক্‌গুলোতে অন্নের জন্য বিস্তর প্রার্থনা রয়েছে, যেখানে অন্নের প্রায় চৌদ্দটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়ঃ অন্ন, অন্ধস্, ইষ, বাজ, পৃক্ষ, পিতু, ভক্ত, শ্রবস্, স্বধা, ঊর্জ, ইলা, চন, নমস্ ও বয়স্। *ঋগ্বেদ*-এ অন্ন প্রার্থনায় প্রচুর মন্ত্র রয়েছে, যেমন : 'তোমরা সৎকার্যকারীকে অন্নে ভরিয়ে দিও'; 'ইন্দ্র ঊর্ধ্বে অন্নের দাতা'; 'কীর্তির জন্য অন্ন মুক্ত করে দিও'; 'ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার কাছে অন্ন প্রার্থনা করি'; 'পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যেন অন্ন ভোগ করি'।[৮৮] অনেক দেবতার সঙ্গে সমান করে বলা হয়েছে, 'অন্নই আদিত্য'; 'অন্নই মারুদগণ'; 'অন্নই অগ্নি'; 'অন্নই দেবতার সমাহার'। প্রাচীন হিন্দুযুগে জাত-বর্ণ ব্যবস্থায় অন্ন গ্রহণ বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ ছিল। চণ্ডালের স্পর্শ করা কিংবা চণ্ডাল, অন্ত্যজ ও নর্তকী ইত্যাদি কিছু শ্রেণির রান্না করা অন্ন খাওয়ায় নিষেধ ছিল। ব্রাহ্মণ বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম, ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করলে অর্ধেক। ক্ষত্রিয় শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্র চতুর্থাংশ কম এবং বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করলে অর্ধেক। বৈশ্য শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক। আবার ব্রাহ্মণ যদি আপৎকালে শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করে তাহলে মনস্তাপ দ্বারাই শুদ্ধ হতে পারে। চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের জাত যেত না, প্রায়শ্চিত্ত করলে শুদ্ধি হত।[৮৯] তবে আজকাল এসব নিয়ম কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নেই বললেই চলে। বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণকে পান্তা ভাতের ভোগ দেন। জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে পান্তা ভাত, দই, চিনি, কলমি শাক ভাজা আর দুই রকমের ব্যঞ্জন সহযোগে যে ভোগ দেওয়া হয় তার আনুষ্ঠানিক নাম 'পাকাল ভাত'। বৈষ্ণবীয় গুরুবাদে বলা হয় দীক্ষা না নিলে মানুষ পবিত্র হয় না। বৈষ্ণব গুরু শ্রীচরণ দাস ঠাকুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে দীক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে লিখেছেন : 'অদীক্ষিতাং লোকানাং দোষং শৃণু বরাননে/অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্'।[৯০] অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠার সমান, জল মূত্রতুল্য। আইবুড়ো অনুষ্ঠানে ভাত রান্নার পূর্বে উনুনকে গোবর দিয়ে লেপন করা হয়ে থাকে এবং আগুন দেওয়ার পূর্বে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে উনুনের পাশে গোটা একটা পান, একটা গোটা সুপারি ও বাতাসা দেওয়া হয়।[৯১] মুসলিম কৃষকরা নতুন ধানের ভাত প্রথমে নিজে না খেয়ে হুজুর-মওলানা, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দাওয়াত করে খাইয়ে থাকে; যেন সৃষ্টিকর্তা তার সহায় হন, রুজি-রোজগার আর ফসল উৎপাদনে বরকত দেন। আবার গ্রামের বধূরা প্রতিদিন রান্নার পূর্বে একমুঠো (এক মুষ্টি) চাল আলাদা করে

রাখেন। এভাবে পুরো পাড়া বা মহল্লা সারামাসের জমানো চাল একত্র করে মসজিদ-মক্তবের হুজুর-মওলানার মাসিক সম্মান হিসেবে দেয়া হয়, যা থেকে তার অন্নের সংস্থান হয়ে থাকে। অসাবধানতাবশত হাত থেকে কিংবা নির্ধারিত স্থান থেকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (বিশেষত কোরআন শরিফ, হাদিস শরিফ) মাটিতে পড়ে গেলে মাশুল হিসেবে উক্ত গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ চাল দান-খয়রাত করা গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘদিনের রীতি।

ভাত গ্রহণকালে রয়েছে শ্রদ্ধা-ভক্তির আচরণ। ভাতের থালা চেটে খাওয়া, থালা থেকে ভাত পড়ে না যাওয়া, পায়ের নিচে ভাত না পড়া, প্লেটে ভাত রেখে খেতে না বসা কিংবা খাদ্য গ্রহণ অসম্পূর্ণ রাখা ইত্যাদি আচরণ ভাতের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীগণ খাদ্য গ্রহণ করার সময় অন্নের থালাকে জয়মাতা অন্নপূর্ণা বলে নমস্কার করে থাকে এবং দিবসে অন্ন আর রাতে রুটি খাওয়ার কথা বলা হয়।[৯২] আবার বড়দের বলতে শোনা যায় : 'পায়ের নিচে ভাত পড়লে সে ভাত অভিশাপ দিয়ে থাকে'। সৎ পিতামাতা সর্বদাই তাদের সন্তানদের উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, 'ধার করে ঘি খাওয়ার চেয়ে সৎ পথে নুন-ভাত খাওয়া অনেক মর্যাদার, অনেক সম্মানের'। অন্যদিকে, সন্তান বড় হয়ে তার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে বলা হয় : 'সে তার বাবা-মাকে ভাত দেয় না'। আর এরূপ সন্তানকে সমাজ অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ভাতকে মায়ের মতো সম্মান জানিয়ে শিল্পী আজাদ রহমান গান গেয়েছেন : 'চিড়া বলো পিঠা বলো ভাতের সমান নয়, খালা বলো চাচী বলো মায়ের সমান নয়'। একই ধরনের কথা বাংলা প্রবাদে রয়েছে : 'পিসি বল মাসি বল, মার বাড়া নাই/পিঠে বল, মিঠে বল ভাতের বাড়া নাই'। কাউকে 'লাল দালানের ভাত' অর্থাৎ জেলখানার ভাত খাওয়ানোর কথা মনে করে দেওয়া মানে তাকে চরম অসম্মান এবং ভীতি প্রদর্শন করা বোঝায়। অনেক সময় কাউকে অভিশাপ করতে গিয়ে বলা হয় 'তুই ভাত পাবি না' কিংবা 'ভাতের অভাবে মরবি'। হুমায়ুন আজাদ '*আমাদের মা*' কবিতায় লিখেছেন : 'আমাদের মা ছিল ধানক্ষেত-সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকতো/আমাদের মা ছিলো দুধভাত-তিনবেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকতো'।

উপসংহার

ভাত বাঙালি সংস্কৃতির আকর। সংস্কৃতির ভিতর দিয়েই ভাত পূর্ণাঙ্গ যথাযথ মর্যাদা এবং আবেদন খুঁজে পায়। ধান-চাল-ভাতের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ বাঙালি সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাত রন্ধন, পরিবেশন, প্রকরণ আর ভোগে রয়েছে ব্যক্তির শ্রেণি মর্যাদা, পেশা, জেন্ডার, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভাজন। ভাতের সংস্থান বাঙালির সচ্ছলতার দ্যোতক। শান্তি ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাতের জোগাড় হলেই বাঙালি নিশ্চিত থাকে। ভাত কেবল পেট ভরায় না, সংসারের লক্ষ্মীও বটে। বাঙালি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই ভাতের সঙ্গে তার এক পরম সৌহার্দ্য তৈরি হয়। ভাত খেয়েই তার বেড়ে ওঠা ও পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং একটি পূর্ণাঙ্গ

মানবসত্তায় পরিণত হওয়া। ভাতের প্রাচুর্যতায় বাঙালি যেমন আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে, তেমনি এর অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে, ক্ষুধা-মঙ্গায় কেটে যায় তার জীবন। জন্ম, জীবনযাপন এবং মৃত্যু এর প্রতিটি স্তরে ভাতের আবেদন অনস্বীকার্য। ভাতের সমাজতত্ত্ব অনুধাবণ প্রকারান্তরে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিরই পাঠ। বাঙালি সমাজ পরিবর্তন আর বিবর্তনের ধারায় যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন ভাত সর্বদা সমাজজীবনের কেন্দ্রীয় স্থানটি দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সিকদার আবুল বাশার (সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাণী চিরন্তনী*, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১
২. Fischler, C., 'Food, Self and Identity', *Social Science Information* 27, 1988, 2:275–92
৩. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃ. ২৫
৪ ওয়াকিল আহমদ, 'লোকসংস্কৃতি', *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ২২১
৫. Teller, E., *Food for Thought*, London: Routledge, 1996
৬. সিকদার আবুল বাশার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১
৭. Shanin, T., (ed) *Peasants and Peasant Societies*, Oxford: Basil Blackwell, 1989
৮. আসহাবুর রহমান, *বাঙলাদেশের কৃষিকাঠামো : কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ৪০
৯. Warde, A., *Consumption, Food and Taste*, London: Sage, 1997
১০. সিকদার আবুল বাশার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০
১১. Mennell, S., Murcott, A. and Van Otterloo, A.H., *The Sociology of Food: Eating, Diet and Culture*, London: Sage, 1992
১২. Barthes, R., Toward a Psycho-sociology of Contemporary Food Consumption, In R. Forster & O. Ranum (eds.), *Food and Drink in History*. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
১৩. Barthes, R, Ibid,1979
১৪. Jelliffe, D.B., `Parallel Food Classification in Developing and Industrialized Countries`, *American Journal of Clinical Nutrition* 20:279–81, 1967
১৫. সেলিম অর্ণব, 'আদি খাবার ভাত', ২০১৪, <https://aurnabarc.wordpress.com/2014/03/28/rice-eating-history/> aceess on 05 June, 2017
১৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ভূগোল : বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৮
১৭. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর, ২০০৮, পৃ. ৪৮৩
১৮. মিলন দত্ত, *বাঙালির খাদ্যকোষ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ১৩৬
১৯. প্রণব রায়, বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১১, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৬
২০. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬-১৪৭

২১. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮
২২. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০
২৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৩
২৪. বাংলাপিডিয়া, 'ধান', *বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৪৩৩
২৫. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৩
২৬. 'প্রথম আলো', ভাত খাওয়ার শীর্ষে চীন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৩
২৭. তাহেরা ইসলাম এবং এম ইসলাম, 'বাঙ্গালীর ভাত খাওয়া কমেছে', *কৃষি প্রতিক্ষণ*, ২০ আগস্ট, ২০১৬ <http://krishiprotikhon.com/5084/> access on 22 May 2017
২৮. সেলিম অর্ণব, *পূর্বোক্ত*
২৯. বিশ্বজিৎ রায়, 'বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসে কত না ঘাটের জল', *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল, ২০১৬
৩০. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩
৩১. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৪
৩২. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০
৩৩. বাংলাপিডিয়া, 'খাদ্যাভ্যাস', *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৬৩
৩৪. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাঙালির ভোজন ও বাছবিচার: সমাজ ও সাহিত্যে', *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS),* V. III, Issue. IV, January 2017
৩৫. উদ্ধৃত, আসহাবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮
৩৬. ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬
৩৭. মিলন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩
৩৮. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪
৩৯. আতিয়ার রহমান, *দক্ষিণ বাংলার অভিজাত শ্রেণী*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১০, পৃ. ১৮১
৪০. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯২
৪১. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
৪২. মিলন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪০
৪৩. উদ্ধৃত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'কালাকেতুর ভোজন', *সাহিত্য পাঠ (গদ্য ও কবিতা)*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫, পৃ. ২২১
৪৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪
৪৫. রফিক আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৪৬. পাপড়ি রহমান, 'বাবার ভাত', *বাংলার কণ্ঠ*, অস্ট্রেলিয়া, ২০১৬ <http://banglarkantha.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8/> access on 22 July, 2016.
৪৭. ঐ
৪৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ১৪২

৪৯. ঐ, পৃ. ১৪৩
৫০. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কাজী সিরাজুল ইসলাম, মো. জাহিদ হোসেন (সম্পাদনা), *বাংলাদেশ: প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার,* শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা: বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী, ২০১৭, পৃ. ১৬৩-১৬৭
৫১. ঐ, পৃ. ১৬৩
৫২. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ২৭০
৫৩. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কাজী সিরাজুল ইসলাম, মো. জাহিদ হোসেন (সম্পাদনা), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬
৫৪. সামিয়ূম বাছির আরিফ, 'বঙ্গবন্ধু দ্যা গ্রেট', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ আগস্ট, ২০১৭
৫৫. নির্ঝর নৈঃশব্দ (সম্পাদনা), *ওঙ্কারসমগ্র: বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১৭, পৃ. ১৬
৫৬. আনিসুল হক, *মা*, ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ২৩৫
৫৭. রফিক আজাদ, 'ভাত দে হারামজাদা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৭, পৃ. ৩৬-৩৭
৫৮. '৪০ বছর পর ভাত খেলেন বঙ্গবন্ধু প্রেমিক হারুন', দৈনিক যুগান্তর, ১৪ আগস্ট, ২০১৫
৫৯. ধীমানপূরবী, 'ভাত', ২০১৭ <http://banglarkobita.com/poem/view/20730/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4> access on 18 July, 2017.
৬০. জয়া ফারহানা, 'সুখের নাম ধবধবে ভাত', দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, পৃ. ৭
৬১. বাংলাপিডিয়া, 'দুর্ভিক্ষ', *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ১৭২
৬২. দীপঙ্কর আরশ, 'যুগ অভিঘাতে দুই কবি ও কাব্য: চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম) ও অন্নদামঙ্গল' (ভারতচন্দ্র), *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS),* Volume-III, Issue-I, July 2016, p. 50
৬৩. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯০
৬৪. দীপঙ্কর আরশ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩
৬৫. প্রণব রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০
৬৬. উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা: বুক ওয়ার্লড, ১৯৯৬, পৃ. ১২
৬৭. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ১০৬
৬৮. বাংলাপিডিয়া, *পূর্বোক্ত*, ১৭৩
৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মানুষ' , *সঞ্চিতা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭২, পৃ. ৫৯
৭০. ঐ, 'আমার কৈফিয়ত', পৃ.৭২
৭১. সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'ঐতিহাসিক' , *ছাড়পত্র*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ৪৮
৭২. মহাদেব সাহা, 'জুঁইফুলের চেয়ে সাদা ভাতই অধিক সুন্দর', *নির্বাচিত ২০০ কবিতা*, ঢাকা: বিভাস, ২০১৫, পৃ. ৪০-৪১
৭৩. জুয়েল মোস্তাফিজ, *ভাতের ভূগোল*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১০, পৃ. ৯
৭৪. বাংলাপিডিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২
৭৫. মিলন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬
৭৬. ধীমানপূরবী, *পূর্বোক্ত*
৭৭. কালের কণ্ঠ, 'স্বামীকে ছাড়া এক বেলাও ভাত খাননি তিনি', ৭ জুন, ২০১৭

৭৮. ঐ

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শাস্তি', *গল্পগুচ্ছ*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৪, পৃ. ১১৬

৮০. মাকসুদা আজীজ, *পূর্বোক্ত*

৮১. বাংলা একাডেমি, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*, ২০১৪, পৃ. ২৩৩

৮২. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'নবান্ন', *সাহিত্য পাঠ (গদ্য ও কবিতা)*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৫, পৃ. ২৬০

৮৩. বাংলাপিডিয়া, 'নবান্ন', *বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৪৯৮

৮৪. জগন্নাথ বড়ুয়া, 'বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান', ২০১৪ <http://nirvanapeace.com/buddhism-philosophy/buddhism-science/878> access on 26 May, 2017

৮৫. মিলন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৮৬. মিলন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৮৭. জগন্নাথ বড়ুয়া, *পূর্বোক্ত*

৮৮. মিলন দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

৮৯. ঐ, পৃ. ১৭-১৮

৯০. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৯১. বরুণ কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদনা), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৫, পৃ. ২০

৯২. 'সনাতন ভাবনা ও সংস্কৃতি, নিত্যকর্ম', ২০১৭ <http://sonatonvabona.blogspot.com/2015/07/nittokormoo.html> access on 17.05.2017

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

বাংলার প্রযুক্তি : প্রসঙ্গ চাকা

মো. শাহিনুর রশীদ*

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা হলো চাকা আবিষ্কার। এ আবিষ্কার উৎপাদন ব্যবস্থায় অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার ও সভ্যতার বিকাশকে গতিশীল করে। তাই পৃথিবীর সর্বত্রই সমাজের গতি-প্রকৃতি ও কাঠামোর স্বরূপ অনুধাবনের জন্য চাকার অধ্যয়ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসে চাকার উল্লেখ নাই বললেই চলে। তাই বাংলার মানুষ চাকা বা চাকাযুক্ত গাড়ির ব্যবহার কখন শুরু করেছে, সে প্রযুক্তির উৎস কোথায়, তার বিবর্তনের পথ-পরিক্রমা কেমন ছিল, মানুষের জীবনে তা কতটা প্রভাব ফেলেছিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এসব উত্তর জানার জন্য, প্রেক্ষাপট হিসাবে বাংলা অঞ্চলে চাকার আবির্ভাব ও বিবর্তনের আলোচনা জরুরি। সংশ্লিষ্ট তথ্যের ঘাটতি থাকলেও বাংলা শব্দের-ইতিহাসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এই বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। সে অন্বেষণে দেখা যায় বাংলা অঞ্চলে চাকা ও গাড়ির সঙ্গে এই অঞ্চলে আর্যপূর্বযুগে বসবাসরত অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সূচক-শব্দ : বাংলা, ইতিহাস, প্রযুক্তি, চাকা, গাড়ি, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়।

যান-নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থায় জলপথের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে স্থলপথে যান-নির্ভর যোগাযোগের জন্য মানুষকে চাকা আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। সভ্যতার প্রায় সকল পরিচায়ক আবিষ্কারের পর মানুষ চাকার ব্যবহার শেখে; শেষ-পর্বের হলেও চাকা মানব সভ্যতায় সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। চাকা আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে আধিপত্য বিস্তারের প্রকৃতি ও উৎপাদনের কৃৎ-কৌশলে পরিবর্তন অবধারিত ছিল। ফলে ধন-উৎপাদনও বাড়ন্ত হয়। সে প্রেক্ষাপটে বাংলার মানুষ চাকা বা চাকাযুক্ত গাড়ির ব্যবহার কখন শুরু করে, সে প্রযুক্তির উৎস কোথায়, এর বিবর্তনের পথপরিক্রমা কেমন ছিল, মানুষের জীবনে তা কতটা প্রভাব ফেলেছিল প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর জানা বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সারা বিশ্বের ইতিহাসে চাকা বা চাকাভিত্তিক যানের আবির্ভাব এবং সে প্রযুক্তির চর্চা গুরুত্ব পেলেও বাংলার ইতিহাসে চাকা বা চাকাভিত্তিক যানের আবিষ্কার, এর ব্যবহার, উৎপাদন ব্যবস্থায় ও সমাজে এর প্রভাব বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট তথ্যের

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

ঘাটতি[১] বাংলার প্রযুক্তির ইতিহাস-চর্চার প্রধান অন্তরায়। সাধারণভাবে ভৌত-প্রত্ন নিদর্শন ও সমকালীন সাহিত্য (কাব্য, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনি, চিঠি, নথিপত্র প্রভৃতি) ব্যতীত অন্য কোনো উৎসের তথ্য বাংলার ইতিহাস রচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়নি। তবে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'অন্য উৎস' ব্যবহার করে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।[২] সে ভিন্ন উৎসের অন্যতম হলো প্রত্ন-শব্দ (Archaeo-word)।[৩] বাংলা ভাষার প্রত্ন-শব্দ বা শব্দের ব্যুৎপত্তি (Etymology) চর্চার তথ্য ব্যবহার করে বাংলার সনাতন প্রযুক্তির ইতিহাস পুনর্গঠন করা অসম্ভব নয়।[৪] এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও ভৌত-প্রত্ন নিদর্শনের তথ্য চাকা বিষয়ক আলোচনা পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চাকার আবির্ভাব : সাধারণভাবে মনে করা হয়, মেসোপটেমীয় সভ্যতায় প্রথম চাকার আবির্ভাব ঘটে। তাদের ইউরুক (Uruk) শহরে প্রাপ্ত প্রায় তিনহাজার নয়'শ মাটির লিপি-ফলকের চিত্র-লিপিতে (pictograph) তিনবার চাকাওয়ালা (চিত্র ১) এবং আটত্রিশবার শ্লেজ (sledge) টানা গাড়ির চিহ্ন বা প্রতীক রয়েছে। এসব ফলকের কাল নির্ণয় করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ৩৩৭০ অব্দ।[৫] প্রায় একই সময়ের চাকাওয়ালা গাড়ির নিদর্শন পাওয়া গেছে উত্তর জার্মানির ফ্লিন্টবেক (Flintbek) সমাধিতে।[৬] এছাড়া দক্ষিণ পোল্যান্ডের Bronocice শহরে পাওয়া গেছে চাকাওয়ালা গাড়ির খোদাই চিত্র সম্বলিত ভাঙা পাত্র (চিত্র ২)।[৭] এর সময় খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দ।[৮] হাঙ্গেরি থেকে এর আরো কয়েক'শ বছর পরের (খ্রি. পূ. ৩৩০০-৩১০০) চাকাযুক্ত সিরামিক-মগ পাওয়া গিয়েছে (চিত্র ৩)।[৯] এর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ অব্দের প্রায় ২৫০টি চাকা ও চাকাযুক্ত গাড়ি পাওয়া গেছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের তৃণভূমিতে (চিত্র ৪)।[১০] চাকাগুলোর অধিকাংশই কাঠের তক্তা জোড়া লাগিয়ে তৈরিকৃত ও নিরেট ধরনের।[১১] মেসোপটেমীয় এক শহর উর-এর রাজকীয় সমাধিতে পাওয়া গেছে চাকাযুক্ত গাড়ির দৃশ্য সম্বলিত খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫০-২৫৫০ সালের প্রস্তর ফলক (চিত্র ৫)।[১২] উর-এর আর এক সমাধিক্ষেত্রে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫৫০-২৪০০ সালের একটি কাঠের বাক্স পাওয়া গেছে। এতে চাকাযুক্ত গাড়ির অপূর্ব দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে (চিত্র ৬)।[১৩] উর-এ চাকাযুক্ত আরো প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সবগুলোতেই দেখা গেছে, চাকা আরাহীন (spokless)- নিরেট। চাকাগুলো দুটি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। তবে আনাতলিয়াতে প্রাপ্ত নিদর্শন সর্বপ্রথম আরাযুক্ত চাকাওয়ালা গাড়ির প্রথম উদাহরণ।[১৪] সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে Ugarit-এ প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ১৫-১৪ শতকের স্বর্ণের থালায় যুদ্ধ-দৃশ্যে চাকাওয়ালা গাড়িতে আরাযুক্ত চাকা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (চিত্র ৭)।[১৫] মেসোপটেমিয়া অঞ্চল দখলকারী অ্যাসেরীয়রা আরাযুক্ত চাকার গাড়ি ব্যবহার করত (চিত্র ৮)। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ সালের হিট্টাইট প্রত্ননিদর্শনেও দেখা যায় আরাযুক্ত দুই চাকা বিশিষ্ট যুদ্ধ রথ (চিত্র ৯)।[১৬]

অন্যদিকে মিশরীয়রা অন্তত খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের পূর্বেই আরাযুক্ত চাকার ব্যবহার শেখে (চিত্র ১০)।[১৭] কিংবদন্তি অনুসারে চীনে খ্রিস্টপূর্ব ২২০৫-২১৯৭ সালে চাকাযুক্ত গাড়ি ব্যবহৃত হতো। তবে সে দেশের অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন, এর উপযুক্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তারিখ খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ সাল।[১৮] সম্ভবত সে চাকা ছিল নিরেট প্রকৃতির। আরাযুক্ত কাঠের চাকার প্রচলন শুরু হয় আরো কয়েকশ বছর পর।[১৯]

ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতাতেও চাকা এবং চাকাবিশিষ্ট গাড়ির ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে রাভি-পর্বে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের খেলনা গাড়ি[২০] পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী হরপ্পান-পর্বে খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০-১৯০০ অব্দে আরাযুক্ত চাকাও দৃষ্ট হয়।[২১] শুধু চাকা নয় সেখানে প্রাপ্ত চাকাওয়ালা খেলনা গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর (চিত্র ১১)।[২২] সিন্ধুর রাস্তাসমূহও চাকাযুক্ত যান চলাচলের জন্য উপযুক্ত ছিল।[২৩] যদিও অধিকাংশ চাকা ছিল নিরেট ধরনের, যে-রকম চাকা নিকট অতীত পর্যন্তও সিন্ধুতে ব্যবহৃত হতো।[২৪] একই মন্তব্য করেছেন M S Randhawa; তিনি কয়েক দশক পূর্ব পর্যন্ত সিন্ধুতে বহুল প্রচলিত গরুর গাড়ির নিরেট চাকা ও গাড়ির কাঠামো বিচারে সিন্ধুর খেলনা গাড়ির সঙ্গে কোনো পার্থক্য পাননি। শুধু তাই নয়, সিন্ধুর সে গাড়ির প্রশস্ততা হরপ্পায় গাড়ির চলাচলের রাস্তার প্রশস্ততার সমান (চিত্র ১২)।[২৫] বৌদ্ধ গ্রন্থেও গাড়ি বা চাকার পরোক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাপরিনির্বাণের দিন কুশিনারার পথে এক স্থানে বিশ্রামরত তেষ্টায় কাতর গৌতম বুদ্ধ পানি চেয়েছিলেন।[২৬] আনন্দ তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললেন– প্রভু, একটু পূর্বে অনেক গাড়ি নদী অতিক্রম করেছে। প্রায় ৫০০ গাড়ির চাকার ঘর্ষণের কারণে অগভীর পানি স্রোত এখন ঘোলাটে ও কর্দমাক্ত।[২৭] উল্লেখ করা যেতে পারে গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ সালে।[২৮] খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে (২৪১-৫০) নির্মিত[২৯] সাঁচি-স্তূপে আরাযুক্ত চাকাওয়ালা যানের দৃশ্য দৃষ্ট হয় (চিত্র ১৩)।[৩০] তবে এ দৃশ্যটি নির্মিত হয় সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দে।[৩১] ইনামগাঁয়ে (মহারাষ্ট্র, ভারত) প্রাপ্ত একটি মাটির পাত্রে চাকাওয়ালা গরুর গাড়ি অঙ্কিত হয়েছে (চিত্র ১৪)। মাটির পাত্রটি খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৫০০ অব্দের।[৩২] দেবী দুর্গা-সংশ্লিষ্ট রচনাতেও গরুর গাড়ির উল্লেখ আছে।[৩৩]

বাংলা অঞ্চলে চাকা ব্যবহারের পটভূমি : ভৌগোলিক কারণে বাংলায় যানভিত্তিক চলাচলের জন্য জলপথ অধিক কার্যকর ছিল– আধুনিকযুগের পূর্বে বিশেষত মধ্যযুগ, প্রাচীনযুগ বা তারও আগে; এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে, জলপথে ভেলা বা ডিঙা ও নৌকাযোগে যাতায়াত করতেন।[৩৪] তবে স্থলপথের যোগাযোগ বিশেষত চাকাযুক্ত যানভিত্তিক চলাচল যে ছিলই না, তেমন নয়। ঐতিহাসিক রায় উল্লেখ করেছেন স্থলপথে গ্রাম হতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাওয়ার জন্য লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গরুর গাড়ি।[৩৫] বসার আসনের সাথে চক্র বা চাকা সংযুক্ত করে প্রথম যে-যানের সৃষ্টি হয় তারই নাম ছিল রথ। রথ প্রথমে গরুর দ্বারা বাহিত হতো। গরুর পর অশ্ব রথ বহন

করত। গরু টানত বলে তখন তার নাম ছিল শকট বা গো-রথ।[৩৬] হয়ত এরূপ রথ এখনও প্রত্ন-নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাংলা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে গাড়ি বা চাকার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, চন্দ্রকেতুরগড়ে প্রচুর খেলনা-গাড়ি পাওয়া গেছে। হাতি চালিত খেলনা-গাড়ির সংখ্যা ১৪, সবগুলোই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের।[৩৭] রাম-খেলনা-গাড়ি পাওয়া গিয়েছে ২৫টি, যার ১৫টি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের, ৬টি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের এবং অন্য চারটির কাল নির্ণয় করা যায়নি।[৩৮] অশ্বচালিত খেলনা-গাড়ির সংখ্যা ৮। এর প্রায় সবগুলোই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের।[৩৯] ময়ূরাকৃতির খেলনা-গাড়ি ৫টি; এর দুটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের।[৪০] বাঘাকৃতির ৫টি, মকরাকৃতির ১টিসহ অন্যান্য খেলনা-গাড়ির সংখ্যা ১২। এগুলো খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের।[৪১] চন্দ্রকেতুর গড়ে এসব খেলনা গাড়ি ছাড়াও অশ্ব-চালিত রথের চিত্রসম্বলিত টেরাকোটাও পাওয়া গিয়েছে । এরূপ টেরাকোটার সংখ্যা অন্তত চার। এর একটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং অন্যগুলো খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের। এসব টেরাকোটা-চিত্রে দুই চাকাবিশিষ্ট অশ্ব-চালিত আরোহীসহ গাড়ির দৃশ্য ফুটে উঠেছে। কোনো কোনো গাড়ি চার-ঘোড়া চালিত (চিত্র ১৫)।[৪২] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও গ্রিক ঐতিহাসিকের বিবরণ সূত্রে উল্লেখ করেছেন প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরাশ্ববাহিত রথ ছিল।[৪৩] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই বাংলার মানুষ চাকাযুক্ত যানের সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিল না বরং চাকাযুক্ত গাড়ি তৈরিতেও দক্ষতা অর্জন করেছিল। শেষোক্ত ঘোড়াচালিত টেরাকোটা-চিত্র দৃষ্টে মনে হয়, চাকা আরাযুক্ত এবং গাড়ির কাঠামো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ির ন্যায়। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি খেলনা গাড়িতে যুক্ত চাকা[৪৪] এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের স্বতন্ত্র একটি খেলনা গাড়ির চাকার[৪৫] প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে (চিত্র ১৬ ও ১৭)। চাকা দুটি দৃষ্টে মনে হয়, সমকালীন চাকায় আরা যুক্ত ছিল– এই অভিমত আরো স্পষ্ট জোরালো হয়। বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকের সে চাকায় আরা, পুঠি (felloe/part of rim), ধুরি (axle) প্রবেশের ছিদ্র স্পষ্ট।[৪৬] অপরদিকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের অন্য খেলনা গাড়ির মধ্যে সমকালীন জনসধারণের ব্যবহৃত গাড়ির অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায় (চিত্র ১৭)।[৪৭] জনসাধারণের ব্যবহৃত গাড়ির অবয়ব আরো স্পষ্ট হয়েছে বগুড়ার পলাশবাড়ী থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক ৬-৭ শতকের টেরাকোটায় (চিত্র ১৮)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভরত চাকাবিশিষ্ট মকরযানে অযোধ্যা যাত্রা করেছেন।[৪৮] যানটি অন্তত চার চাকাবিশিষ্ট, তবে চাকাগুলো নিরেট এবং ঝুরিতে খিল দ্বারা আবদ্ধ। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও উল্লেখ করেছেন, গরুর গাড়ির চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও সেরূপ ছিল।[৪৯] তবে প্রশাসনিক বা রাজকীয় গাড়ির আকার-আকৃতি মনে হয় সবসময়ই পৃথক ছিল। ১৭ শতকের বর্ধমান জেলার কেন্দুর গ্রামের একরত্ন এবং ১৮ শতকের কান্তজীর মন্দিরের টেরাকোটায় চিত্রিত গাড়ির দৃশ্য অন্তত সে কথাই বলে (চিত্র ১৯ ও ২০)।

এসব প্রমাণের মাধ্যমে চাকার প্রাচীনত্ব বাংলা অঞ্চলে সর্বাতীত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। জ্ঞাত তথ্য মতে, চাকা বিষয়ে এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে চাকা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আরো অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে চাকা সংশ্লিষ্ট বাংলা শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক (etymologycal) তথ্য ও এগুলোর সামাজিক ব্যাখ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। সংশ্লিষ্ট শব্দ নির্বাচনের জন্য প্রথমে চাকা ও গাড়ির অংশসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমদিকে রবীউদ্দিন আহমদ প্রথম বাংলার গাড়ির (গরুর গাড়ি) অংশসমূহের নাম নথিবদ্ধ করেন।[৫০] এর পূর্বে George Abraham Grierson[৫১] বিহারে প্রচলিত গাড়ির অংশসমূহ চিহ্নিত করেন। মূলত জনাব আহমদ George Abraham Grierson কর্তৃক প্রভাবিত হয়েই মুর্শিদাবাদে প্রচলিত গরুর গাড়ির ২৩টি বিশিষ্ট অংশের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে চাকা সংশ্লিষ্ট শব্দের সংখ্যা দশ।[৫২] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চাকা। চাকা কাঠের তৈরি হলেও সাধারণ ছুতাররা তা তৈরি করতে পারে না। এর জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণির কাঠমিস্ত্রি আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে এদের 'প্যাঁইহা মিস্ত্রি' বলে। তারা চাকা ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু তৈরি করেন না।[৫৩] বরেন্দ্র অঞ্চলে সাধারণত দুই ধরনের চাকা দেখা যায়। এদের একটি শালপায়া অন্যটি দেশি বা দেওড়া চাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়। শালপায়া চাকা আকারে ছোট এবং পাতলা; তাই হালকাও বটে। এই চাকা হাল (iron band) ছাড়া তৈরি সম্পন্ন হয় না। হাল হলো চাকার বহিরবৃত্তে লোহার বেষ্টনী। আর দেশি চাকা সাধারণত বড় ও মোটা, এর ওজনও বেশি। হাল ছাড়াও এ চাকা ব্যবহার করা যায়।

চাকার প্রধান অংশ তিনটি। সে তিনটি অংশ লাহা, আরা ও পুঠি (চিত্র ২১)।[৫৪] চাকার কেন্দ্রস্থ ঢোলের ন্যায় কাষ্ঠ-খণ্ডের নাম লাহা (hub)। লাহা বরেন্দ্র অঞ্চলে হাঁড়ি, পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বেলুন নামে পরিচিত। লাহার মাঝ বরাবর এপাশ-ওপাশ গোল ছিদ্র (hub's hole for axle) করা হয়; এই ছিদ্র করা হয় গাড়ির অক্ষদণ্ড (axle) প্রবেশ করানোর জন্য। এই অক্ষদণ্ডের দুইদিক দুই চাকাকে সংযুক্ত করে। এই অক্ষদণ্ড ধূর, ধুরো, ধুরা, ঝুরি, ধুর প্রভৃতি নামে পরিচিত। পশ্চিম বাংলার উপভাষায় 'লিগা' নামেও পরিচিত।[৫৫]

'লাহা'র মাঝামাঝি অংশ ঢোলের মতো একটু স্ফীত। স্ফীত অংশের পৃষ্ঠদেশে ছিদ্র করে সমদৈর্ঘ্যের কাষ্ঠ-দণ্ড সংযুক্ত করা হয়, এই দণ্ডই আরা (spoke)। আরা অর ও চাকার পাখি নামেও পরিচিত। আরার সংখ্যা ও বিন্যাসে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। লোকবিদ ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, আরার সংখ্যা তিন জোড়া [মোট ১২টি], সেগুলো সমদূরত্বে এপাশ-ওপাশ করে সংযুক্ত। কিন্তু রবীউদ্দিন আহমদ চাকার যে ছবি দিয়েছেন তাতে আরার সংখ্যা ৮। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*-এর মতে, আরার সংখ্যা তিন জোড়া এবং তা সবসময় এপাশ-ওপাশ করে সংযুক্ত হয় না।[৫৬] বরেন্দ্র অঞ্চলেও এই কাষ্ঠ-দণ্ড আরা নামে পরিচিত, তবে পূর্বোল্লিখিত

দুই প্রকারের চাকায় ভিন্ন সংখ্যায় আরা সংযুক্ত হয়। সে সংখ্যা কখনও তিন জোড়া, কখনও বারোটি আবার কখনও চৌদ্দটি। চাকায় আরার বিন্যাস প্রধানত দুই ধরনের; স্বতন্ত্র-আরা বিন্যাস এবং জোড়া-আরা বিন্যাস (চিত্র ২২)।

আরার বাইরে বক্রাকার (বৃত্তচাপ) কাঠ সংযুক্ত করে চাকার বেষ্টনী দেওয়া হয়। এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম পুঁঠে বা পুঁটে (felloe/ part of rim)। ওয়াকিল আহমদ একে পুঠি, পুঁটে ও নেমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫৭] বরেন্দ্র অঞ্চলে এর নাম সেঁতি, যশোরে পুটে, কুমিল্লায় পুঁটে। এদের সংখ্যা আরার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আরা তিনজোড়া হলে পুঠির সংখ্যা হয় ছয়, তবে আড়ার সংখ্যা ১৪ হলে পুঠির সংখ্যা সাত অর্থাৎ প্রতি দুই আরাতে একটি পুঠি সংযুক্ত থাকে। পুঠিগুলি ভেতরের দিক থেকে ছিদ্র করে আরার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এগুলি সমান ও সঠিক মাপের হয়ে থাকে; খিল দ্বারা একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া দেওয়া হয়। এই খিল এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যে, তা বাইর থেকে দেখা যায় না। এ খিলের নাম চুল।[৫৮] এছাড়া পুঁটের সঙ্গে আরার সংযোগ দৃঢ় করার জন্য এক প্রকার খিল ব্যবহার করা হয়। এই খিল মুর্শিদাবাদে পচড়া এবং এই ধরনের ছোট খিল ময়মনসিংহে পচি নামে চিহ্নিত হয়।

চাকার ক্ষয়রোধ ও চাকাকে শক্ত করা জন্য লোহার বলয় (iron band) পরিয়ে দেওয়া হয়, এই বলয়কে রবীউদ্দিন আহমদ হা'ল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, বরেন্দ্র অঞ্চলেও এটি হাল নামে পরিচিত; যদিও ওয়াকিল আহমদ একে পত্‌রা বলেছেন।[৫৯] চাকায় হাল দেওয়া হবে কিনা তা পূর্ব নির্ধারিত। এজন্যই চাকার বৃত্তের বহিরাংশও দুই ধরনের হয়ে থাকে (চিত্র ২৩)। বৃত্তের পৃষ্ঠদেশ সমতল হলে বুঝতে হবে এতে হাল তোলা হবে। আর পৃষ্ঠদেশ কিছুটা অর্ধ-বৃত্তাকার হলে, তাতে হাল তোলা হয় না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চাকা কাঠমিস্ত্রি তৈরি করে থাকলেও তাঁরা চাকায় হাল তোলেন না, সাধারণত চাকায় হাল তোলেন কামার। লোহার বলয় আগুনে গরম ও নমনীয় করে চাকায় পরানো হয়।

চাকা ও সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তথ্য ও ব্যাখ্যা : গাড়ি শব্দটি আর্যপূর্ব ভাষা থেকে আগত।[৬০] পূর্বেই বলা হয়েছে, গাড়ি প্রথমে রথ নামে পরিচিত ছিল এবং সে রথ গরু দিয়ে চালিত হতো। এজন্যই তার নাম গো-রথ, গো-শকট বা শকট। বাংলা অভিধান মতে, শকট শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে {সংস্কৃত শক্‌+অট (অটন্‌)}। পূর্বে উল্লেখিত প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে জানা যায়, আর্য-পূর্ব সময় থেকেই সিন্ধু অঞ্চলে চাকাযুক্ত গাড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সে দৃষ্টিতে শকট শব্দটি আরো পূর্ব উৎস থেকে নীত। অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালি শব্দ সগড়-এর অর্থ কাঠের তক্তা ও কাঠের বেড় দিয়ে প্রস্তুত চাকা বা ওই রকম চাকা যুক্ত গাড়ি।[৬১] সগড় ও শকট-এর সম্পর্ক প্রগাঢ়। তার প্রমাণ চাকা সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দও অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। যেমন, চাকার আরা বা অর তামিল তিরুনেলবেল্লি উপভাষায় অরকল্লু; তামিল পদয়চি উপভাষায় আরাকলু সমার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৬২] গাড়ির অক্ষদণ্ড যা পশ্চিম বাংলার উপভাষায় 'লিগা' নামে পরিচিত, তা

সাঁওতালি শব্দ নিঙ্ঘা থেকে এসেছে; যার অর্থ গরুর গাড়ির নিগা বা অক্ষদণ্ড।[৬৩] পূর্বেই বলা হয়েছে এই অক্ষদণ্ডের আরেক নাম ধুরি। ধুরি শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।[৬৪] এছাড়া আড়াস্, আড়াসন– যা ধানের আঁটি বা খড় বোঝাই গাড়ির উপর বেঁধে রাখা বাঁশ বা শাল গাছের দণ্ডের নাম; টাড়া বা তাড়া যার অর্থ কাঁধে ভার ঝোলানোর লম্বা বাঁশ বা শস্য বোঝাই গাড়ির উপরের চাপ দিয়ে বেঁধে রাখার বাঁশ। এই আড়াস্, আড়াসন, টাড়া বা তাড়া শব্দের সঙ্গে সাঁওতালি শব্দ *আঁড়িস* ও *আঁড়ি'চ* শব্দের সম্পর্ক রয়েছে; যার অর্থ বিরুদ্ধতা।[৬৫] বাংলা শব্দ আড়া-আড়ির উৎপত্তিও সম্ভবত সে-শব্দ থেকে। উল্লেখ্য যে, মাঠে ধান কেটে গাড়িতে বোঝাই করে বোঝাই-এর উপর আড়া-আড়ি করেই আড়াস্, আড়াসন, টাড়া বা তাড়া চাপ দিয়ে বাঁধা হয়।[৬৬] মতান্তরে, 'আড়া' কড়িকাঠ বিশেষ, খড় বোঝাই গাড়ির উপরে বাঁধার বাঁশ বা কাঠের দণ্ড অর্থে দ্রাবিড় থেকে আগত।[৬৭] এছাড়া সাঁওতালি শব্দ টাপোর অর্থ মাথা বা ঘাড়ের বস্ত্রাবরণ, পশু বাহিত বা দুই চাকার গাড়ির আচ্ছাদন[৬৮]; উলাড় শব্দের অর্থ বোঝাই গরুর গাড়ির পিছনের দিক ভারি হলে সামনের অংশ উপরে উঠে যাওয়া[৬৯]; দ্রাবিড় শব্দ উদল অর্থ খড়-বোঝাই গাড়ির ওপর বাঁধার বাঁশের দণ্ড[৭০]। এই প্রসঙ্গে বাংলার লোকজ খেলনা টমটম গাড়ি– যা শব্দ করে বা বাদ্য বাজিয়ে চলে, সে গাড়ির কথা বলা যেতে পারে (চিত্র ২৪); এই টমটম শব্দটি মনে হয় দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। তামিল কোল্লিমলাই উপভাষায় তমপট্টম (বাদ্যযন্ত্র), তামিল ভাষায় টুটুমি সমার্থক। তেলেগু শব্দ তমুকু (বাদ্য বিশেষ) বা তুটুমু, কন্নড় শব্দ তুড়ুমু সমার্থ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৭১] উল্লেখ্য তামিল, তেলেগু, কন্নড় ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, গাড়ি শব্দটি যান বা শকট অর্থে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত কন্নর ও কোডগু ভাষায় গাড়ি রূপেই ব্যবহৃত হয়।

চাকা ও চাকা সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের ভাষাতাত্ত্বিক এই ব্যাখ্যা শব্দসমূহের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে বাংলা অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রধান।[৭২] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের[৭৩] দিকে উত্তর ভারতে বসতি স্থাপনের অনেক পরে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্তযুগের পূর্বে[৭৪] বাংলা অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রাই ছিলেন প্রধান জনগোষ্ঠী।[৭৫] এদের ভাষা যথাক্রমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা নামে পরিচিত। অস্ট্রিক ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে মুণ্ডারি ভাষা যা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, কোরবু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে থাকে।[৭৬] অপরদিকে দ্রাবিড় ভাষার উত্তরসূরী হল : গোণ্ড, মালের, কুই (খন্দ), ওরাওঁ (কুড়ুখ) ভাষা।[৭৭] এছাড়া এই অঞ্চলের অপর প্রাচীন ভাষা হল ভোট-চিনীয় বা ভোট-ব্রহ্ম; এই ভাষার বর্তমান প্রতিনিধি মেচ, বরা, রাভা, টিপুরা, বোডো প্রভৃতি ভাষা।[৭৮] আর যেহেতু চাকা ও চাকা-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ শব্দ আর্যপূর্ব ভাষাগোষ্ঠী হতে আগত, তাই বলা যেতে পারে চাকা ও চাকাভিত্তিক যোগাযোগ-সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্কের সূত্র ধরে অনুমান অমূলক নয় প্রাচীন যুগে এবং তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষ যান চলাচলের ক্ষেত্রে চাকাভিত্তিক কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার জানত। সম্ভবত আর্য-পূর্বযুগ থেকেই বাংলা অঞ্চলে আরা বিশিষ্ট চাকা ব্যবহৃত হতো।

যদিও চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত খেলনা চাকায় প্রত্যক্ষভাবে আরা স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে, খেলনা গাড়ির চাকা ছোট, সে ছোট চাকায় আরা যুক্ত করা যৌক্তিক ছিল না। কেননা তাতে চাকা অধিক ভঙ্গুর হয়ে যেত। আর দ্বিতীয়ত, বর্তমানেও খেলনা গাড়িতে বিশেষত মাটির তৈরি গাড়িতে যে চাকা লাগানো হয়, সে চাকাও আরা যুক্ত নয় (চিত্র ২৪)। এসব বিচারে বলা যেতে পারে, চাকাযুক্ত যানবাহন ও তৎভিত্তিক পরিবহণ সংস্কৃতির সভ্যতা উদ্ভাবনে বা বিকাশে আর্যপূর্বযুগে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যা পণ্ডিতদের "আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা সভ্যতার আলো পেয়েছিল এবং আর্য-পূর্ব যুগে বাংলার জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা ও সভ্যতা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল"[৭৯]– এ অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নব্যপ্রস্তর যুগে বাংলা অঞ্চলে কৃষির ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার বেশকিছু স্থানে নানা প্রজাতির ধান চাষের প্রমাণ রয়েছে। লৌহযুগেও বিভিন্ন প্রজাতির ধানসহ তৈলবীজ চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সময়ে যেসব কৃষিপণ্যের নাম পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ধান, তৈলবীজ, ডালশস্য, আখ, তুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৮০] পশ্চিমবঙ্গের মহিষদল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮০-৮৫৫ অব্দের পোড়া ধানের অঙ্গার আবিষ্কৃত হয়েছে।[৮১] চন্দ্রকেতুর গড়-এ ফসল-কাটা উৎসবের চিত্র সম্বলিত খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতকের পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে।[৮২] মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শিলালিপিতেও ধান ও তৈলবীজের উল্লেখ রয়েছে।[৮৩] তাই বলা যেতে পারে, প্রাচীনযুগে এবং তৎপূর্ব থেকেই ফসল পরিবহণে বিশেষত মাঠ থেকে ধান সংগ্রহ করতে গরু বা মহিষের গাড়ির প্রয়োজনীতা ছিল (চিত্র ২৫)।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাচীনযুগ থেকেই বাংলার মানুষ চাকাযুক্ত গাড়ি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। যা আর্য-পূর্ব অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সময় থেকেই অব্যাহত ছিল। সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তা সাযুজ্যপূর্ণও বটে। যুদ্ধ-রথ, রাজকীয় বা অভিজাত পরিবহণে সম্ভবত বিশেষ ধরনের চাকাযুক্ত গাড়ি, তবে সাধারণ মানুষের জন্য শস্য ও যাত্রী পরিবহণে স্থল-পথে গরু বা মহিষের চিরায়ত ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহৃত হতো। চাকা ও গাড়ি নির্মাণের প্রধান উপাদান কাঠ ও বাঁশ, যা বাংলা অঞ্চলে বরাবরই সুলভ ছিল। তবে চাকা-প্রযুক্তিতে বৈদেশিক প্রভাব ছিল না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা খ্রিস্টপূর্ব পনেরো ষোলো শতকের মধ্যে সারা বিশ্বে আরাযুক্ত চাকার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা অঞ্চলও তার ব্যতিক্রম ছিল না; অন্তত চাকা ও চাকা-সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের প্রাচীনত্ব সে সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়। চাকা ও চাকাওয়ালা গাড়ি নির্মাণ যে-কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সমাজে একদল অভিজ্ঞ মানুষের উপস্থিতি ছিল। যুগ যুগ ধরে এরা কাঠের কাজ করলেও বিশেষ পেশাজীবী হিসাবেই গণ্য হয়েছেন।

চিত্রাবলি

চিত্র ১: মেসোপটেমীয় ইউরুক (Uruk) শহরে প্রাপ্ত মাটির লিপি-ফলকের চিত্র-লিপিতে (pictograph) চাকাওয়ালা গাড়ির ছবি। সূত্র : David W. Anthony, *ibid*, p. 68

চিত্র ২: পোল্যান্ডের Bronocice শহরে প্রাপ্ত চাকাওয়ালা গাড়ির খোদাই চিত্র সম্বলিত ভাঙা পাত্র। সূত্র : Sławomir Kadrow & Piotr Włodarczak (ed.), *Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk's æSettlement studies..."*, Rzeszów: Institute of Archaeology, Rzeszów University, 2013, Cover

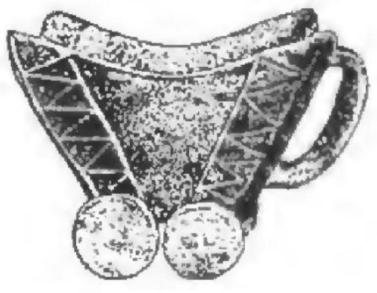

চিত্র ৩: হাঙ্গেরিতে প্রাপ্ত চাকাযুক্ত সিরামিকের মগ।
সূত্র : David W. Anthony, *ibid*, p. 68

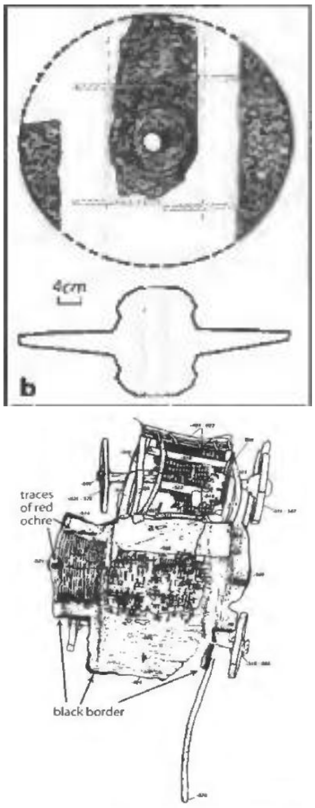

চিত্র ৪: রাশিয়া ও ইউক্রেনের তৃণভূমি থেকে প্রাপ্ত চাকা ও চাকাযুক্ত গাড়ির নমুনা। সূত্র : David W. Anthony, *ibid*, p. 70 & 71

চিত্র ৫: উর-এর রাজকীয় সমাধিতে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে দুই চাকার গাড়ির দৃশ্য। সূত্র : Joan Aruz & Ronald Wallenfels, *ibid*, p. 72

চিত্র ৬: উর-এর রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত কাঠের বাক্সের একদিকের প্যানেল ছবিতে চাকাযুক্ত গাড়ি। সূত্র : Joan Aruz & Ronald Wallenfels, *ibid*, p. 98 & 99. এ-ছবির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: C. Leonard Woolley & et al., *Ur Excavations: Volume II, The Royal Cemetry: A Report On The Predynastic And Sargonid Graves Excavated Between 1926 And 1931*, London: British Museum & Philadelphia: University Of Pennsylvania, 1934, p. 34-36

চিত্র ৭: সিরিয়ায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ১৫-১৪ শতকের স্বর্ণ-থালায় স্পোকযুক্ত চাকাওয়ালা রথ। সূত্র : Joan Aruz, Kim Benzel and Jean M. Evans (ed), Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C., New York, The Metropolitan Museum Of Art, 2008, Pl. No. 147

চিত্র ৮: এশেরীয় যুদ্ধ-রথ (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ)। সূত্র : https://yooniqimages.com/images/detail/100778873/Creative/stone-relief-from-the-palace-of-sennacherib

চিত্র ৯: হিট্টাইট রিলিফ চিত্র (খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ)। সূত্র : http://www.ancient.eu/image/1303/

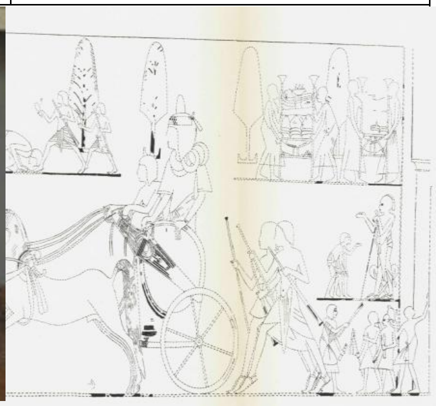

চিত্র ১০ : স্পোকযুক্ত মিশরীয় চাকা (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৪২-১৭৩৩)। সূত্র : Norman De Garis Davies, *The Tomb of Nefer-Hotep At Thebes*, Volume I, New York: MCMXXXIII, Plate XVI

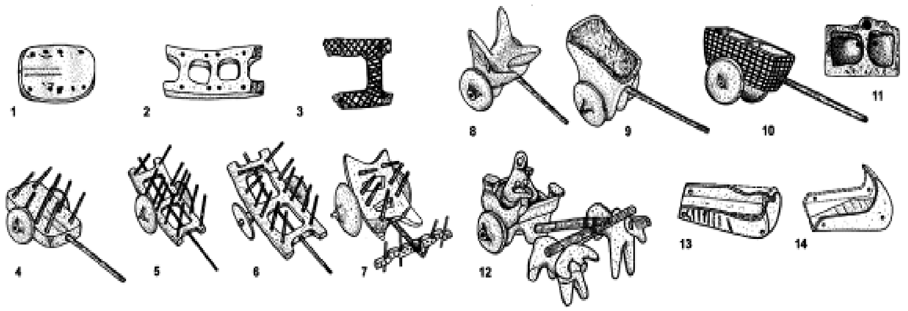

চিত্র ১১: সিন্ধুতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের গাড়ি। সূত্র : Jonathan Mark Kenoyer, æWheeled Vehicles of the Indus Valley..., *ibid* , Figure 6

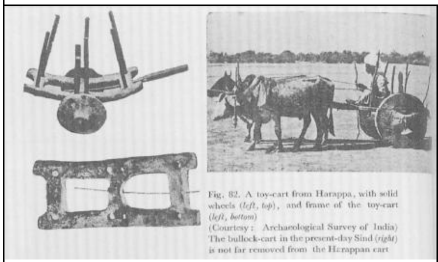

চিত্র ১২: বর্তমানে সিন্ধুতে প্রচলিত গাড়ির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত গাড়ির চাকা ও কাঠামোর সাদৃশ্য। সূত্র : M. S. Randhawa, *ibid*, Fig. 82

চিত্র ১৩: সাঁচি বৌদ্ধ-স্তূপে চিত্রিত স্পোকযুক্ত চাকাওয়ালা গাড়ি (খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দ)। সূত্র : Le Huu Phuoc, *ibid*, 2010, p. 153

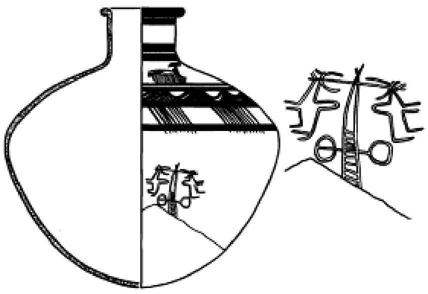

চিত্র ১৪: ইনামগাঁও-এ প্রাপ্ত পাত্রের গায়ে আঁকা গরুর গাড়ি (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ)। সূত্র : Jonathan Mark Kenoyer, æ Wheeled Vehicles of the Indus Valley...", *ibid* , Figure 17

চিত্র ১৫: দুই চাকা বিশিষ্ট চার অশ্ব-চালিত আরোহীসহ গাড়ির টেরাকোটা-চিত্র (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক), চন্দ্রকেতুরগড়। সূত্র : Enamul Haque, *ibid*, p. 308. (C 751)

চিত্র ১৬: খেলনা গাড়ির চাকা (খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক), চন্দ্রকেতুরগড়। সূত্র : Enamul Haque, *ibid*, p. 348. (C 962)

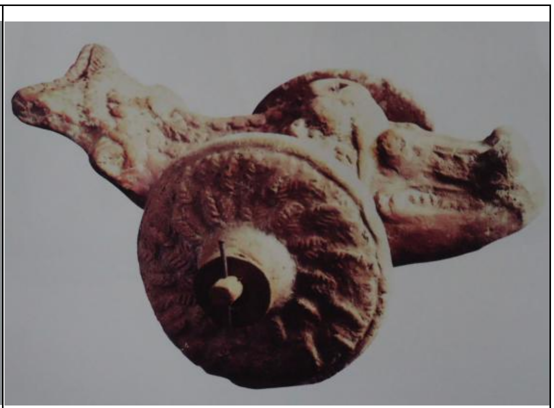

চিত্র ১৭: : খেলনা গাড়ি (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক), চন্দ্রকেতুরগড়। সূত্র : Enamul Haque, *ibid*, p. 309. (C 763)

চিত্র ১৮: চাকা বিশিষ্ট মকরযানে ভরতের অযোধ্যা যাত্রা (৬-৭ শতক), পলাশবাড়ী, বগুড়া। সূত্র : Afroz Akmam, *ibid*, Plate No. 12.38

চিত্র ১৯: স্পোকযুক্ত চাকাওয়ালা অশ্বযান (১৭ শতক), বর্ধমান। সূত্র : সৌমজিৎ সেন গুপ্ত, ২রা মার্চ ২০১৭

চিত্র ২০: স্পোকযুক্ত চাকাওয়ালা বিশেষ ধরনের গরুর গাড়ি (১৮ শতক), কান্তজীর মন্দির। সূত্র : Cultural Survey of Bangladesh Series-1: Archaeological Heritage (editor: Sufi Mostafizur Rahman), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2007, Plate 28

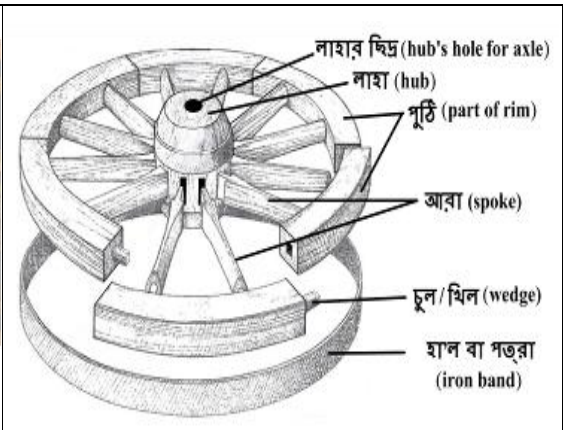

চিত্র ২১: চাকার প্রধান প্রধান অংশ

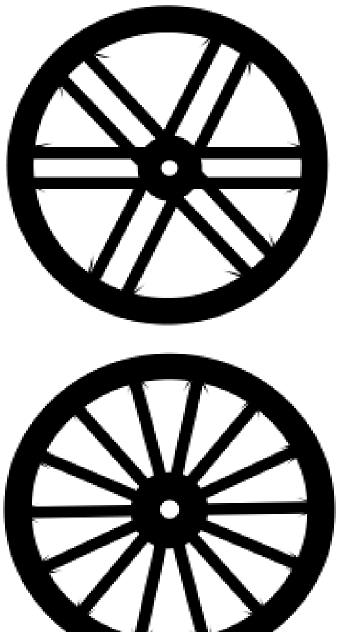

চিত্র ২২: বাংলার চাকায় আরার দুই ধরনের বিন্যাস

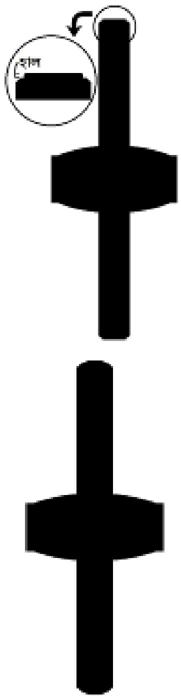

চিত্র ২৩: বাংলার চাকার পৃষ্ঠদেশের দুই ধরন

চিত্র ২৪: বাংলার জনপ্রিয় টমটম খেলনা গাড়ি। গাড়িটি সংগ্রহ করা হয়েছে দুয়ারিপাড়া, ঢাকা থেকে।
তারিখ : ২৭শে মার্চ ২০১৫

চিত্র ২৫: এখনও প্রয়োজনীয় গরু-মহিষের গাড়ি, ধামইরহাট, নওগাঁ। তারিখ : ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর ২০১৫

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ এই ঘাটতি মূলত ইতিহাস উপকরণের রক্ষণশীল সংজ্ঞায়ন-সৃষ্ট। বিস্তারিত দেখুন, যতীন সরকার, "ইতিহাস-গুরু রবীন্দ্রনাথ", *ইতিহাস*, ত্রয়োদশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৮১, ২৬-৩৮

২ তিনি প্রাচীন বাংলার গণনারীতি, বিভিন্ন ফসল ও তরিতরকারির নাম, স্থান-নাম, বাঙালি প্রধান খাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন 'প্রাচীনতম ঐতিহাসিক' ও 'নির্ভরযোগ্য' উপাদান অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতে। এ-ক্ষেত্রে তিনি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত (Etymology) তথ্য বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩, ৪৯, ৫১, ৪৪৩ ও ৪৪৭

৩ এ-প্রসঙ্গে শব্দের ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের প্রতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা* (অনু. কাবেরী বসু), কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯, ১১২-১১৬

৪ ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, "[বাংলার] দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে, যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে বর্তমান। এ ধরনের কিছু শব্দে আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এ সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ হিসাবে এ শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে।" দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ৪৪২। শব্দ কিভাবে 'source of clues' হতে পারে সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুনঃ David W. Anthony, *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World,* Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2007, বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২১-৩৮)

৫ David W. Anthony, *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World,* Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007, p. 66

৬ David W. Anthony, *ibid*, p. 66

৭ David W. Anthony, *ibid*, p. 67

৮ Sarunas Milisauskas, Janusz Kruk, Richard Ford and Maria Lityńska-Zając, "Neolithic Plant Exploitation at Bronocice", *Sprawozdania Archeologiczne*, no. 64, 2012, p. 79

৯ David W. Anthony, *ibid*, p. 69

১০ David W. Anthony, *ibid*, p. 69

১১ David W. Anthony, *ibid*, p. 70

১২ Joan Aruz & Ronald Wallenfels, *Art of The First Cities: The Third Millennium B.C. From The Mediterranean to The Indus*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2003, p. 72

১৩ Joan Aruz & Ronald Wallenfels, *ibid*, p. 97-100

১৪ Anthony J. Barbieri-Low, "Wheeled Vehicles In The Chinese Bronze Age (C. 2000–741 B.C.)", *Sino-Platonic Papers,* Number 99 February 2000, Philadelphia (USA): Department of East Asian Languages And Civilizations, University of Pennsylvania, p. 4

১৫ Joan Aruz, Kim Benzel, and Jean M. Evans (ed)., Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C., New York: The Metropolitan Museum of Art, 2008, p. 243

১৬ Karen Barrett-Wilt, "Hittite War Chariot", http://www.ancient.eu/image/1303/, 14 July 2017

১৭ Norman De Garis Davies, *The Tomb of Nefer-Hotep At Thebes*, Vol. I, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1933, p. 22 & 23

১৮ Anthony J. Barbieri-Low, *ibid*, p. 9 & 10

১৯ Anthony J. Barbieri-Low, *ibid*, p. 10-17

২০ John Marshall (Ed.), *Mohenjo-Daro And The Indus Civilization*, Volume I, London: Arthur Probsthain, 1931, p. 39

২১ Jonathan Mark Kenoyer, "Wheeled Vehicles of the Indus Valley Civilization of Pakistan and India" in M. Fansa and S. Burmeister (ed), *Rad und Wagen: Der Ursprung einer Innovation (Wheel and car: The origin of an innovation)*, Mahwah: Phillip Zabern in Scientific Paper Company. 2004, pp. 87-106. গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় রচিত। তবে Jonathan Mark Kenoyer-র রচনাটি www.harappa.com-এ ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যায়। পৃ. ৩

২২ Mortimer Wheeler, *The Indus Civilization*, London: Cambridge University Press, 1968, p. 15; K.N Dikshit, *Lectures on the Prehistoric Civilizations of the Indus Valley*, Madras: The G. S. Press, 1938, p. 28

২৩ Jonathan Mark Kenoyer, "Urban Process in the Indus Tradition: A Preliminary Model from Harappa", *Harappa Excavations 1986-1990: A Multidisciplinary Approach to Third Millennium Urbanism* (Ed. Richard H. Meadow), Madison (Wisconsin, USA), Prehistory Press, 1991, p.50

২৪ Mortimer Wheeler, *ibid*, p. 82 & 92. সিন্ধু সভ্যতার চাকা ও চাকাওয়ালা গাড়ি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Jonathan Mark Kenoyer, "Wheeled Vehicles of the Indus Valley Civilization of Pakistan and India", *প্রাগুক্ত*

২৫ M. S. Randhawa, *A History of Agriculture In India, Volume I (Beginning To 12th Century)*, New Delhi, Indian Council of Agricultural Research, 1980, p. 158

২৬ সঞ্জীব চক্রবর্তী, "গোরুর গাড়ির হাত-পা-মাথা", *ভূমধ্যসাগর*, একাদশ বর্ষ, আসানসোল, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৭

২৭ Sister Vajirā & Francis Story (Translated from the Pāli), *Last Days of the Buddha The Mahāparinibbāna Sutta*, Kandy, Buddhist Publication Society, BPS Online edition 2010, p. 33

২৮ Ven. Pategama Gnanarama, *The Mission Accomplished: A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the Digha Nikaya of the Pali Canon*, Singapore, Ti-Sarana Buddhist Association, 1997, p. 43

২৯ Le Huu Phuoc, *Buddhist Architecture*, USA (শহরের নাম উল্লেখ নাই), Grafikol, 2010, p. 247

৩০ এরূপ একটি দৃশ্যের বিবরণের জন্য দেখুন: A. Foucher, *The Beginnings of Buddhist Art and other Essays in Indian and Central-Asian Archeology* (Trans. L. A. Thomas & F. W. Thomas), pl. XXXVI

৩১ Le Huu Phuoc, *ibid*, p. 253

৩২ Jonathan Mark Kenoyer, "Wheeled Vehicles of the Indus Valley ...", *ibid*, p. 15

৩৩ সঞ্জীব চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৩৪ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২

৩৫ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫

৩৬ "গরুর গাড়ী", *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (দুলাল চৌধুরী সম্পা.), কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪, পৃ. ৫৫৯

৩৭ Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2001, pp. 283-285

৩৮ Enamul Haque, *ibid*, pp. 285 & 287

৩৯ Enamul Haque, *ibid*, pp. 287 & 288

৪০ Enamul Haque, *ibid*, pp. 288 & 289

৪১ Enamul Haque, *ibid*, pp. 289 & 290

৪২ Enamul Haque, *ibid*, p. 288

৪৩ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫ ও ৪৫৬

৪৪ Enamul Haque, *ibid*, p. 289

৪৫ Enamul Haque, *ibid*, p. 328

৪৬ Enamul Haque, *ibid*, p. 328

৪৭ Enamul Haque, *ibid*, p. 289

৪৮ Afroz Akmam, *Mahasthan*, Dhaka: Bangladesh National Museum, 2006, Plate No. 12.38

৪৯ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬

৫০ রবীউদ্দিন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত আঞ্চলিক শব্দ "শব্দসংগ্রহ" নামে *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* বর্ষ ৩৩, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬ খ্রি.), ২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ শুরু হয়। এর পর তা ৩৩ বর্ষের ৩য়, ৪র্থ এবং ৩৪ বর্ষের ১ম সংখ্যায় শেষ হয়। "শব্দসংগ্রহ"র ভূমিকা "গ্রাম্যশব্দ-সঙ্কলন" লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫১ George Abraham Grierson, *Bihār peasant life: Being A Discursive Catalogue of The Surroundings Of The People Of That Province* (With Many Illustrations From Photographs Taken By The Author), Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1885.

৫২ লাহা, পুঁঠে, আরা, ধূর, রুন, পচড়া, চুল, মুচ বা মোচ, বেড় বুন্দ ও হা'ল।

৫৩ ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

৫৪ রবীউদ্দিন আহমদ, "শব্দসংগ্রহ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* বর্ষ ৩৩, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬ খ্রি.), ২য় সংখ্যা, পৃ. ১১৮; ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৫৫ "নিঙ্ঘা", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮

৫৬ "গরুর গাড়ী", *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৯

৫৭ ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

৫৮ রবীউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮; ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৫৯ ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৬০ দারা শামসুদ্দীন, *বাংলাদেশের স্থাননাম : ইতিহাসের পদচিহ্ন*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ২০২

৬১ "সগড়", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, প্রাগুক্ত।

৬২ তপতী রানী সরকার, *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার : অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ২৯৩

৬৩ "নিঙ্ঘা", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, *প্রাগুক্ত*।

৬৪ দারা শামসুদ্দীন, *বাংলাদেশের স্থাননাম: ইতিহাসের পদচিহ্ন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৬৫ "আড়া-আড়ি", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, *প্রাগুক্ত*।

৬৬ তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

৬৭ তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

৬৮ তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

৬৯ "উলাড়", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, *প্রাগুক্ত*।

৭০ তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

৭১ তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

৭২ অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ (১৩৮৩), পৃ. ২৪; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪, পৃ. ৭৬

৭৩ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯, পৃ. ১১; অতীন্দ্র মজুমদার, *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৪০৪, পৃ. ৩

৭৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ]*, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃ. ২৪

৭৫ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৮; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৯

৭৬ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২; অতুল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৭৭ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, "প্রাক্ কথন", *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৩১

৭৮ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৭৯ আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৮০ এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, অনিরুদ্ধ দাস, *দীর্ঘস্থায়ী কৃষি বিকাশ : ঐতিহাসিক পটভূমি ও আধুনিক সভ্যতার দায়*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১০, ১৯-২৮

৮১ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ৬৪

৮২ Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2001, pp. 316 & 317

৮৩ Dines Chandra Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History And Civilization*, Vol. I, Calcutta: University of Calcutta, 1965, 79; "Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan", *Epigraphia Indica Vol. XXI* (1931-32), New Delhi, Archeological Survey of India, 83-91; "মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি", http://bn.banglapedia.org/.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮

জাপানি কাব্যসাহিত্যের বিকাশধারা ও বাংলায় অনুবাদের কতিপয় নিদর্শন

লোপামুদ্রা মালেক*

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেমন সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য বহন করছে তেমনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্য চর্চার উদ্ভব ও বিকাশের ধারাও কম প্রাচীন নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ দিয়ে এর সূচনা ঘটলেও পরবর্তীকালে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক আমলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে। অন্যদিকে জাপানি সাহিত্যে কাব্যচর্চার বিশেষ করে হাইকু কবিতা রচনার ইতিহাস বেশ পুরোনো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'জেপান' শিরোনামে কমোডর পেরির একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাপান চর্চার সূত্রপাত হলেও জাপানি সাহিত্যের বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যের অনুবাদ চর্চার ইতিহাস আরো পরের ঘটনা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান গমনের মাধ্যমে এই ধারার সূচনা ঘটে। যার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি তাঁর *জাপান-যাত্রী* নামক ভ্রমণকাহিনিতে। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো অনেকে জাপানি কবিতা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন। এসব অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। যদিও জাপানি কবিতার রূপ-বৈচিত্র্য, এর গঠন-শৈলী এবং ভাব-রস প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলে সমভাবে সফল হতে পারেননি। তথাপি এই ধারা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক অনবদ্য অবদান রেখেছে নিঃসন্দেহে।

শব্দ সংকেত : হাইকু, মানিওশু, কিওকা, তনকা, কাতারিবি, ওয়াগা, নো, মাগাউতা, রেন্‌গা, শফু, মোনোগাতারি

ভূমিকা

সার্বিক সাহিত্যের বিচারে অনুবাদ সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, এটি কোনো মৌলিক সাহিত্য নয়। অন্যদিকে অনুবাদকে বিশেষ কোনো সৃজনশীল সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায় না। কারণ, অনুবাদ হচ্ছে ইতোমধ্যে অস্তিত্বশীল কোনো সাহিত্যকর্মের একই ভাষার সমকালীন ধারায় উন্নীতকরণ অথবা অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তর। অনুবাদের অন্তরালে থাকে একটি মৌলিক কর্ম এবং সেটিকে আবর্তন করেই অনুবাদের সৃষ্টি। ফলে সেখানে অনুবাদের নিজস্ব কোনো সত্তার উপস্থিতি থাকে না। অনুবাদ সম্পর্কিত এই সাধারণ ধারণা একই সঙ্গে যেমন সঠিক, অন্যদিকে বিভ্রান্তিরও উদ্রেক করে।

---

* প্রভাষক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদ কোন একটি মৌলিক সাহিত্যকর্মকে আশ্রয় করে এবং ভাষা ব্যবহার, রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুকে বিশ্বস্ততা সঙ্গে আত্মস্থ করে তাই অনুবাদে সজৃনশীলতার বিষয়টি সহজ নয়। যদিও এর মধ্যে কোনো জটিলতার অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে সজৃনশীলতার বিষয়টি জড়িত মূলের প্রতি প্রেমবোধ ও তা প্রকাশের অনিবাযর্তার সঙ্গে। অনুবাদে যদি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, মূল সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে অনুবাদকের ঘনিষ্ঠ প্রেমের বন্ধন প্রকাশের আর্তি হয় অন্য কোন ভাষায়, তাহলে সে অনুবাদে সজৃনশীলতার প্রকাশ অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে স্পিভাক বলেন :

> The task of a translator is to facilitate this love between the original and its shadow, a love that permits fraying, holds the agency of the translator and the demands of her imagined or actual audience at bay.[১]

মৌলিক সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে অনুবাদের এই নিবিড় প্রেমবোধ ও তা সৃজনশীলতায় আত্মপ্রকাশের বিষয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন[২] :

> সৃজনশীলতা অনুবাদে আসতে পারে দুইভাবে – মূল কাজটি সুচারুভাবে ভাষান্তরিত করে, যাতে মূলের ভাব-ভাবনা শৈলী ও আঙ্গিক যতটা সম্ভব বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়ে অনুবাদে, এবং মূলের অনরূপ একটি আমেজ তৈরী করে অনূদিত কাজটি– অনুবাদকের সৃজনশীলতার একটি পরিচয় বলা যায়, উৎকৃষ্ট অনুবাদকের এটি চরিত্রলক্ষণ। দ্বিতীয়ত, মূল কাজকে সামনে রেখে অর্থাৎ তার শৈল্পিক মান ও আদর্শের প্রতি মনোযোগী হয়ে তার মূল ব্যঞ্জনা ও আবেদনের সীমানাটি প্রশস্ত করা এবং একই সঙ্গে অনূদিত ভাষায় শিল্পোত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। এটি নিঃসন্দেহে সৃজনশীলতায় একটি উত্তরণ।

সুতরাং অনুবাদ শুধু কোন মৌলিক সাহিত্যের শব্দ-গঠন ও রূপ-বৈচিত্র্যের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং বাক্য, রূপ-বৈচিত্র্য ও শব্দ গাঁথুনিকে অতিক্রম করে প্রচ্ছন্নে তার যে অনুচ্চারিত অনুভূতির ভাববোধ, প্রেম ও বেদনার আর্তি ও সারাৎসার তারই অন্বেষণের প্রয়াস। এরূপ অনুবাদ কর্মে মূল ও অনুবাদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন থাকে না, বরং পরস্পরের মধ্যে নিবিড় হৃদ্যতায় শৈল্পিক সৃজনশীলতায় সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই জাতীয় সার্থক অনুবাদের জন্য প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়, নিবিড় বোঝাপড়া আর মূলের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, যদিও সে আত্মসমর্পণ কোনো ভৃত্যের নয়, প্রেমিকের :

> the translator must surrender to the text. She must solicit the text to show the limits of its language, because that rhetorical aspect will point at the silence of the absolute fraying of language that the text wards off, in its special manner. Some think this is just an ethereal way of talking about literature or philosophy. But no amount of tough talk can get around the fact that translation is the most intimate act of reading. Unless the translator has earned the right to become the intimate reader, she cannot surrender to the text, cannot respond to the special call of the text.[৩]

মৌলিক সাহিত্য কর্মের সঙ্গে অনুবাদকের এরূপ নিবিড় সম্পর্ক অনুবাদকে সাহিত্যের একটি অনিবার্য শাখায় স্থান দেয়ার প্রয়াস পায়, আর সবকিছুর উর্ধে উঠে অনুবাদ নিজেই হয়ে ওঠে

স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ কোন মৌলিক সাহিত্যের আশ্রয়ে জন্মলাভ করলেও অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক সাহিত্যও অপর কোন মৌলিক সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুকরণ করেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনুবাদ ও মৌলিকতার বিষয়ে মেক্সিকোর কবি অক্টাভিও পাজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> Each text is unique, yet at the same time it is the translation of another text. No text can be completely original because language itself, in its very essence, is already a translation – first from the nonverbal world, and then, because each sign and each phrase is a translation of another sign, another phrase.[৪]

সকল ভাষাকে যখন অনুবাদের অনুষঙ্গ করা হয় এবং সকল সাহিত্যই যখন অনুবাদের অংশ হিসেবে বিবেচ্য হয়, তখন সাধারণভাবে বিবেচিত অনুবাদ অনুবাদেরই একটি বিশেষ রূপ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। আর তখন মৌলিক সাহিত্য এবং অনুবাদের মধ্যে মৌলিকতার প্রশ্নের বিভেদটি হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে কতটা আস্থার সঙ্গে মূলকে অনুবাদে আত্মস্থ করা হয়েছে, কতটা যথার্থভাবে মূলের বৈশিষ্ট্যসমূহকে অনুবাদে ভাষান্তর করা সম্ভব হয়েছে সেসব প্রশ্নই মৌলিকতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সেই অনুবাদই মৌলিক, যে অনুবাদ সৃজনশীল বিশ্বস্ততায় মূলের সামগ্রিক সৃষ্টি কাঠামোকে অন্য একটি ভাষায় ধারণ করে, একটি ভাষা থেকে আর একটি ভাষায় একটি সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি ও বেড়ে ওঠায় যে অনুবাদ হয়ে ওঠে অনিবার্য। অনুবাদের অনুকরণশীলতা ও মৌলিক সৃজনশীলতার প্রশ্নে স্টাইনার বলেন :

> ...the most exalted vision we know of the nature of translation derives precisely from that programme of literalism, of word-for-word metaphrase which traditional theory has regarded as most puerile.[৫]

মূল সাহিত্য-কর্মের অনুসরণ এবং তার সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করার মধ্যে কোনো দাস্যবৃত্তি থাকে না, বরং তার সৃজনশীলতা, মৌলিকত্ব ও সার্থকতা প্রকাশ পায় প্রেম ও সমর্পণের, অনুভূতি ও বোধের বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রেক্ষাপট

বাংলা ভাষায় জাপানি কাব্য অনুবাদ নিয়ে আলোচনার পূর্বে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য বিকাশের পটভূমির ওপর আলোকপাত করা যায়। অপরাপর ভাষায় রচিত সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও প্রসারের একটি অন্যতম মাধ্যম অনুবাদ। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই স্মরণযোগ্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রণিধানযোগ্য চৌদ্দ শতকের কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রচিত রামায়ণের খুব নির্ভরযোগ্য অনুবাদ না হলেও বাল্মীকিকে আশ্রয় করেই বিশেষ এই স্বাধীন

অনুবাদকাব্য বিকশিত হয়। চৌদ্দ শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত পাঁচশ' বছর বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব অনবদ্য ও ব্যাপক। একটি অনুবাদ কাব্য কি অনবদ্যতায় ও ব্যাপকতায় সমগ্র সাহিত্যে নিজস্ব অবস্থান তৈরি, পরিবর্ধন ও পরিশীলনে অবদান রাখতে পারে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও কৃত্তিবাসের রামায়ণকে স্মরণ করাই এখানে যথেষ্ট নয়।

চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশমান রূপটি প্রস্ফুটিত হতে থাকে। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কারণেই এই মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-কাব্য রচনার ধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাংলায় তুর্কি বিজয়ের প্রক্রিয়াটি প্রায় দেড়শো বছর ধরে ক্রিয়াশীল ছিল। বাঙালি জাতির জীবনে তখন যে সংকট চলেছিল তাকে কাটিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তুর্কি আক্রমণের অগ্নি-দাহ থেকে মুক্তির বৈপ্লবিক সাধনায় অগ্নিস্নাত বাঙালি সংস্কৃতি পরিশুদ্ধ হয়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। হোসেন শাহের শাসনামলে বাংলার রাষ্ট্রশক্তি কিছুটা স্থিতিলাভ করে এবং তখন থেকেই সাহিত্যের স্থবিরতা ভঙ্গ করে নবসৃষ্টির লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হতে থাকে। এই পটভূমিতে পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-কাব্য, মঙ্গল-কাব্য (মনসামঙ্গল) ও বৈষ্ণব-কবিতা এই তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই তিন ধারার মধ্যে আবার সতেরো শতক পর্যন্ত অনুবাদ-কাব্যের ধারা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (ভাগবত পুরাণের আংশিক অনুবাদ) এবং সঞ্জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আদিমধ্যযুগের এই সমস্ত অনুবাদমূলক রচনার দ্বারা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের শাখাটিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি দেয়া হয়েছিল।[৬]

মধ্যযুগের সমাজ-মানসে রাজনৈতিক অস্থিরতার এই পটভূমিতে সর্বত্র একটি ঐকান্তিক মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তৎকালীন সাহিত্যেও তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য চেতনা আভিজাত্যের সংকীর্ণতা পরিহার করে জনজীবনের বৃহত্তর মিলন-ভূমিতে সংযুক্ত হয়েছিল। মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদি প্রধান গ্রন্থসমূহের অনুবাদের মধ্যে এই অন্তঃশীল প্রেরণা কার্যকর ছিল। তাছাড়া মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনচেতনার উদ্দীপক চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রাণ-প্রবাহের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথকে স্বচ্ছন্দ করে দিয়েছিল। যে সর্বাত্মক বিশ্বাস ও জীবনবোধের ভিত্তির উপর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই বিশ্বাস ও জীবনবোধের, সেই যুগাকাঙ্ক্ষার যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটেছিল ঐ যুগের প্রধান সাহিত্য-শাখা অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের আদর্শস্থল রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাগবত পুরাণ। সুতরাং আপামর বাঙালি পাঠকের কাছে ওইসব মহাগ্রন্থের অনূদিত রূপ তুলে ধরতে পারলে হিন্দু-ধর্ম এবং তার

আদর্শ একটা বিস্তৃত পরিমণ্ডল লাভ করে। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুবাদকেরা। অবশ্য তাঁরা যে সকলেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন হয়তো তেমনটি ছিল না। কিন্তু একথা সত্যি যে তাঁদের গোচরে বা অগোচরে সেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সংঘটিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের পথকে সুগম করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের গঠন, বর্ধন ও রীতিপ্রথায় অনুসৃত হয়ে আছে। এর সঙ্গে রয়েছে সুদীর্ঘকালের মুসলিম শাসনামলে রচিত আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ।

ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুলাংশে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে অনুবাদ সাহিত্যকে ঘিরে। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদ প্রভাবিত অনুবাদ সাহিত্য থেকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক অনুবাদ সাহিত্য ছিল গুণগতভাবেই অনেকটা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-সহ সংস্কৃত, আরবি বা ফার্সি ভাষা থেকে যেসব অনুবাদ, অনুলিখন বা অনকুরণধর্মী সাহিত্য রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে মূল সাহিত্য কর্মগুলোর সম্পর্ক উপনিবেশ-উত্তর পুঁজিবাদী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ফলত, সে সময় মূল ও অনুবাদের সম্পর্কের মধ্যে মৌলিকতার বিষয়টি অত প্রকট হয়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন : "মধ্যযুগের সাহিত্যে মৌলিকতা নিয়ে কোনোরূপ অসম্ভব অহঙ্কার নেই, আবার অন্যের ভাণ্ডার থেকে দু'হাতে ঋণ গ্রহণেও কোনোরূপ সঙ্কোচ দেখা যায় না। যথার্থ অনুবাদের নিয়ম শৃঙ্খলা বা মৌলিকতার স্বাতন্ত্র্যবোধ – দুইই পরবর্তী সময়ের আধুনিক মানসিকতার সৃষ্টি।"[৭] যাহোক, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে অনুবাদ সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটলেও সাহিত্যের অনুবাদ ও তার প্রভাব একইভাবে লক্ষণীয়। যদিও তৎকালীন অনুবাদ-কর্মের মনোযোগ ক্রমেই ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিল। বাংলায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মূলেও রয়েছে এই পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার ব্যাপক প্রভাব। এর অনিবার্য ফল হিসেবে উল্লেখযোগ্য বহু সাহিত্যকর্মের বাংলা অনুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস*, গিরিশচন্দ্র ঘোষের *ম্যাকবেথ* প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে সংযোজন করে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য, নতুন নতুন সাহিত্য ধারার বিকাশ ও সৃষ্টির সতেজ অনুপ্রেরণা। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে আগ্রহ এবং শেষ বয়স পর্যন্ত অনুবাদের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন দুর্লক্ষ নয়। এমনকি তাঁর মতে, ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনেও যে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সেই অনুবাদের কারণেই ভাষা-প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে।[৮]

বাঙালির সঙ্গে হাইকুর প্রথম পরিচয় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের মাধ্যমে। তিনি জাপানি *ঝিনুক* নামে হাইকুর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছু হাইকু অনুবাদ করেছিলেন। হাইকুর ভাবধারা অনুসরণ করে কিছু ক্ষুদ্র কবিতাও রচনা করেছিলেন।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাপান ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ সালের *জাপান-যাত্রী*তে তাঁর জাপান ভ্রমণের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও জাপান ভ্রমণের বহু পূর্ব থেকেই তিনি জাপান ও এর সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি থেকে একটি জাপানি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে সেটি তাঁর *কড়ি ও কোমল* কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। *জাপান-যাত্রী*র জন্য তিনটি হাইকু ছাড়াও কয়েকটি জাপানি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রবন্ধে এসবের নিদর্শন পাওয়া যায় (ভাণ্ডার, ১৩১২)।[৯]

১৯০২ সালে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটে তেনশিন ওকাকুরার সঙ্গে। ওকাকুরার *ওয়ান এশিয়া* সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত পোষণ করতেন, যা পরে *প্যান-এশিয়ানিজম* নামে পরিচিত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু জাপানের চরম জাতীয়তাবাদী অবস্থান তাঁকে জাপান সম্পর্কে প্রতিবাদী করে তোলে। তিনি অনেক জাপানি কবির কবিতা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে জাপান ও এর সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহকে অনেকে পশ্চিমের অভ্যর্থনা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।[১০] উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে ওকাকুরার *প্যান-এশীয়* চিন্তার প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। ওকাকুরা ও তাঁর অনুসারীগণ শান্তির মৌলিক দিকটির ওপর বিশ্বাস রাখেননি। তাঁরা ইতিহাসকে দেখেছেন সংঘর্ষ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রগতির অগ্রগতি হিসেবে, বিশেষ করে এশিয়া ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যুদ্ধকে।[১১] এখানেই রবীন্দ্রনাথের আদর্শিক অবস্থানটি নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। তিনি একাধারে পূর্ব ও পশ্চিমের আস্বাদ গ্রহণ করে বিশ্বকবি হয়েছিলেন। তিনি ওকাকুরার *এশিয়াটিক মাইন্ড* ধারণার অন্তর্নিহিত ভাবটির খোঁজে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতা ও অন্য রচনাসমূহে বস্তুবাদ, আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন।

জাপানি কাব্যসাহিত্য চর্চার পটভূমি

খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকের পূর্ব পর্যন্ত জাপানিদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। পৌরাণিক কাহিনি, কিংবদন্তি আর গীতি রচনাগুলি জনশ্রুতি আর লোকমুখে ঘুরে বেড়াত বংশ পরম্পরায়। সরকারিভাবে এসব শ্রুতিধরকে বলা হতো কাতারিবি। প্রতিবেশী চীনের কাছ থেকে জাপানিদের প্রথম হাতেখড়ি হয় জাপানি বর্ণমালার। ৪০৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানে এর প্রচলন ছিল। ওয়ানগিন বা ওয়ানি নামে এক কোরিয়ান চীনা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন জাপানি এক রাজকুমারের। তিনিই প্রথম জাপানে চীনা লিখন-পদ্ধতির প্রচলন করেন।

৫৫২ খ্রিস্টাব্দে জাপানি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের প্রদীপ্ত জ্ঞানশিখা উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন জাপানি সংস্কৃতি জগৎকে। এই জ্ঞানমার্গের সংস্পর্শে এসে সাহিত্য, শিল্পকলা আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান ব্যাপক উন্নতি সাধন করে।

৪০৫ থেকে ৭৯৪ সাল পর্যন্ত জাপানি সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কাব্যচর্চা। ৭৯৪ থেকে ১১৯২ সালকে জাপানি সাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী যুগ বলা হয়। জাপানের কাব্যচর্চার কালকে আটটি যুগে বিভক্ত করা যায় নিম্নরূপে :

১. অতি-বিস্মৃত আদিকাল থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত আদিযুগ
২. নারা যুগ (৭১০-৭৯৩)
৩. হেইহান্ যুগ (৭৯৩-১১৮৫)
৪. কামাকুরা যুগ (১১৮৬-১৩৩২)
৫. মুরোমাচি যুগ (১৩৩৩-১৫৬৫)
৬. মোনোয়ামা যুগ (১৫৬৬-১৬০২)
৭. ইয়োদো যুগ (১৬০৩-১৮৬৭)
৮. টোকিয়ো যুগ (১৮৬৮ থেকে পরবর্তী সময়)

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত যুগগুলোর নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন যুগের রাজধানীর নাম থেকে। যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতার ধারা, যা জাপানকে উদ্ভাসিত করেছে।

কাব্যচর্চা ছিল তৎকালীন (খ্রিস্টীয় ৪০৫-৭৯৪ অব্দ) জাপানি সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। জাপানের এ সময়ের কাব্যচর্চার ধারাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে :

১. মানিওশু (Maniyoshu)
২. হাইকু
৩. রস রচনা
৪. কিওকা কবিতা
৫. আধুনিক তনকা কবিতা

প্রাচীন জাপানে (চতুর্থ থেকে অষ্টম শতাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) রাজকীয় দরবারি কাব্যচর্চার প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং দশ হাজারি সংকলন নামে খ্যাত খ্রিস্টীয় আট শতকে রচিত *মনিওশু* জাপানের আদি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ-গ্রন্থ। জাপানি সাহিত্যে গদ্যচর্চার সূচনা তখনও হয়নি। কাকিনোমতো নো হিতোমারো, ইয়ামাবে নো আকাহিতো প্রমুখ প্রায় সাড়ে চার শতের মতো কবির কবিতা সংকলিত হয়েছিল গ্রন্থখানিতে। এছাড়াও রাজকুমার ইকুসা, দরবারি মহিলা

নুকাতা, সম্রাট তেন্‌জি, সম্রাট তেম্মু, কুকিনো তোজি, রাজকুমার নাগা, মহারানী ইওআনো, মহারানী য়ামাতো, রাজা ইশিকাওয়া-সহ বহু রাজকীয় দরবারি কবির বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন জাপান প্রবাসী বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক সন্দীপ কুমার ঠাকুর। *মানিওশু*তে সম্রাট ইউরাকুর (৪১৮-৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) রচিত বেশকিছু কবিতা পাওয়া যায় যার কিছু বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর একটি কবিতার অনুবাদে গান্ধর্ব মতে জাপানি বিবাহ রীতির সঙ্গে রাজার প্রতাপ প্রতিপত্তি ও অহংবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[১২]

ছোট্ট চুপড়ি হাতে তোমার, কি সুন্দর চুপড়ি,
ছোট্ট খোন্তা হাতে তোমার, কি ছোট্ট খোন্তা,
মোহিনী কন্যে, পাহাড়ে পাহাড়ে শাক তুলছ।
কোথায় তোমার ধাম,
কি বা তোমার নাম?
এই য়ামাতো[১৩] রাজ্য আমার;
শাসন এদেশে আমারই।
ডাক আমাকে রাজা বলে,
জান নাকি ঘর আমার, নাম আমার?
(সন্দীপ কুমার ঠাকুর অনূদিত সম্রাট
ইউরাকুর রচিত কবিতা)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির জন্য জাপানিরা সুবিদিত। শিল্পকলায়, যথা অঙ্কনে, সিনেমায়, নাটকে, খেলাধুলা, সাহিত্যেও তারা উন্নতি করেছে। কিন্তু বাঙালিরা বিশ্বকাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে বহু কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হলেও জাপানি কবিতার অনুবাদে খুব বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সঠিক অনুবাদ ও আগ্রহের অভাবে চর্চার তেমন ব্যবস্থা করা হয়নি। কেউ কেউ হাইকু সম্বন্ধে কিছু কিছু চর্চার অবকাশ পেয়েছেন। হাইকু, বলার অপেক্ষা রাখে না, জাপানের সীমানা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জাপান-যাত্রী*তে জাপানি কবিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, 'ওদের যত কবিতা ...সবগুলোই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখি, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভাগের সম্বন্ধ–এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না, এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।'

*জাপান-যাত্রী*তে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কয়েকটি জাপানি কবিতায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় :[১৪]

পুরোনো পুকুর, (ফুরুইকে ইয়া : An old pond)
ব্যাঙের লাফ, (কোওয়াজু তোবিকমু : A frog leaped)
জলের শব্দ। (মিজু নো ওতো : Sound of the water)
– মাৎসুও বাসো

'বাস্! আর । আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার, তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল- এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কি রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কি ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশী একেবারে অনাবশ্যক।'

আর একটি কবিতা :[১৫]

পচা ডাল, (ক্যারীদা নি : On the withered branch)
একটা কাক, (ক্যারেসু নো তোমারিকেরি : A crow has alighted)
শরৎকাল। (আকি নো কুওে : The end of autumn)
– মাৎসুও বাসো

আর বেশি না। শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশার আকাশ ম্লান হবার কাল– এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অতি অল্পের মধ্যে সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্-সংযম রয়েছে তা নয়, এর মধ্যে আছে ভাবেরও সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।[১৬]

জাপানি কাব্যের মূল সুরটি সতেরো শতকে রচিত উপযুক্ত দু'টি বিখ্যাত *হাইকু* কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সুর কেবল জাপানি কাব্যের নয়, গোটা জাপানি সহিত্যেরই মূল কথা।

জাপানি কাব্যের রচনারীতি ও গঠনশৈলী

জাপানি সাহিত্যে নাটক পূর্ণাঙ্গ রূপ অর্জন করে ১৪ শতকে। ইতিপূর্বে পালা-পার্বণে আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীতিই ছিল জাপানি নাট্য-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। ১৪ শতকে প্রথম গীতধর্মী *নো* নাটকের বিকাশ। কাব্য-জগতে এই সময় *তনকা* ধরনের সার্থক *হাইকু* কবিতার প্রচলন হতে থাকে। কবি মাৎসুও বাসো (খ্রিস্টীয় ১৬৪৪-৯৪) ছিলেন এই *হাইকু* বা *হক্কু* কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এঁরই কবিতার অনুবাদ করেছেন তাঁর *জাপান-যাত্রী*তে।[১৭]

কবির অনূদিত একটি জাপানি কবিতা :

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল,
দেবতা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল–
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

ক্ষুদ্রাকার এই কবিতাকেই বলা হয় *তনকা* বা *ওয়াকা*। *তনকা* হলো পাঁচ চরণের (৫+৭+৫+৭+৭=৩১) ৩১ অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট কবিতা। মিল বা ছন্দের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। মূলত জাপানি কবিতামাত্রই ছন্দপ্রাণ। আবেগময়, ব্যঞ্জনাত্মক আর গীতধর্মী হয়ে থাকে এই শ্রেণির কবিতা। মূল কথাটি ছাড়া বাহ্যাড়ম্বরের অবকাশ নেই। মানুষ, প্রকৃতি বা মানবীয় প্রেম *তনকা*'র বিষয়বস্তু। *ম্যানিওসু*-র শতকরা নব্বইটি কবিতাই *তনকা* জাতীয়।

ম্যানিওসু-তে দীর্ঘাকৃতি 'ছোক' শ্রেণির কিছু কিছু কবিতাও যে স্থান পায়নি, এমন নয়। কয়েকটি *তনকা* কবিতার নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হলো :[১৮]

বসন্ত কাল সবুজ মাঠ
এসেছিলাম ভায়লেট ফুল তুলতে,
সারা রাত কিন্তু ঘুমিয়েই কাটালুম–
এমনি মুগ্ধ করে তুলেছিল সবুজ মাঠ।
(ইয়ামাবে নো আকাহিটো : ৮ম শতক)

আর একটি *তনকা* :

আমি যখন মগ্ন ছিলাম দিবা নিদ্রায়
প্রিয়া এসে দেখা দিল নিমিষের জন্য,
দিবাস্বপ্নই হবে বুঝি
অটুট হলো বিশ্বাস।
(ওনো নো কোমাচি : ৯ম শতক)

হাইকু বা *হক্কু* *তনকা*র অনুরূপ কবিতা। তার অক্ষরমাত্রা ৫+৭+৫=১৭, আর চরণ মাত্র তিনটি। *তনকা*র মতোই মানুষ, প্রকৃতি আর প্রেম তার প্রধান বিষয়বস্তু; তেমনি ইঙ্গিতময়, প্রতীকধর্মী আর সংক্ষিপ্ত। *হাইকু*-র প্রচলন শুরু হলে *তনকা*র জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

জাপানি কবিতার রূপ-বৈচিত্র্য ও বাংলায় অনুবাদের নিদর্শন

মাৎসুও বাসো লেখাপড়া শিক্ষা করেন কিয়োতোয়। এদো যুগের তিনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি। কবিতা গাঁথার গতানুগতিক প্রথা ছেড়ে তিনি নিজস্ব *শফু* ঢঙের কবিতার প্রবর্তন করেন যা সহজ সাবলীল প্রকাশ ধর্মে ও প্রতীকে অনন্য। মাৎসুও বাসোর এই সৃষ্টি *হাইকু* কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করে নতুন মর্যাদা দান করে। পরবর্তীকালের বহু কবি তাঁর কাব্যরীতি অনুসরণ করেন। তাঁর উত্তরসাধক *হাইকু* কবিদের মধ্যে ইনমোতো কিকাকু (১৬৬১-১৭০৭), কাগা নো চিয়ু (১৭০৩-৭৫), তানিগুচি বুসন (১৭১৬-৮৩), কোবায়াসি ইসা (১৭৬৩-১৮২৮), মাসাওকা সিকি (১৮৬৬-১৯০২), নাৎসুমে সোসেকি (১৮৬৭-১৯১৬), ওনো বুসি (১৮৮৮-), তাকাহামা কিওসি (১৮৭৪-), মুরাকামি কিজো (১৮৭০-) প্রমুখ সবিশেষ খ্যাত।

মাৎসুও বাসোর একটি *হাইকু* 'চেরীফুল' :[১৯]

মেঘের চূড়া
চূর্ণ হলো–
চাঁদের হাসি হাসল পাহাড়।

জাপানি কবিতার মধ্যে *হাইকু* যে *তনকার* মতো ১৭টি অক্ষরবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংসম্পন্ন কবিতা, তা আগেই বলা হয়েছে। গুটিকয়েক শব্দের সংযোজনে *হাইকুতে* কবি যে সুন্দর একটি চিত্র তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন তা নয়, নিপুণ শিল্পীর হস্তে, না-বলা অনেক কথার হদিস পাওয়া যায়। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে *হাইকু* কবিতার প্রচলন হতে দেখা যায়। ফুজিওয়ারা নো সদেয়া তাঁর সংকলিত *সিন কোসিনসু* ও *হিয়াকুনিন ইসু* কাব্যগ্রন্থে সার্থক বহু *হাইকু* কবিতার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। যেমন–[২০]

চেরীফুলের পাপড়ি
যেন এক পক্ষ-সঞ্চালনী মরাল,
এলো ঝড়!

কবি মাৎসুও বাসোর (১৬৪৪-৯৪) হাতে জাপানি *হাইকু* কবিতার বিকাশ পূর্ণতা পায়। কবিতার মাধ্যমে তিনি শুধু সহজ অকপট নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির চিত্রাঙ্কণেই ক্ষান্ত ছিলেন না, এক মহত্তর ভাব-সমৃদ্ধির সন্ধানও তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায়।

হাইকু কবিতা প্রসঙ্গে কবি বাসোর পরে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি তানিগুচি বুসন। *হাইকু* কবিতাকে তিনি নতুন আঙ্গিকের পারিপাট্য দানে সমর্থ হন। তিনি শুধু মজলিশি ঘরানার কাব্য চর্চাতেই ব্যাপৃত ছিলেন না, সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় পল্লিচিত্র অঙ্কনেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত নিচের দু'টি *হাইকু*তে বসন্তকালে বর্ষার চিত্র পাওয়া যায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে : [২১]

১। ওরে, বসন্তের বরষা
যেন প্রিয়ার কানাকানি,
একই সাথে চলেছি মোরা।

২। বসন্তের বরষা
এখনও হয়নি সিক্ত
ব্যাঙাচির বক্ষদেশ।

হাইকু কবিদের মধ্যে সম্ভবত ইসা ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইসার বাস্তব জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল– যেন দুঃখে ভরা আশাহত জীবনের পুনরাবৃত্তিময় পঙ্‌ক্তিমালা। জীবনের প্রতিপদে প্রতারিত হয়েছেন কবি যেখানে যা কিছু করার চেষ্টা করেছেন। ইসার কাব্য-দর্শনেও তাই এর প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। তাঁর রচিত একটি কবিতার অনুবাদেও লক্ষ করা যায় জীবনে এগিয়ে যাওয়ার আঁকাবাঁকা পথের কথকতা :[২২]

সর্পিল পদক্ষেপে এগিয়ে যা,
এগিয়ে যা, ওরে ক্ষুদ্রজনা–
ধীর পদক্ষেপে উঠতে থাক
ফুজিসান-এ!

কবি ইসা মৃত্যুকালে কোনো শিষ্য রেখে যাননি। বুসন-অনুসারী কবিগণের মধ্যেও অনেক তীক্ষ্ণ প্রতিভার অভাবে নিষ্প্রাণ কাব্যচর্চায় ব্যস্ত থেকেছেন। এক্ষেত্রে মাসাওকা সিকি ছিলেন নিষ্প্রাণ ধারার ব্যতিক্রম। কবি মাসাওকার মাধ্যমে *হাইকু* কবিতার পুনর্জন্ম হয়। নিষ্প্রাণ, গতানুগতিক কাব্যধারার উত্তরণ ঘটিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন বস্তুকেন্দ্রিক সত্যিকারের জীবনসত্তার সাহিত্যরস। মাসাওকার একটি কবিতার অনুবাদে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস লক্ষ করা যায় :[২৩]

মেঘের পাহাড় চূড়া,
সাদা পাল,
দক্ষিণে হলো পুঞ্জীভূত...

তৎকালীন জাপানি কাব্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে *তনকা*, *হাইকু*, *মাগাউতা*, *রেন্‌গা* বা গাথা আকারে লিপিবদ্ধ কাব্য *মোনোগাতারির* মধ্য দিয়ে। ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে *হাইকু-মোনোগাতারি* কবিতা গাওয়া হতো যন্ত্রের সহায়তায়। মজলিশি ঘরানার বাইরে পল্লি জাপানের বৃহত্তর পরিবেশে, তার হাসি-কান্নার একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই জাতীয় জনপ্রিয় লোক-সাহিত্যে। জাপানের সামন্তযুগীয় কবিতা চর্চার পর আবির্ভূত হয় জাপানি সাহিত্যের নতুন যুগ। এরূপ প্রেক্ষাপটে পূর্ব এশিয়ায় উন্মেষ ঘটে পাশ্চাত্য ভাবধারায় দীক্ষিত নবতর জাপানি সাহিত্যের। নিম্নে অনূদিত জাপানি কবিতায় এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় :[২৪]

গান

গেয়ো না গান,
গান গেয়ো না লাল ফুলের কিংবা
প্রজাপতির চটুল ডানার।
গেয়ো না গান মলয়ানিল কিংবা
প্রিয়ার কুন্তল সৌরভের।
তফাত রাখো যা কিছু পঙ্গু
যা ম্রিয়মাণ,
যা কমনীয়
যা কিছু মিথ্যা।
করো বর্জন যা শোভন
আর করো গান যা খালি সত্য।
উদর যাক ভরে,
বক্ষ উঠুক প্লাবিত অলস অবসন্ন মুহূর্তে।
গাও সেই গান যে গান
পদানত মানুষের মৌন ভাষা
অপমান

আর কলকণ্ঠে গাও এই গান: আশার বাণী
গান নয়
যেন এই সব
হাতুড়ির ঘা
পথচারী জনতার বুকে।
(নাকানো শিজেহারু : জন্ম ১৯০২)

আর একটি গান –

সংক্ষিপ্ত মোর গানগুলি
তাইতো লোকে ভাবছে বসে
আমি নাকি কথার চোরা ভাণ্ডারী।
ভাবে ওরা। কতটুকু মোর দান
কিবা মোর সংযোজন?
মাছের মতো নই তো আমি,
হৃদয় আমার সাঁতার কাটে জলের বুকে
গান গাই,
থামবে গান দম ফুরালে।
(ইয়াসানো আকিকো ১৮৭৮-১৯৪২)

রাতের রেলগাড়ি

দিন-ভাঙার ধূসর ফ্যাকাশে আলো
ঘাসের দুয়ারে আঙুলের ছাপ ঠাণ্ডা শীতল,
আর পর্বত কিনারা নগ্ন শুভ্র
রূপার পাতে লেখা এখনও ঝলমল।
যাত্রীরা সব জাগেনি বুঝি এখনও,
মিটি জ্বলছে খালি বিজলি আলো।
বার্নিশে মিঠা-কড়া গন্ধ–অসুস্থ,
আমার চুরুটের ঝাপসা ধোঁয়াতেও বুঝি
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে এলো

রাতের রেলগাড়িতে।
মন্দ কতখানি সহজেই অনুমেয় যে
কোনো এক স্ত্রীলোকের পক্ষে,
ইয়ামাশিনা এখনও কি যায়নি পার হয়ে?
হাওয়া-বালিশের ছিপিটা সে দিলে খুলে
দেখলে চেয়ে ফাঁপান বালিশটা
দুমড়ে গেল ক্রমে ক্রমে।
দুঃখের ছায়া যেন নামলো সহসা
আর তার টানে আকৃষ্ট হলাম আমরা দুজন।
জানালার বাইরে আমি এবার তাকালাম
ট্রেনের জানালার বাইরে; ভোর হয়ে
এসেছে, পার্বত্য পল্লি
অজানা অচেনা স্থান
পুষ্পিত হয়ে উঠেছে অদূরে
বুঝি এক শুভ্র কলামহিন্স-এর কলি!

(হাজিওয়া সাকুতারো ১৮৮৬-১৯৪২)

জাপানি কবিদের মধ্যে যিনি এদেশে (বিশেষ করে বাংলায়) সর্বাধিক পরিচিত তিনি হলেন ইওনো নোগুচি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। জাপানি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনায় তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে নোগুচি ভারতে আগমন করেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার একান্ত অনুরাগী। বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে নোগুচির বহু কবিতা যুক্ত হয়ে এদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে নোগুচির একটি কবিতা নিম্নরূপ :[২৫]

বর-ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম!

জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি মন্দিরে,
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।
'কহিছে ওহারু করজোড়ে "প্রভু!
দাও মোরে হেন বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশ্বাসে
নিবে আসে চরাচর,
নিশ্বাস যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল থরে থরে।
' "দাও, প্রজাপতি। দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,
গোপন সানুর মর্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর;
সেই সানু দেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা।
হেন পতি দাও কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,–
আফিম ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বায়ে আন্‌চান॥
ভালোবাসা যার কানন উদার
পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি

মুখে চেরী-ফুল আঁকা।
"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্ ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল উঠে দুলি!
"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে।
'যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে,
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি!"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি
চুলে চেরী-ফুল পাঁতি।
"দাও হেন বর হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে;
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া।"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া।
"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়।

জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয়;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়।”
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল মূরছায়।
“দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম।
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম!
‘কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে!”
চেরী-ফুল মনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে!

খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাপান প্রথম সাগর-পারের বিদেশি বণিকদের সংস্পর্শে আসে। পর্তুগিজ নাবিকরা প্রথম জাপানে পদার্পণ করেছিল। পর্তুগিজদের পর পর্যায়ক্রমে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের আগমন ঘটে। যদিও জাপানের তকুগাওয়া সামন্ত-শাসকদের বিরোধিতায় এসব বিদেশি বণিকের জাপানে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তী দু'শ বছর জাপানে বিদেশিদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। জাপানের এই যুগ *এদো* নামে খ্যাত। সমগ্র বহির্বিশ্ব থেকে জাপান একরূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই সময়। কাজেই এই সময়কার জাপানি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যতটা আপন অন্তরঙ্গের অভিমুখে বহমান ছিল, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ততটা অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি।

উপসংহার

কবিতা বা কাব্য হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার প্রকাশ এবং বিকাশ হয় শব্দের দ্বারা কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দ দিয়ে কবিতা বা কাব্যকে ব্যাখ্যা করা কঠিন এবং জটিল। কাব্যের নান্দনিকতা শব্দ ব্যাখ্যার উর্ধ্বে। কবি তার সঞ্চিত আবেগ উপস্থাপন করেন পাঠকের উদ্দেশে আর পাঠক সেই আবেগের মর্ম উপলব্ধি করেন তার বোধে। জাপানি কাব্যরস বা গদ্যরস চিরকালীন সমৃদ্ধ একটি ব্যঞ্জনা যা পাঠকবিদিত। তবে এই লেখার ধরনের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারভেদ ও ব্যতিক্রমী প্রকাশ ভঙ্গিমা বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ হাইকুর অন্তস্তলকে মুহূর্তে সরল করে গেছেন তাঁর *জাপান-যাত্রী গ্রন্থে*। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে হাসনাত আবদুল হাই পর্যন্ত বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক এর বহুমুখী ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করেছেন। হাইকু কলেবরে ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্রতার মধ্যে বিশালতাকে সন্নিবেশিত করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় জাপানিদের নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, বাগান, ক্যালিগ্রাফি, তাদের অঙ্কিত ছবি ইত্যাদির মধ্যে– তারই কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায় *হাইকু* নামক জাপানি কাব্য সাহিত্যে। প্রকৃত অর্থে হাইকু একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা যা মননে শুরু হয়ে ক্ষুদ্র শব্দে ব্যক্ত। লেখার ধরন এবং গঠনশৈলীতে প্রারম্ভিকভাবে বোঝা যায় কবি তাঁর পাঠকের কল্পনাকে কেবল একটি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেন স্বাধীনভাবে। সূত্রটি একটি ক্যানভাস, যেখানে একটি ছবি আঁকা আছে, পাঠক তার মনের মতো করে ছবির অর্থ সাজিয়ে নেন অবচেতনে। তারপর অবগাহন করেন ৫–৭–৫ অক্ষরমালার এই শব্দ খেলায়।

*হাইকু*র ভাব-ব্যঞ্জনা ও রীতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। একে জটিল বললে তার অমর্যাদা করার সমতুল্য। প্রকৃতপক্ষে *হাইকু* পাঠকের চেতনার নদীতে একটি ঢিলের মতো যা যে মুহূর্তে পড়ে, তাৎক্ষণিক আলোড়নের পরে বহুক্ষণ, বহুদূর পর্যন্ত এর রেশ রয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যে সান্নিধ্য তার বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা হচ্ছে হাইকু। মাৎসুও বাসোর সেই বিখ্যাত *হাইকু* যার যথার্থ অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে একটি ছবি আঁকা হয়েছে শব্দ দিয়ে। শব্দ-ছবিটি এত বাঙ্ময় যেসব শব্দ বলা হয়নি তাও যেন মুহূর্তে এক ঝলকে উঁকি দিয়ে যায় পাঠক মনের ও চোখের কোণে। অদ্ভুত এর বিশালতা। তবে সুদূরপ্রসারী বিশালতাকে সঠিক নান্দনিকতা দিতে গেলে শব্দ চয়নে হতে হয় সচেতন। কারণ প্রায় প্রতিটি শব্দের ভিতরে লুকিয়ে থাকে দীর্ঘ দীর্ঘ স্তবক যা ছবি হয়ে প্রতিভাত হয় পাঠকের তীক্ষ্ণ মানসচক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত *হাইকু*গুলোর বঙ্গানুবাদ বাংলা অনুবাদ কাব্যসাহিত্যে যে দ্যোতনা সৃষ্টিতে সার্থক তা বলার অবকাশ নেই। অন্যদিকে সমকালীন বা পরবর্তীকালের অপর সাহিত্যিকদের দ্বারা অনূদিত *হাইকু* কতটা তার স্বমর্যাদায় অনূদিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে বিচার বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ এই *হাইকু* কবিতা ক্ষুদ্র হলেও তার কলেবর পূর্বনির্ধারিত। ৫–৭–৫ এর ঊর্ধ্বে যাবার স্বাধীনতা না থাকায় এই অক্ষরমালার মধ্যেই অনুবাদ করতে গেলে কাব্য-মাধুর্য কতটা বজায় রাখা যায় তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে ছন্দের জাদুকর হিসেবে খ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জাপানি কবি ইওনো নোগুচির কবিতার যে বাংলা অনুবাদ করেছেন তা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় জাপানি সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে এক অনবদ্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। ছন্দের মাধুর্যে তিনি তাকে করে তুলেছেন অমূল্য। যদিও নোগুচির লেখার যে মূল রূপ তা তিনি কতটা প্রস্ফুটিত করতে পেরেছেন তা নিয়ে নির্দিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ Spivak, "The Politics of Translation", in Gayatri Chakravorty Spivak, *Outside in the Teaching Machine*, New York: Routledge, 1993, p. 181

২ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অনুবাদে সৃজনশীলতার সীমানা, *একুশের প্রবন্ধ '৯৫*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮০

৩ *Ibid*, p. 183

৪ Octavio Paz, "Translation: Literature and Letters", in Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte & John Biguenet ed., The University of Chicago Press. Chicago, 1992, p. 154

৫ George Steiner, After Babel, Oxford University Press, Oxford, 1998 (3rd ed.), p. 350

৬ কৃষ্ণানন্দ দে, *বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ*, অপ্রকাশিত পিএইচডি. অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৫৩

৭ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অনুবাদ, বাংলা একাডেমি (ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা), ঢাকা, ১৯৮৮ (১ম প্রকাশ ১৯৮৫), পৃ. ২০

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অনুবাদ-চর্চা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৪০২, পৃ. ৩৭৫

৯ ভাণ্ডার, ১৩১২, পৃ. ৫৩

১০ Yukiko Sumi Barnett, *India in Asia: Okawa Shumei*'s Pan-Asian Thought and Idea of India in Early Twentieth-Century Japan, *Journal of the Oxford University History Society*. Vol. 1, 2004, pp. 9-10

১১ Prasenjit Duara, The Discourse of Civilization and Pan-Asianism, *Journal of World History*, University of HAWAI'I Press, Vol. 12, No.1, Spring, 2001, pp. 112-114

১২ সন্দীপ কুমার ঠাকুর, এইকো ঠাকুর ও সুশান্ত কুমার বসু, *কোটি পাতার ছন্দ* (জাপানি কবিতাগুচ্ছ), রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১

১৩ জাপানের প্রাচীন নাম

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপান-যাত্রী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪২৩

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপান-যাত্রী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪২৩

১৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৪

১৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৩

১৮ নিখিল সেন, *এশিয়ার সাহিত্য*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৮৭-৯২

১৯ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮

২০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮

২১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

২২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

২৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০

২৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০-৯২

২৫ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *কাব্য-সঞ্চয়ন*, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৩০, পৃ. ২৩৮-২৪০।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

বদরে আলম খান, *বাংলার ইতিহাস বাংলার রাজনীতি*, পলল প্রকাশনী,
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১১, ঢাকা, পৃ. ৫০৩, মূল্য : টাকা ৫০০/-

বাংলার ইতিহাস বাংলার রাজনীতি বইটির লেখক বলেছেন, তিনি বাঙালি জাতির শেকড় সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু বাঙালি জাতির শেকড়ের সন্ধানই করেননি, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎসেরও সন্ধান করেছেন। এদেশের রাজনীতির ক্রমধারার সন্ধান করেছেন। ইতিহাস ও রাজনীতির বিবর্তনের ধারাগুলিরও বর্ণনা করেছেন। এসব বিবর্তনের পেছনে কী কারণ ছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করেছেন। সেই বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের জন্মাবধি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়, তাঁর আলোচনার মধ্যে এসেছে। সেদিক থেকে বইটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। লেখক কতটা শেকড়ে পৌঁছতে পেরেছেন, সেটা অবশ্য পাঠকগণই ঠিক করবেন। লেখকের উপস্থাপিত তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলি অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বইটির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ লক্ষ করা যায়। বাঙালি জাতির দূর অতীতটাকে লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যদিও তা বিস্তারিত নয়, সংক্ষিপ্ত। বাঙালিদের একটা পরিচয় দেয়ারও চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, আর্যদের এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই এই বদ্বীপ অঞ্চলে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কৌম ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর লোকেরা বাস করত, তাদের একটা নির্দিষ্ট জীবনধারাও ছিল। ওই জনগোষ্ঠীকেই বাঙালির আদিপুরুষ বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে ছিল নানা উপজাতীয় নৃগোষ্ঠী যেমন মুণ্ডা, সাঁওতাল, মোঙ্গলীয় আরো অনেক। এমনি অনেক নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়েই বাঙালি জাতি। বঙ্গ, বাংলা শব্দগুলি তো অনেক পরের ঘটনা। বঙ্গদেশ বলতে লেখক হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকার পলিগঠিত বদ্বীপ অঞ্চলের বৃহত্তর অংশকেই বুঝিয়েছেন। প্রথম দিকে এসব লোকের সমাজ ও জীবনযাত্রা ছিল খুবই সহজ ও সাধারণ। এদেশের উর্বর জমিতে ধান উৎপন্ন হতো, নদীতে ছিল প্রচুর মাছ, সে থেকেই এদেশের মানুষ মাছভাতে অভ্যস্ত হয়। যেহেতু এখানকার জীবিকা ছিল খুব সহজ, অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোকেরা জীবিকার সন্ধানে এখানে চলে আসত আর সেজন্যই এই অঞ্চলের জনবসতি সেই দূর অতীতকাল থেকেই ছিল ঘন। বাঙালিরা যে একটি সংকর জাতি তা তাদের গাত্রবর্ণ, চেহারা, শারীরিক গঠন ইত্যাদি থেকেই বোঝা যায়।

উত্তর ভারত থেকে আর্যদের আসার পর থেকেই এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। আর্যরা বঙ্গদেশে আসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (খ্রি. পূ. ৬০০ অব্দের পর)। এদেশ এবং এদেশের মানুষদের সম্পর্কে আর্যদের ধারণা ছিল অত্যন্ত

নেতিবাচক। আর্যরা এদেশকে বলত পাণ্ডববর্জিত অন্ত্যজ দেশ। এদেশের মানুষকে বলত দস্যু, তাদের ভাষাকে বলত পক্ষীর ভাষা। আর্যরা আসে নতুন বসতি ও সম্পদের সন্ধানে। তারা সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের বৈদিক ধর্ম ও বর্ণবাদ। ধীরে ধীরে তারা বৈদিক ধর্ম ও বর্ণবাদ এদেশের সমাজে প্রচলিত করে। প্রকৃতি পূজারী সহজ সরল মানুষগুলি আর্যদের অগ্রসর চিন্তা ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং আর্যদের দেবদেবীতে বিশ্বাস করতে থাকে। আর্যরা যে বর্ণবাদ দ্বারা সমাজকে বিভক্ত করে, সেটাও তারা মেনে নেয়। আর্য ব্রাহ্মণরা সমাজকে চারটি বর্ণ বা শ্রেণিতে ভাগ করে : ব্রাহ্মণ– যারা ধর্ম ও পূজাঅর্চনা নিয়ে থাকবে; ক্ষত্রিয়– যারা যুদ্ধ ও দেশ শাসন নিয়ে থাকবে; বৈশ্যরা ব্যবসা করবে আর চতুর্থ শ্রেণির পরিচয় হলো শূদ্র– যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবা করবে। আর্যদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই ছিল সমাজকে বিভক্ত করা। এই সমাজ বিভক্তির মধ্য দিয়েই তারা তাদের রাজনীতি আরম্ভ করে। ধর্ম ব্যবহৃত হয় ক্ষমতা ও রাজনীতির জন্য। এভাবেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ চলে আসে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। এদেশের মানুষ বা অন্ত্যজরা (শূদ্ররা) পড়ে থাকে ক্ষমতা বলয়ের বাইরে। তাদের কাজ হয় শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবা করা, তাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ধর্মের নামে এদেশের মানুষের উপর যে শাসন ও নিপীড়ন চালায়, তার জন্য একদিন স্থানীয় লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এক সময় মানুষ ব্রাহ্মণদের শোষণ ও অত্যাচারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ঠিক এসময়ই গৌতম বুদ্ধ নিয়ে আসেন তাঁর মানবতাবাদী নতুন ধর্ম (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে)। গৌতম বুদ্ধের এই নতুন ধর্মে বর্ণবাদ ছিল না, মানুষ মানুষে কোন ভেদাভেদও ছিল না। সমাজের অবহেলিত ও নিপীড়িত লোকেরা তখন দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল অনেক দিন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের নানা কৌশলে গুপ্ত শাসকদের সময় বৌদ্ধরা পিছিয়ে পড়ে।

উত্তর ভারতের গুপ্ত রাজারা ছিল হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে (২০০–৬০০ খ্রিস্টাব্দ)। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্ত রাজাদের পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশ। গুপ্তদের পরে আসে মৌর্যরা, তারা ছিল বৌদ্ধ। মৌর্য রাজাদের সময়, বিশেষ করে পাল রাজাদের সময়, এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। মানুষ ব্রাহ্মণ ও বর্ণবাদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং বৌদ্ধধর্মের উদারতা এবং মানবিক কারণে ব্যাপকহারে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেই বৌদ্ধ যুগ থেকেই তাই বাংলার গণমানসে এবং এদেশের মানুষের চরিত্রে মানবিক উদারতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা স্থান পায়। পাল রাজাদের পর আসে দক্ষিণ ভারতের সেনবংশের রাজত্ব। সেনরা ছিল শিবভক্ত হিন্দু ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আবার ফিরে এলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমেনি। এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। প্রাচীন যুগের এসব পরিবর্তন নিয়ে লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

গুপ্ত সম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন মহাসামন্ত (সেনাপতি) শশাঙ্ক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি ভুক্তি বা প্রদেশ নিয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্ণসুবর্ণতে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয়। শশাঙ্কের শাসনকাল ছিল ৬০০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। শশাঙ্ক সম্পর্কে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, যাকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শশাঙ্ক যে রাজ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর উপরই পরবর্তী সময়ে পাল রাজারা বিশাল পাল সম্রাজ্য গড়ে তোলে। শশাঙ্ককেই লেখক বলেছেন বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি ছিলেন একজন শিবভক্ত হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। তিনি নাকি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেলেন।

শশাঙ্কের পর একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, যে সময়ের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই সময়টাতেই চলে মাৎস্যন্যায় নীতি অর্থাৎ বড় রাজারা ছোট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতো। এই অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ছোট ছোট সব রাজারা মিলে গোপাল নামক এক সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ যোদ্ধাকে তাদের রাজা নির্বাচন করে। এই গোপালই বিশাল পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গোপাল হিন্দু ছিলেন না, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং এদেশেরই লোক। পাল রাজারা দীর্ঘ চারশত বছর বঙ্গদেশ শাসন করেন। তারাই এই অঞ্চলের একটা স্থায়ী ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং রূপরেখা নির্ধারণ করেন। তাঁরা গৌড়ে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। পাল রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল প্রমুখ। রাজা ধর্মপালের সময় সোমপুর বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয় (পাহাড়পুর)। সে সময় সোমপুর বৌদ্ধবিহার ছিল দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধধর্মপীঠ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও পাল রাজাদের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাল রাজারা অকৃপণভাবে অর্থ ও ভূমি দান করেন। এক সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এক বাঙালি পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর।

পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে, বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। পাল রাজাদের রাজত্ব কালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে। সমাজে তখন উগ্র বর্ণবাদ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণবাদ না থাকলেও ক্ষমতা ছিল রাজা বা শাসকদেরই হাতে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্তবাদ। সব ক্ষমতা থাকে রাজার হাতে। সাধারণ মানুষ ছিল ক্ষমতার বাইরে।

পাল রাজাদের পতনের পর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চলের সেন বংশের রাজারা বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতায় আসে। সেনদের সময় বঙ্গদেশে আবার হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ফিরে আসে। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। বৌদ্ধধর্মের প্রভার খর্ব করার জন্য সেন রাজারা ছিলেন তৎপর। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁরা ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থ ও ভূমিদান করতেন। তাঁরা দেশে বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম ও আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য সকলকে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলে খাটো করেন। কুলীন প্রথা

বলে এক উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কান্যকুব্জ থেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের এনে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতেন, যাতে এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। রাজা বল্লাল সেনের সময় এই কুলীন প্রথা নিয়ে অনেক আলোচনা এবং সমালোচনাও হয়। সমাজে বর্ণবাদ একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের দুর্নীতি, অর্থলিপ্সা, ভোগবিলাস মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে। তাছাড়া রাজঅন্তঃপুরের দুর্নীতি ও ব্যভিচার, সামাজিক অবক্ষয় সেন রাজাদের রাজত্বের শেষদিকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সেন রাজাদের সময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়। সেন রাজাদের অনেকে সুপণ্ডিত এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলিম সৈন্যদের কথা শুনে ভয়ে, কোন প্রকার যুদ্ধ না করেই পূর্ববঙ্গের দিকে পালিয়ে যান। মুসলিম সৈন্যরা বিনাযুদ্ধেই বঙ্গদেশ দখল করে নেয়। বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়েই বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের পালিয়ে যাওয়ার পেছনের কারণ, মুসলিম সৈন্যদের প্রতি তাঁর ভয়। এদেশের হিন্দু রাজারা পশ্চিম ভারতে বারবার মুসলিম সেনাপতিদের নিকট পরাজিত হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলেন। মুসলিম সেনাপতিদের জয়ের প্রধান কারণ ছিল, তাদের সাহস ও সমর কৌশল, মুসলমানদের ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী। তাঁদের তীক্ষ্ণ অসির সম্মুখে এদেশের হিন্দু রাজারা বা তাঁদের সৈন্যরা দাঁড়াতে পারত না।

বঙ্গবিজয় এদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়েই এদেশে একটি নতুন যুগের সুচনা হয়– প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্যযুগের আরম্ভ। অন্য কথায় বঙ্গদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের শেষ এবং মুসলিম শাসনের আরম্ভ। ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল বা পলাশীর পর পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো বছর পশ্চিম এশীয় মুসলিম শাসকগণই এদেশ শাসন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়। পশ্চিম এশীয় মুসলিম শাসকগণ সঙ্গে নিয়ে আসেন নতুন ধর্ম – ইসলাম। ইসলাম ধর্মে বর্ণবাদ বা জাতিভেদ ছিল না। সমাজে কোন শ্রেণিভাগও ছিল না। মুসলিম শাসক ও সেনাপতিদের সঙ্গে আসেন মুসলিম ধর্মপ্রচারকগণ। এসব ধর্মপ্রচারকের অধিকাংশই ছিলেন নির্লোভ এবং উদার মানবিক চরিত্রের মানুষ। তাদের সততা, উদার মানবিক চরিত্র দেখে, এদেশের হিন্দু বৌদ্ধরা মুগ্ধ হয়। সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের মানবিক দিকগুলি দেখে এদেশের নিপীড়িত হিন্দুরা ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। পশ্চিম এশীয় শাসকদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা কোন দেশ জয় করলে সেখানে প্রথম মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতেন। সামাজিক এসব প্রতিষ্ঠান থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হত। তবে মুসলিম ধর্মপ্রচারকগণ এদেশের মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করেননি। মুসলিম মিশনারি, সুফি, দরবেশদের চারিত্রিক মহত্ত্ব, ইসলাম ধর্মের

উদারতা ও ন্যায়বিচার দেখেই হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলিম সুলতানগণ স্থানীয় লোকদের ধর্ম ও সামাজিক জীবন সম্পর্কেও ছিলেন উদার। সুলতান হুসেন শাহের সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য দেব যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন, মুসলিম সুলতানগণ তাঁর জন্য কোন বাধার সৃষ্টি করেননি। বঙ্গদেশে যে হারে হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, দিল্লি বা তার আশেপাশের হিন্দুরা তা করেনি। মুসলমানেরা যদি জোর করেই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করত, তা হলে উত্তর ভারতে কোন হিন্দু থাকার কথা ছিল না।

মুসলিম শাসনের সময় এদেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মেলামেশা ছিল খোলামেলা। অনেক শাসক হিন্দু রমণীদের বিয়ে করেন, তাদের সন্তানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সাহসী চরিত্রটা পায়। হিন্দু মুসলমানের এই সামাজিক মেলামেশার ফলে এদেশের মানুষের চরিত্রেও একটা বড় পরিবর্তন আসে। তাদের সেই শান্ত, নিরীহ ও অর্ন্তমুখী স্বভাবে পরিবর্তন আসে। তারা হয় সাহসী, স্বাধীনচেতা এবং দুঃসাহসিক অভিযাত্রী।

খিলজির বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী তিন শত বিশ বছর খিলজি, দাস, বলবন, তুগলক, ইলিয়াসশাহী, হোসেনশাহী বংশের সুলতানগণ বঙ্গদেশ শাসন করেন (১২০৪ – ১৫৩৮)। এর মধ্যে রাজা গণেশ নামের এক হিন্দু জমিদার ও তাঁর বংশের অন্য তিনজন শাসক (রাজা গণেশ, তার পুত্র যদু ও মহাদেব এবং পৌত্র আহমদ শাহ। যদু ও আহমদ শাহ উভয়েই পরে মুসলমান হয়েছিলেন) পঁচিশ বছর এবং চারজন হাবসি সুলতান (বরবক শাহ, ফিরোজ শাহ, মামুদ শাহ ও মুজাফফর শাহ) আট বছর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। সব মিলিয়ে এই সময় ৫২ জন শাসক এদেশ শাসন করেন। তাঁদের মধ্যে শুধু ১৫ জন ছিলেন দিল্লির অনুগত। বাকী সবাই ছিলেন স্বাধীন সুলতান। পরবর্তী দুশো বছর বাংলা ছিল মুঘলদের অধীন এবং মুঘল সম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সুবা বা প্রদেশ (এই সময় ২৯ জন মুঘল সুবেদার বাংলা শাসন করেন)।

মধ্যযুগে এদেশের পশ্চিম এশীয় শাসকদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছেন বটে. তবে ঐ সময়ের মধ্যেই তাঁরা বঙ্গদেশের একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো তৈরি করে দিয়ে গেছেন। একটা ভৌগোলিক সীমাও দিয়ে গেছেন। তাঁরা স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেছেন এবং বাঙালি চরিত্রে স্বাধীনচেতা মনোভাব সৃষ্টি করে গেছেন। দীর্ঘ তিনশো বছর বাংলার সুলতানগণ যে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন, তার একটা প্রভাব বাংলার জমিদার এমনকি সাধারণ প্রজাদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বাংলার সুলতান, জমিদার এবং জনগণের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে একটা স্বাধীন মনোভাব সৃষ্টি হয়। দিল্লির পক্ষে বাংলাকে সহজে বশে আনা তাই সম্ভব ছিল না। বাংলার বারো ভূঁইয়াকে বশে আনতে মুঘল শাসকদের বেশ বেগ পেতে হয়। বাংলার মুঘল শাসন কখনো নিরবচ্ছিন্ন বা শান্তিপূর্ণ ছিল না। বাংলার লোকেরা দিল্লির শাসনকে কখনোই খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইত না,

একটু সুযোগ পাইলেই তারা বিদ্রোহ করত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খান ও আলীবর্দী খান স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করেন। সিরাজদ্দৌলা যে কয়দিন বাংলার মসনদে ছিলেন, স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করে গেছেন।

সুলতানী যুগের শাসন ব্যবস্থা সামন্তবাদী হলেও নিপীড়নমূলক ছিল না। শাসনকার্যে স্থানীয় লোকদের অংশগ্রহণ ছিলেন উল্লেখ করবার মত। মুসলিম সুলতানগণ দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ছিলো উদার এবং সেকুলার। রাজকার্যে উপযুক্ত হিন্দুদের নিয়োগ করতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। মুসলিম শাসকদের এই সেকুলারিজমের জন্যই মুসলমানেরা দীর্ঘ সাতশত বছর ভারত শাসন করতে পেরেছিলেন। বাংলায় মুসলমান শাসকগণ যে সাড়ে পাঁচশ বছর শাসন করেন তার পেছনেও ছিল একই কারণ, মুসলমান শাসকদের সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারতা। মুসলমানেরা এদেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় খুব একটা হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁরা এদেশকে নিজেদের দেশ বলেই মনে করতেন এবং এদেশের মানুষের সঙ্গেই বাস করতে চাইতেন।

ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে আসে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তারা ব্যবসা করতে এসে এদেশের শাসকদের নানা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারা এদেশের হিন্দুদের প্রথম থেকেই তাদের অনুগত সহযোগী হিসেবে পেয়ে যায়। হিন্দুদের নানা ব্যবসায়িক স্বার্থে কাছে টেনে নেয়। হিন্দুদের একটা বৃহত্তর অংশ যে মুসলমান নবাব বা শাসকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তারা তা বুঝতে পারে। হিন্দুরা যে ক্রমে ক্রমে মুসলিম শাসনের বৈরী হয়ে উঠছে, সে কথাটা মুসলমান শাসকগণ সঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও, ইংরেজরা বুঝতে পারে। ইংরেজরা সে সুযোগে হিন্দুদের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে আরো উত্তেজিত করতে থাকে। ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করে হিন্দুরা ছিল ঐসব ষড়যন্ত্রের অন্যতম সহায়ক শক্তি। যার ফল হয় পলাশী। মুসলমান শাসকগণ দেরিতে হলেও বুঝতে পারেন রাজনীতি, কূটনীতি ও আধুনিক চিন্তায় ইংরেজদের থেকে তাঁরা অনেক পিছিয়ে। ইংরেজ সৈন্যদের শৃঙ্খলা, উন্নত অস্ত্র এবং সমর কৌশলের কাছেও তাঁরা বড় বেশি সেকেলে। ইংরেজ গোলন্দাজদের সম্মুখে নবাবের সৈন্যরা ছিল অসহায়।

পলাশীর পর এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশ মধ্যযুগ থেকে যেন আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। উপমহাদেশের লোকেরা পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। এতে তাদের শিক্ষায়, চিন্তায় এবং সমাজজীবনেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। ইংরেজ বণিকগণ প্রথম থেকেই হিন্দুদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবেও গ্রহণ করে। নবাবের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ হয়, তখন এসব হিন্দু ইংরেজদের সাহায্য করে। এদেশ শাসন করতে গিয়ে ইংরেজরা দুটি বিষয় মনে রাখে, তাঁরা মুসলমানদের

নিকট থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, মুসলমানেরা তাই তাদের সব সময় শত্রু ভাববে। অন্যদিকে হিন্দুরা ছিল তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী। মুসলমানদের সর্বতোভাবে দমিয়ে রাখার জন্য তারা সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যদিকে হিন্দুদের সবদিকে সাহায্য সহায়তা করতে থাকে। তারা একটি অভিজাত শাসকগোষ্ঠীকে ভিখারির জাতিতে পরিণত করে। ভারতে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি যে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে, বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক সেটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম একশত বছর হিন্দুরা কখনো ইংরেজদের বিরোধিতা করেনি। এমনকি সিপাহি বিদ্রোহের সময়ও তারা ইংরেজদেরই পক্ষে ছিল, যদিও অনেক হিন্দু এতে অংশগ্রহণ করে (মঙ্গল পান্ডেই প্রথম বিদ্রোহ করে, ঝাসির রানি লক্ষ্মী বাই, বাজী রাও, তাঁতিয়া তোপি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন)। ইংরেজরাও সিপাহি বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদেরই দায়ী করে ও এর সকল দায় মুসলমানদের উপরই চাপিয়ে দেয়। মুসলমান অভিজাত শ্রেণির যেটুকু বাকি ছিল, সিপাহি বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজরা তাদের এবার নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নিয়েই হিন্দুরা প্রথম প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমেই রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ হচ্ছিল, সেটাও ইংরেজরা ভাল করে বুঝতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যখন ভারত সভা (Indian Association) গঠন করলেন (১৮৭৬), ইংরেজরা তখন বুঝতে পারে ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই তারা অক্টেভিয়ান হিউমকে (Octavian Hume) দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করল (১৮৮৫), যাতে ভারতীয় রাজনীতি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। হিন্দুরা প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সমাজে অনেকটা এগিয়ে যায়। মুসলমানদের অবস্থানটা ছিল ঠিক এর উল্টো। তারা প্রথম থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করে। পরে ইংরেজদের সঙ্গ এবং ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে, সমাজে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে সেজন্যই রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে দেরি হয়। মুসলিম লীগের জন্ম হয় অনেক পরে (১৯০৬)।

মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে অতি দ্রুত পরিবর্তন আসতে থাকে। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি পৃথক সম্প্রদায় এই কথাটি প্রকটভাবে বেরিয়ে আসে এবং কংগ্রেসের একপেশে রাজনীতির ফলে তা আরো প্রকট হয়। হিন্দুদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের জন্য দ্বিজাতি তত্ত্বটি সম্মুখে চলে আসে। ইংরেজরাও এ সুযোগ নিয়ে ভারত শাসন দীর্ঘতর করার সুযোগ পায়। দ্বিজাতি

তত্ত্বের উপর ভারতও ভাগ হয়। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও ভারত ভাগ ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক ও নির্মম ঘটনা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ভারতের স্বাধীনতা চাইলেও তাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। হিন্দুরা চাচ্ছিল ইংরেজরা ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয়দের হাতে দিয়ে, ভারত ছেড়ে চলে যাক। অন্যদিকে মুসলমানেরা চাচ্ছিল ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে, ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র করে দিয়ে যাক।

ব্রিটিশ সরকার তাদের যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয়দের নিকট হস্তান্তর করার বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসেছিলেন একটি বিশেষ মিশন নিয়ে এবং তাঁর সে মিশন ছিল, ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয়দের নিকট হস্তান্তর করা। তিনিও ব্রিটিশ সরকারকে বলে এসেছিলেন, তাঁর মিশন শেষে তিনি তাঁর পূর্বপদে অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীতে ফিরে যাবেন। ভারতে এসেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কত তাড়াতাড়ি এবং কত অল্প সময়ে কাজটি শেষ করতে পারেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন, ভারত দুভাগ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। প্রথম তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, পরে তিনি ভারতের প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গেও ভারতভাগ নিয়ে আলাপ করলেন এবং তাদের পরামর্শ চাইলেন। সব গভর্নর ভারতকে দুভাগ করার পক্ষে একমত হলেও বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বরোজ দ্বিমত পোষণ করলেন। সে সময় বাংলায় যুক্তবাংলা বা বৃহত্তর বাংলার আন্দোলন চলছিল। অসুস্থতার জন্য বরোজ সভায় যোগ দিতে না পারলেও, তিনি তাঁর লিখিত মন্তব্য পাঠালেন। সেখানে বললেন, ভারতকে দুভাগে নয় তিন ভাগে ভাগ করতে হবে– ভারত, পাকিস্তান ও বাংলা। বরোজের সে প্রস্তাব ১৯৭১ সালে এসে বাস্তবায়িত হল।

ভারত ভাগ নিয়ে লেখক এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এর বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। সবকিছু অতি দ্রুত করার লর্ড মাউন্টব্যাটেনের যে উদ্যোগ ছিল, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। লেখক সে কথাটা বিশ্লেষণ করেছেন। মাউন্টব্যাটেনের অদূরদর্শিতার জন্যই পাঞ্জাবে সংঘটিত হলো ইতিহাসের বীভৎসতম দাঙ্গা, হলো ইতিহাসের করুণতম মানবিক বিপর্যয়। কংগ্রেস নেতাদের প্রতি মাউন্টব্যাটেনের পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ করে নেহেরুর প্রতি, ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু। সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি ও রেডক্লিফ সাহেব এমন এক পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন যাকে চিরদিন ভারতের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভাগ করতে গিয়ে মাউন্টব্যাটেন যা করলেন, তা ছিল তার চরম স্বেচ্ছাচারিতা। এখানে পাকিস্তানের পক্ষে বলার মতো কোন দক্ষ লবিস্ট ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চির বৈরিতার বীজ বপন করে গেলেন।

ভারত ভাগের সময় পূর্ববঙ্গকে যে নির্মমভাবে ঠকানো হয়েছিল, সে কথাটা বইটিতে উঠে এসেছে। কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিবিদের বৃহত্তর বাংলার চেষ্টা কিভাবে হিন্দু মহাসভার বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়েছিল, সেকথাও লেখক বলেছেন। ভারত ভাগের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। ভারতে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর। হিন্দুরা মুসলমানদের ভাবত চিরশত্রু। ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর বৈরী হিন্দুরা যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করবে, মুসলমানেরা যে হিন্দুদের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাবে না, সে ব্যাপারে মুসলমানেরা নিশ্চিত ছিল। ইংরেজ শাসকদের নিকট থেকে তারা বর্তমানে যে নিরাপত্তা পাচ্ছে, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর সেটা আর পাবে না। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিগৃহীত হবে। হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তারা দেশ ভাগ ও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করে।

দেশ ভাগ হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ হলো পূর্বপাকিস্তান। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও করাচির পাকিস্তান সরকার পূর্বপাকিস্তানকে কোন গুরুত্বই দিল না। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের কলোনি হিসেবেই দেখতে লাগল। পূর্ববঙ্গকে তারা পাকিস্তানের কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করতে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষকে তাদের সমকক্ষ ভাবতেই চাইত না। জন্ম থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অবিশ্বাস আর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই সন্দেহ করত। তারা ভাবত, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বিশেষ করে শিক্ষিত লোকেরা কমিউনিস্ট ও পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

ভাষার প্রশ্নেই পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা প্রথম প্রতিবাদ করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিমাতাসুলভ আচরণ এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা প্রতিদিনই দুই প্রদেশের মধ্যে দূরত্ব বাড়াচ্ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে অল্পদিনের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি সামনে চলে আসল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চাইল একটি শক্তিশালী কেন্দ্র যেখানে সেনাবাহিনী সব নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানিরা চাইল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন।

মুসলিম লীগের সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ও অসহিষ্ণু রাজনীতির জন্য শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলীয় রাজনীতির উন্মেষ হল। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের জন্ম দিলেন। ভাসানী বলতে গেলে এদেশে এক নতুন ধরনের রাজনীতি নিয়ে এলেন। তিনি রাজনীতিকে জমিদারদের বৈঠকখানা থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এলেন। কৃষক শ্রমিকদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন। মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান চাচ্ছিলেন, দেশে একটা সাধারণ নির্বাচন হোক এবং সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক গণতান্ত্রিক নেতাও

তাঁদের সঙ্গে একমত ছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ছিল এর বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনীর চক্রান্তে কোন গণতান্ত্রিক সরকারই পাকিস্তানে টিকতে পারল না।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত, দেশের রাজনীতিবিদগণ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের যেটুক সময় এবং সুযোগ পেয়েছিলেন (৪৮ থেকে ৫৭), তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। কেন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার টিকতে পারেনি, লেখক সে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, তাদের অবিমৃশ্যকারিতাও ছিল গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অন্য একটি বড় অন্তরায় (যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা)। এর জন্য লেখক রাজনীতিবিদদেরই দায়ী করেছেন।

এদেশের রাজনীতিতে ষাটের দশকটি ছিল অগ্নিগর্ভ। এই সময় দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ছয়দফা, '৭০'-এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এই সময়ের সব অর্জন। লেখক এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছেন। আইয়ুব খান দেশে শুধু সামরিক শাসনই নিয়ে আসেননি, পাকিস্তান ভাঙার সব কিছু তিনিই করে গিয়েছিলেন। তিনি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে। তারপর ইতিহাসের নোংরা অংশটুকু রেখেছিলেন ভুট্টো আর ইয়াহিয়ার জন্য।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাস বুঝতে গেলে বইটি একটি বড় সহায়ক হবে।

মাহবুব সাদিক*

---

* কবি, লেখক ও গবেষক; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি কলেজ।